ISSN 1813-0372

বর্ষ : ৭ সংখ্যা : ২৮
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১১

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৮

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১১

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮, ০১৭১২-০৬১৬২১
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

বিপণন বিভাগ : ফোন ঃ ০২-৭১৬০৫২৭ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

www.pathagar.com

সূচিপত্র

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৭, সংখ্যা : ২৮
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১১

সম্পাদকীয়

আবদুল মান্নান তালিব : জ্ঞান ও সাহিত্যের আদর্শিক বাতিঘর

গত ২২ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেছেন বরেণ্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক, চিন্তাবিদ, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব (৭৬)। গোটা জীবন তিনি মুসলমানদের কল্যাণ ও ইসলামী জীবনাদর্শের প্রচার প্রসারে ব্যয় করেছেন। আবদুল মান্নান নামের ভিড়ের মধ্যে লেখক সত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় পিতৃপ্রদত্ত নাম আবদুল মান্নান-এর সাথে তিনি যুক্ত করেছিলেন 'তালিব'। যার অর্থ-সন্ধানী, অন্বেষণকারী, জ্ঞান আহরণকারী, শিক্ষার্থী। নিজের ধর্ম, ঐতিহ্য জাতীয় পরিচয় ও সত্যের সন্ধানে গোটা জীবন ব্যয় করে তিনি 'তালিব' নামধারণকে অর্থবহ ও সার্থক করেছিলেন। তাঁর গভীর অনুসন্ধানে আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী মুসলমানরা পেয়েছে আত্মপরিচয়ের সন্ধান। তাঁর চিন্তা ও গবেষণায় উদ্ভাসিত হয়েছে অসংখ্য বাঙ্গালী মুসলমানের জীবন, পূর্ণতা পেয়েছে জীবনবোধ। তাঁর চিন্তা ও লিখনীর দ্বারা ইসলাম উপস্থাপিত হয়েছে সামগ্রিক জীবনাদর্শ রূপে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৬ সালের ১৫ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন আবদুল মান্নান তালিব। ইসলামী জীবনাচার ছিল তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য। ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠলেও কৈশোর থেকেই তাঁর মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল প্রবল, ছিল গভীর অনুসন্ধিৎসা। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন ইসলামী জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে। পড়াশোনা করেন উত্তর প্রদেশের একটি মাদরাসায়। এক পর্যায়ে পাড়ি জমান পাকিস্তানে। লাহোরের বিখ্যাত মাদরাসা 'জামেয়া আশরাফিয়া' থেকে ১৯৫৭ সালে দাওরা-ই-হাদীস সনদ লাভ করেন। লাহোরে পড়াকালীন সময়ে তিনি বিখ্যাত আলেম মাওলানা ইদরিস কান্দলভীর গভীর সান্নিধ্য লাভ করেন। এই মনীষীর ইলম, দূরদর্শিতা, চিন্তা ও প্রজ্ঞা তাকে প্রভাবিত করে। সেই বছরই লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক 'তাসনীম' এর সহ-সম্পাদক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে লাহোর ত্যাগ করে ঢাকায় এসে 'দৈনিক ইত্তেহাদ' এর সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এরপর ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত 'ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী ঢাকা'-এর প্রধান গবেষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যান এবং ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মিযান' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি পুনরায় ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীর প্রধান গবেষক পদে পুনর্বহাল হন এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত 'মাসিক কলম' এবং ১৯৮১ থেকে ১৯৯৯

www.pathagar.com

পর্যন্ত 'মাসিক পৃথিবী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭৭-৮২ সাল পর্যন্ত দৈনিক সংগ্রাম এর ছোটদের পাতা 'শাহীন শিবির'-এর পরিচালক ছিলেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত তিনি দৈনিক সংগ্রাম এর কলামিস্ট ও ফিচার এডিটর ছিলেন। ১৯৮৭ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ১৯৯৯ থেকে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার'-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও এ সংস্থার গবেষণা জার্নাল 'ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা'র সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

সম্পাদক হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য। মাসিক কলম, মাসিক পৃথিবী, দৈনিক সংগ্রামের শাহীন শিবির ও ফিচার বিভাগ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা এবং ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি বহু লেখক গবেষক ও সম্পাদক তৈরী করেছেন। তাঁর দক্ষ ও মায়াবী পরশে আনাড়ি হাতের রচনাও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠতো এবং নবীন ও তরুণ লেখক, সাংবাদিক ও সাহিত্যপ্রেমীরা রপ্ত করে নিতে পারতেন লেখার কলা-কৌশল। প্রতিষ্ঠিত গবেষক ও কবি সাহিত্যিকদেরকেও তিনি আদর্শ ও মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতেন। শুধু নবীনরাই যে তাঁর সান্নিধ্যে লেখক হয়ে ওঠতেন তা নয়, প্রবীণ কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও গবেষকগণের মধ্যেও তিনি আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ড. এস এম লুৎফর রহমান, ড. আনিসুজ্জমান, কবি আল-মাহমুদ, কবি আব্দুল মান্নান সৈয়দ, কবি আল-মুজাহিদী, ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী, কবি সাজ্জাদ হোসাইন খান, কবি ওমর আলী, উপন্যাসিক সফিউদ্দীন সরদার প্রমুখের মতো বহুজন তাঁর গুণমুগ্ধ। তাঁর আদর্শিক জীবনাচার ও কর্মনিষ্ঠায় তিনি সমসাময়িক ও প্রবীণদের কাছেও ছিলেন আদৃত। কবি ফররুখ আহমদ, কবি বেনজীর আহমদ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, কবি মতিউর রহমান মল্লিক, প্রফেসর আব্দুল গফুর, গবেষক সম্পাদক আবুল আসাদ, নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখ, উবায়দুল হক সরকার, প্রমুখের মতো বহু বিদগ্ধজনদেরও একান্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন তিনি।

শুধু সাহিত্য সাংবাদিকতা নয় শিল্প সংস্কৃতিতেও তাঁর ভূমিকা ছিল পথ নির্দেশকের। আদর্শ ও মূল্যবোধহীন সঙ্গীতাঙ্গণে ইসলামী আদর্শভিত্তিক সঙ্গীত চর্চায় তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। ফলে আজকের বাংলাদেশে আদর্শভিত্তিক সঙ্গীত চর্চার একটা ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। আদর্শভিত্তিক নাটক সিনেমা ডকুমেন্টারী তৈরীর ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক। তাঁর নির্দেশনায় বহু গীতিকার সুরকার শিল্পী অভিনেতা ও নির্দেশক অশ্লীলতা পরিহারে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত হয়েছেন।

আবদুল মান্নান তালিব বলতেন, 'ইসলাম যেমন একটি বিশ্বজনীন আদর্শ, ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতিও বিশ্বজনীন।' তিনি বলতেন, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলত জীবন চর্চার নাম, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই ইসলাম চর্চার সুযোগ রয়েছে। ইসলাম সব ধরনের সংকীর্ণতা ও সীমালংঘন থেকে মুক্ত। ফলে ইসলাম জীবনধর্মী সবকিছুকেই আত্মস্থ করতে পারে। শুধু ইসলামেরই আছে এই ব্যাপকতা'।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি উর্দু, আরবী, ফার্সী, হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় তিনি

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সাহিত্যের সব শাখায়ই তাঁর পারদর্শিতা ছিল ঈর্ষণীয়। তিনি যেমন মৌলিক গবেষণা করেছেন তদ্রুপ কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কলাম, শিশুতোষ রচনায়ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ইসলামী আকীদা, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, উপন্যাস, ইকবালের কবিতা, অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক তিনি অনুবাদ করেছেন। তিনি কবি নজরুল ও ফররুখ আহমদের কবিতা উর্দুভাষায় অনুবাদ করে উর্দুভাষীদের কাছে নজরুল ও ফররুখকে পরিচিত করেছেন। তাঁর বিদগ্ধ অনুবাদে মূলগ্রন্থকারের বক্তব্য আরো বাঙময় হয়ে ওঠেছে। সময়ের প্রেক্ষিতে ইসলামী দিকনির্দেশনা দিতে তিনি বহু নতুন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা তিনশ'র বেশী। মৌলিক রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৮০ টি।

অবরুদ্ধ জীবনের কথা (১৯৬২) তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই। বাংলাদেশে ইসলাম (১৯৭৯) তাঁর অসাধারণ গবেষণা গ্রন্থ। এ পুস্তকে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছেন বাঙ্গালী মুসলমানদের আত্মপরিচয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদেরকে পরমুখাপেক্ষিতা মুক্ত করতে তিনি রচনা করেন 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও অবদান' (১৯৮৪) 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' (১৯৯১) এবং 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন' (১৯৯৪) 'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম' (২০০১) শীর্ষক মৌলিকগ্রন্থ। তাঁর এই গ্রন্থগুলো কবি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদেরকে আদর্শাশ্রয়ী হতে উৎসাহিত করে। তাঁর অনূদিত নাসিম হিজাজীর উপন্যাস এদেশের শিশুকিশোরদেরকে ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, প্রকাশনা জগতে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে এবং শিশুদের জন্য রচিত–এসো জীবন গড়ি, পড়তে পড়তে অনেক জানা, মা আমার মা, আমাদের প্রিয় নবী, মজার গল্প, কে রাজা, হাতি সেনা কুপোকাত, শিশুকিশোরদের মানসগঠনে মূল্যবান সংযোজন। ব্যক্তি আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন একান্তই অনাড়ম্বর, সাদাসিধে, সদালাপী, বিনয়ী, নিরলস, পরিশ্রমী, প্রচার বিমূখ, উদার মনের একজন মানুষ। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও আলাপচারিতা সবাইকে কাছে টানতো। নিজের প্রাপ্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদাসীন কিন্তু অন্যের অধিকারের ব্যাপারে ছিলেন সর্তক। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত বিনয়ী কিন্তু আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে আপসহীন। ইসলামী আদর্শের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন কিন্তু তাঁর অবস্থান ছিল বৃত্তের বাইরে। কোনরূপ সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে সব ধরনের মানুষের আনাগোনা ছিল তাঁর কাছে। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন মর্দে মুমিনের প্রতিকৃতি, সেই সাথে সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের জন্যে ছিলেন আদর্শিক বাতিঘর। যুগ যুগ ধরে তাঁর চিন্তা ও কর্ম সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের পথের দিশা দেবে, অগণিত মানুষ লাভ করবে ইসলামের আলোকচ্ছটা। বর্ণিল প্রতিভাধর ক্ষণজন্মা এই মনীষীকে মহান আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।

–শহীদুল ইসলাম

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৭, সংখ্যা-২৮
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১১

ইসলামে কন্যাশিশুর আর্থ-সামাজিক অধিকার

ড. মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম*

[সার-সংক্ষেপ : মানবশিশু স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কাজেই জন্মগতভাবেই মানুষ স্বাধীন। পুত্র ও কন্যা একই উৎস থেকে সৃষ্ট। সৃষ্টিগতভাবে কন্যা ও পুত্রের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত কারণে একে অপরের উপর কোন প্রাধান্য রাখে না। মৌলিকতার দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে কোন একজনের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং একে অপরের পরিপূরক। লৈঙ্গিক ভিন্নতার কারণে নারী ও পুরুষ যখন একে অন্যের উপর অনধিকার চর্চা, বৈষম্য ও প্রাধান্য বিস্তার করতে চায় তখনই অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। কন্যা বা নারীর মর্যাদা ও অধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রাচীন সভ্যতা থেকে শুরু করে আজকের সভ্যতাগর্বী সমাজেও নানা আলোচনা ও মতামত দেখা যায়। এখন পর্যন্ত অনেক সমাজ-দেশ-রাষ্ট্র-জাতি এমন আছে যারা কন্যাশিশুর ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে সন্দিগ্ধ। নারী স্বাধীনতা বা নারীবাদিতা আজকের একটি বহুল আলোচিত বিষয়। ব্যাপারটিকে নিয়ে এমন কিছু ভাবা ও করা হচ্ছে– যার ফলে নারী স্বাধীনতা বা অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেয়ে নারীকে মারাত্মক ব্লাকহোলের মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে, যেখান থেকে উত্তরণের বা পরিত্রাণের ক্ষীণ সম্ভাবনাও তিরোহিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আজকের বিশ্ববিবেক যা ভাবছে নারী বা কন্যা শিশু নিয়ে ইসলাম তা সপ্ত শতকেই সমাধান দিয়ে গেছে। কিন্তু মানুষ তা ভুলে গেছে বা বিভ্রান্তির কারণে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অন্যান্য ধর্ম ও সমাজে কন্যাশিশুর অবস্থান এবং ইসলাম কন্যা শিশুর আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রদানে কতটুকু আইনী ও বাস্তবানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা প্রামাণিক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।]

বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে কন্যাশিশু

মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা সমাজে কন্যার উপযুক্ত মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। সর্বত্রই সে ছিল পুরুষের দাসী ও বিলাসিতার সামগ্রী। সকল প্রাচীন ধর্ম ও আইনে নারী-পুরোহিত, স্বামী ও অভিভাবকের অধীন স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যহীন বলে চিত্রিত হয়েছে। বিশ্বের প্রচলিত ধর্মসমূহের বর্ণনার দিকে তাকালে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইয়াহুদী ধর্মে

ইয়াহুদীধর্ম আমাদের সামনে কন্যা বা নারী সম্বন্ধে যে ধারণা পেশ করে তার সারমর্ম হচ্ছে এই, "পুরুষ সৎকর্মশীল ও সৎস্বভাব বিশিষ্ট, আর নারী ভণ্ড ও বদস্বভাব বিশিষ্ট। পৃথিবীর প্রথম মানব আদি পিতা আদম আলাইহিস্ সালাম চির সুখের স্থান জান্নাতে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছিলেন। তাঁর স্ত্রী হাওয়া তাঁকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে

* সহযোগী অধ্যাপক, ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

www.pathagar.com

প্ররোচিত করেন।"[১] ইয়াহুদীধর্ম মতে, নারীর উপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। নারীর কারণে সকলের ধ্বংস অনিবার্য।[২] এ ধর্মে সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ নারী মানুষরূপে গণ্য হতো না। নারী ছিল উপেক্ষার পাত্র।[৩]

খ্রিস্টধর্মে : পৃথিবীর অন্যতম ধর্ম হচ্ছে খ্রিস্টধর্ম। তাদের ধর্মগ্রন্থ হল বাইবেল। এ ধর্মে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত ও নিগৃহীত। খ্রিস্টানরা কন্যাকে পাপের প্রতীক বলে বিশ্বাস করতো। তারা মনে করতো আদম আলাইহিস্ সালামের স্ত্রী হাওয়া-এর ভুলের কারণে সকল নারীর রক্তে পাপের সঞ্চালন ঘটেছে। খ্রিস্টান পাদ্রীরা নারীকে নরকের দ্বার (Woman is door to hell) এবং মানবের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ মনে করতো। তারা নারীকে সর্বাপেক্ষা জঘন্যরূপে চিত্রিত ও নিকৃষ্ট বিশেষণে ভূষিত করতো।[৪] খ্রিস্টসমাজ নারীকে আত্মাহীন প্রাণী ও সন্তান উৎপাদনের একটি প্রাকৃতিক যন্ত্ররূপে আখ্যায়িত করেছে।[৫] তাদের ধারণা, ঈসা আলাইহিস্ সালামকে শুলবরণ করতে হয়েছে নারীর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই। খ্রিস্টান পাদ্রীদের মতে, "নারী যাবতীয় পাপের উৎস। নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল এবং তারা আল্লাহ্ তাআলার মান সম্মানে বাঁধা দানকারী।"[৬] এ প্রসঙ্গে মোস্তাম নামক এক খ্রিস্ট ধর্মযাজক বলেন "নারী এক অনিবার্য আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।"[৭] সপ্তম শতাব্দীতে Council of the wise-এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : "নারীর কোন আত্মা নেই" (Woman has no soul.) | খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত। নারী জাতিকে অতীব হীন ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার

---

১. আফিফী, মুহাম্মদ সাদিক আল-মারতুওয়া, *আল-মারআহ ওয়া হুকূকুহা ফিল ইসলাম*, বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা .বি, পৃ. ১৩ ; হুসায়ন, সাদিক, *তালীমুল মারআতি ফিল ইসলাম, আল-বাছুল ইসলামী*, লক্ষ্ণৌ : মুয়াসসাসাতুস সাহাফা ওয়ান নাশর, ১৪২০ হিঃ, সংখ্যা, ৬. পৃ. ৩৬

২. Bettany, *The Encyclopaedia Britanica*, Board of Editors, Chicago : Macropaedia, 1995, 15th vol. V, p. 732.

৩. Shaner, *Donald W : A Christian view of Divorce*, Leiden :1969, p. 31.

৪. কাদের, ড. এম. আব্দুল, *নানা ধর্মে নারী*, চট্টগ্রামঃ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০, পৃ. ৩৫

৫. জাফর, আবূ, *নারী স্বাধীনতা : ইসলাম ও পাশ্চাত্য বিশ্ব*, ঢাকা : পালাবদল পাবলিকেশন্স লিঃ, ২০০১, পৃ. ৭৩

৬. আবূল আ'লা, সাইয়েদ, *পর্দা ও ইসলাম*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ. ১০

৭. Libra, *Woman hood and the Bible*, New York, 1961, p. 18; ড. মুস্তফা আস-সাবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৮, পৃ. ১৪

www.pathagar.com

ব্যাপারে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্মের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। উভয় ধর্মই নারীকে পাপের আদি কারণরূপে আখ্যায়িত করেছে। বাইবেলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে,

"পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে; এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।"[৮]

সেন্ট টমাস ঘোষণা করেছেন : "নারী ঘটনাক্রমে সৃষ্ট একটি জীব। এটা জেনেসিসে প্রতীকী হয়েছে, সেখানে হাওয়াকে আদমের একটি হাঁড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[৯]
খ্রিস্টান এক পাদ্রী বলেছেন : "নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারী। ঘরে ও সমাজে যত অশান্তির সৃষ্টি হয় তা সব তারই কারণে। আর এ কারণেই তারা নারীর শিক্ষা অধিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।"[১০]

মেরী-ওলস্টোনক্রাফট (Mary Wollstonecraft) উল্লেখ করেন "রুশো থেকে শুরু করে ড. গ্রেগরী পর্যন্ত যারাই নারীর শিক্ষা ও আচরণ সম্পর্কে কথা বলেছেন, তাঁরা নারীকে দুর্বল এবং নিকৃষ্ট হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁদের মতে, নারীর স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষমতা নেই। পুরুষের মধু সাথী হিসেবেই তাকে ভাল মানায়। আনুগত্য তার প্রধান গুণ। পুরুষের তুলনায় নারীর এই দুর্বলতা প্রাকৃতিক ব্যাপার"। রুশোর এসব ধারণাকে মেরী ননসেন্স বলেছেন।[১১]

গ্রিক সভ্যতা : গ্রিকরা নারীদের সম্পর্কে বলত : "নারী জাতি সকল অকল্যাণের মূল।"[১২] গ্রিক সভ্যতার যুগে নারীকে দুর্বিষহ মানবেতর দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। গ্রিক সভ্যতায় নারী কী মর্যাদার অধিকারী ছিল তা সক্রেটিস এবং এগুারস্কির ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সক্রেটিস বলেন–
"নারী বিশ্বজগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুইপাখি তা ভক্ষণ করলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।"[১৩]

---

৮. *Holy Bible*, Genesis, 3 : 16, p. 4.
৯. সাইমন, ডি. বিভোর, *দ্য সেকেণ্ড সেক্স*, ঢাকা : এশিয়াটিক পাবলিকেশন্স, ২০০১, পৃ. ১৫
১০. *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১১. মোহাম্মদ, আনু, *নারী, পুরুষ ও সমাজ*, ঢাকা : বইপড়া, ১৯৯৭, পৃ. ১৮-১৯
১২. হেমা, আসমা জাহান, *ইসলামের ছায়াতলে নারী*, ঢাকা : আল-এছহাক প্রকাশনী, পৃ. ৩০
১৩. সক্রেটিস বলেন : "Woman is the greatest source of chase and disruption in the world . She is like the Dafali Tree which outwardly looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without fail"
-Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, *The position of Woman in Islam*, Kuwait : Islamic book publishers, 1982, p. 9-10.

www.pathagar.com

গ্রিক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে এণ্ডারসকি বলেন : "*অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর যাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।*"[১৪] গ্রিক সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মতামত বিবেচনাযোগ্য ছিল না। নারীকে তার অভিভাবকের ইচ্ছার নিকট নতি স্বীকার করতে হতো।[১৫]

রোমান সভ্যতা : বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা হচ্ছে রোমান সভ্যতা। রোমান সভ্যতায় নারীর আইনগত কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীরা সামাজিক, নৈতিক তথা শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল অবহেলিত ও বঞ্চিত। রোমান সমাজে মেয়ে সন্তানকে আজীবন পিতার অনুগত হয়ে থাকতে হতো। পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল নারী। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের তার উপর আইনানুগ অধিকার জন্মাত।[১৬] পুরুষদের যৌনক্ষুধা নিবারণের হাতিয়ার হিসেবে নারী ব্যবহৃত হতো। এমনকি স্বামী কোন অপরাধের দায়ে স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারতো।[১৭]

চীন সভ্যতা : পৃথিবীর প্রাচীনতম চীন সভ্যতায় কন্যার মর্যাদা ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। একটি চীনা প্রবাদে আছে : "তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, কিন্তু বিশ্বাস করো না।"[১৮] এ কথাতেই প্রতীয়মান হয় চীন সভ্যতায় কন্যার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। চীনের ধর্মগ্রন্থে নারীকে "Water of woe" (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়।[১৯]

বেটানী বলেছেন : "অতলান্ত মৎস্যের গতিবিধির ন্যায় অপ্রমেয় ও অবোধ্য, নারী চরিত্র বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুস্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্য সদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম।"[২০]

---

১৪. এণ্ডারসকি বলেন : "Cure is possible for fireburns and Snake-bite ; but it is impossible to arrest woman's charms." -Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, *The position of Woman in Islam*, Ibid.

১৫. Allen, E. A., *History of Civilization*, 3 part, p. 443.

১৬. Al-Hatimy, Said Abdullah Seif, *Woman in Islam*, Lahore : Islamic publications Ltd., 1979, p. 3. 4.

১৭. *Woman in Islam,bid.* p. 3-4.

১৮. *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১৯. খালেক, আব্দুল, *নারী ও সমাজ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা : ১৯৯৫, পৃ. ৫

২০. *দ্যা ইনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭৩২

www.pathagar.com

হিন্দু সভ্যতা : পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে হিন্দু ধর্ম সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। এ ধর্ম বৈদিক ধর্ম, আর্যধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম ইত্যাদি নামেও পরিচিত। [২১]

হিন্দু ধর্মে নারীর কোন মর্যাদা দেয়া হয়নি। এ ধর্মের অন্যতম গ্রন্থ 'মহাভারত' এ বলা হয়েছে, "নারী অশুভ, সকল অমঙ্গলের কারণ, কন্যা দুঃখের হেতু।"[২২] বেদে উল্লেখ রয়েছে, "যজ্ঞকালে কুকুর, শুদ্র ও নারীর দিকে তাকাবে না।"[২৩] হিন্দু ধর্মে নারীকে কোন উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রদান করা হয়নি।[২৪] ভারতীয় সভ্যতায় নারীর অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়। উচ্চশ্রেণী ও রাজবংশের নারীদেরকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষদের নিকট হতে দূরে রাখা হতো। কারণ, সকল ধ্বংসের মৌল উৎস ছিল নারী। বৈদিক যুগে নারী ছিল যুদ্ধলব্ধ লুটের মালামালের ন্যায়। ঐ সকল যুদ্ধে বিজয়ের পর বিজয়ী পক্ষ জোরপূর্বক নারীদের অপহরণ করতো এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর ন্যায় তাদেরকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করতো। তৎকালীন সময়ে স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করতো। কন্যা সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতো। স্বামীর ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি, এমনকি মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ নারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কুরআন নাযিলের পূর্বে দুনিয়ার কোন দেশেই নারী স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কোথাও নারী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হতে পারতো না।[২৫]

ভারতীয় সমাজে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়া যেমন অপরাধ ছিল, তেমনি গোটা সমাজে নারী ছিল ব্যবহার সামগ্রী সদৃশ। মানুষ হিসেবে নারীর ছিল না কোন মানবাধিকার।

বৌদ্ধধর্মে : বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মসমূহের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নারী জাতির জন্য কিছুই করে যাননি এবং কোন কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। জানা যায়, রাজমহিষী মল্লিকাদেবী কন্যাসন্তান প্রসব করলে রাজা বিমর্ষ হন। বুদ্ধ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কন্যাসন্তানের জন্ম হেতু কারো দুঃখ করা উচিত নয়। সুশীলা ও ধর্মপ্রাণ

---

২১. Walker, Benjamin, *Hindu World*, London : George Allen & Unwin Ltd., W. D., P. 245 ; S.C. *Chatterjee Fundamentals of Hinduism*, Calcutta, 1970, P.2

২২. *মহাভারত*, ১ : ১৫৯ : ১১

২৩. *বেদ*, ৩ : ২ : ৪ : ৬

২৪. তাব্বারাহ, আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ, *রূহুদ দীনিল ইসলামী*, বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালায়িয়ীন, ১৯৮৫, পৃ. ৪১৯

২৫. Malik, Fida Hussain, *Wives of the Prophet*, Lahor : Ashraf publications, 1983, p. 12-15.

www.pathagar.com

কন্যা হলে সে পুত্র অপেক্ষা শ্রেয় হয়।"[২৬] হিন্দু ধর্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মে নারী ততটা অবহেলিত নয়। মহামঙ্গল সূত্রে গৌতম মাতার সেবা ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে উত্তম মঙ্গল বলে আখ্যায়িত করেন।[২৭]

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের কোন একটিতেও কন্যা বা নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। নারী যে একটি প্রাণী, পুরুষের মত তারও প্রাণ আছে তা উপরে বর্ণিত কোন ধর্মই স্বীকার করতো না। নারীকে গৃহের অন্যান্য আসবাব পত্রের মত মনে করা হতো। নারী ছিল শিক্ষা–দীক্ষাসহ সর্বপ্রকার স্বাধিকার হতে চির বঞ্চিত।

আরব সমাজে : মহানবী স.-এর নবুওয়ত পূর্বযুগে আরবে কন্যাসন্তানের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান অধিকতর খারাপ ছিল। জাহেলী যুগে কন্যারা ছিল ঘৃণিত, মর্যাদা বহির্ভূত এবং অধিকার ও মূল্যহীন। তারা মানবরূপে গণ্য ছিল না। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে চরম অভিশাপ বলে গণ্য হতো। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। ভোগ্য পণ্যের চেয়ে অবমূল্যায়িত ছিল নারী। এককথায় কন্যারা সে সমাজে ছিল শোষিতা, অধিকার বঞ্চিতা এবং শিক্ষা-দীক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের কোন সুযোগই তারা পেত না। এ প্রসঙ্গে Encyclopaedia of Britanica-এ বলা হয়েছে–

"সে সমাজে নারীদের স্থান এত অধঃপতিত ছিল যে, তাদের সন্তানরা তাদেরকে দাসে পরিণত করত। নারীরা নিজ গৃহেই ছিল নির্বাসিত। স্ত্রীদের শিক্ষার অধিকার ছিল না। তাদের স্বামী কর্তৃক তারা একটা বাচাল বৈ কিছুই মনে করা হত না।"[২৮]

অথচ কন্যা সন্তান প্রসবে নারীর কোন হাত নেই। সে যুগে আবূ হামযা নামে এক সম্ভ্রান্ত সর্দার কন্যা সন্তান জন্মের পর অপমানে আত্মগোপন করে বেড়ালে তার স্ত্রী মনের দুঃখে এ কাব্য আবৃত্তি করেছিল–

"আবূ হামযার কি হল! সে আমাদের নিকট না এসে প্রতিবেশীর বাড়ীতে রাত্রি কাটায়। আমি পুত্র সন্তান প্রসব না করার দরুনই সে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহর কসম! পুত্র সন্তান জন্মদান আমার ক্ষমতাধীন নয়। আমরা শস্যক্ষেত্র তুল্য। স্বামীগণ আমাদের মাঝে যে বীজ বপন করে, তাতে সে শস্যের চারাই জন্মে।"[২৯]

---

২৬. বড়ুয়া, ড. সনন্দা, *বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে নারীর অবস্থান,* ঢাকা: বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশন, স্মরণিকা, ১৯৯৬, পৃ. ২২

২৭. দৌলাতানা, মমতাজ, ধর্ম, *যুক্তি ও বিজ্ঞান, ঢাকা: জ্ঞানকোষ,* ১৯৯৭, পৃ. ১০৮

২৮. *Encyclopaedia of Britanica*-এ বলা হয়েছে, "Women' status had degenerated to that of child bearing slaves. Wives were secluded in their home, had no education and few rights and were considered by their husbands no better than hatter."
- *The Encyclopaedia Britanica*, ibid, Voll. 19, p. 909.

২৯. নদভী, সাইয়্যেদ সুলায়মান, *সীরাতুন্নবী*, আযমগড় : মাতবা মাআরিফ, ১৯৫১, খ. ৪, পৃ. ২৯৭

www.pathagar.com

ইসলামেঃ ইসলাম নারীকে সবোর্চ্চ মর্যাদা দান করেছে। তা সত্ত্বেও অনেক মুসলিম দেশ ও সমাজে নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। পাচ্ছে না তাদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা। যদি নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক মুত্তাকী হয় তবে সে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত। পুরুষ হলেই নারী থেকে কেউ অধিক সম্মানিত হয় না। বর্তমান বিশ্বের কোন পুরুষ খাদীজা, আয়িশা ও ফাতিমা রা.-এর সমান মর্যাদাবান হবে না। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই নারীদের অযোগ্য ও হীন মনে করা হয়। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিও নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় কন্যাসন্তানের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে উপরের বর্ণনা হতে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া গেল। বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীকে জীব-জন্তু এবং ব্যবহারিক সামগ্রীর মত মনে করা হতো। দুর্ভাগ্যের প্রতীক, অপকর্মের উৎস, শয়তানের দোসর, নরকের দ্বার, যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার বাহন হিসেবেই পরিচিত ছিল নারী। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর মর্যাদার জন্য যিনি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে সংসার, সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে যিনি প্রথম স্বীকৃতি দান করেন, সত্যিকারার্থে নারী জাগরণ ও নারীমুক্তির যিনি প্রবক্তা, তিনি হচ্ছেন একজন পুরুষ–সর্বযুগের, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন নাযিলের মাধ্যমে নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। কুরআন নারীকে মা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা হিসেবে বিভিন্নভাবে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। ইসলামে নারী ও পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগত বৈষম্য ছাড়া অন্য কোন বৈষম্যের স্থান নেই। এমনকি আল-কুরআনেও ক্ষেত্রবিশেষ পুত্রের চেয়ে কন্যাকে মহান করে তুলে ধরা হয়েছে।

বস্তুত বিশ্বজাহান সৃষ্টির মূলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক সুচিন্তিত মহাপরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি সব কিছু জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। প্রথম মানুষ আদম আ. কে সৃষ্টি করার পর পরই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্যই তার জুড়ি মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। আল-কুরআনের বাণীসমূহ প্রণিধানযোগ্য। আল-কুরআনে বলা হয়েছে–*"তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি সৃষ্টি করলেন তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে এবং বানালেন তার থেকে তার জুড়িকে।"*[৩০]

সৃষ্টি প্রসারের উদ্দেশ্যে নর-নারীর পারস্পরিক সম্মিলন এবং এতে যে প্রশান্তি ও প্রজন্ম বৃদ্ধি প্রক্রিয়া এটিই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভীপ্সিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, *"প্রত্যেক বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ*

---

৩০. আল-কুরআন ৪ : ১ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

www.pathagar.com

করতে পারো।"[৩১] তিনি আরও বলেন, "পবিত্র মহান তিনি, যিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে।"[৩২]

মহান আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। তিনি বলেন-"আর মান-মর্যাদার দিক দিয়েও আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টিলোকের অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"[৩৩]

তিনি বলেন– "নিশ্চয় আমি বনী আদমকে মর্যাদা দান করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে চলাচলের বাহন দান করেছি। আর আমি তাদেরকে দিয়েছি নানাবিধ উত্তম জীবনোপকরণ এবং আমি তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[৩৪]

পুত্র ও কন্যা যদিও দু'টি ভিন্ন সত্তা তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল এবং সমতা রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আল্লাহ্ তাআলা কন্যাকে পুরুষের জন্য নিয়ামত হিসেবে মর্যাদাবান করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "মানুষের কাছে মনোরম করা হয়েছে আকর্ষণীয় কাম্য বস্তুসমূহের মহব্বত-যেমন নারীর, সন্তান-সন্ততির, স্তূপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গবাদি-পশুরাজির এবং ক্ষেত-খামারের। এ সবই হল পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।"[৩৫] নারীজাতি পুরুষদের জন্য আকর্ষণীয় নিয়ামত। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায়, রসূল স. বলেছেন : "এ পৃথিবীতে আমার প্রিয় বস্তু হচ্ছে নারী।"[৩৬]

রসূল স. বলেন : "আল্লাহ্ তাআলা মাতাগণের নাফরমানী, তাদের অধিকার আদায় না করা, চারদিক থেকে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সঞ্চয় করা এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত প্রোথিত করাকে তোমাদের জন্য চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন।"[৩৭] মহানবী

---

৩১. আল-কুরআন, ৫১ : ৪৯ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

৩২. আল-কুরআন, ৩৬: ৩৬ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

৩৩. আল-কুরআন, ৯৫ : ৪ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

৩৪. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

৩৫. আল-কুরআন, ৩ : ১৪
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

৩৬. নাসাঈ, ইমাম, *আস-সুনান,* অধ্যায় : ইশরাতিন্নিসা, অনুচ্ছেদ : হুববিন্নিসা, আল-কুতুবুসসিত্তা, রিয়াদ : দারুসসালাম, ২০০০;
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة

৩৭. বুখারী ইমাম, *আস-সহীহ;* বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা. বি. : খ. ৮, পৃ. ২৫১, হাদীস নং-২২৩১;

www.pathagar.com

স. বলেন, "যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান হবে, সে যদি তাকে জীবিত দাফন না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্যমূলক আচরণ না করে এবং নিজের পুত্রসন্তানকে তার উপর প্রাধান্য না দেয়, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৩৮]

কুরআন কন্যা সন্তান হত্যা করার মত মানবতাবিরোধী কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মতই বেঁচে থাকার অধিকার প্রদান করেছে। কন্যা সন্তানের মর্যাদা এতই বেশি দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কন্যা সন্তানই দোযখের আগুন থেকে বাঁচার উপায় হতে পারে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, "আল্লাহ্ যদি কন্যা সন্তানদের মাধ্যমে কাউকে কোন রকম পরীক্ষায় ফেলেন আর সে যদি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে, তাহলে ঐ সব কন্যা সন্তান তার জন্য দোযখের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে।"[৩৯]

তৎকালীন আরব সমাজে ইয়াতীম শিশু কন্যারা নির্যাতিত হতো সবচেয়ে বেশি। তাদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা হতো। কুরআন তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, *"আর দিয়ে দাও ইয়াতীমদের তাদের সম্পদ এবং বদল করো না খারাপ মালের সাথে ভাল মালের। আর গ্রাস করো না তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিশিয়ে। নিশ্চয় এরূপ করা গুরুতর পাপ।"*[৪০]
আল্লাহ্ তাআলার এ স্পষ্ট ঘোষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াতীমরা অবহেলিত নয় বরং গুরুত্ব ও অধিকারের মর্যাদাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন–

"আর তোমরা ইয়াতীমদের পরীক্ষা করে নেবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পাও তবে তাদের মাল তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবে। ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত খরচ করো না এবং তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে সচ্ছল সে যেন ইয়াতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সঙ্গত

---

৩৮. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফি ফাদলে মান আলা ইয়াতামা, আল-কুতুবুসসিত্তা, রিয়াদ : দারুসসালাম, ২০০০, عن ابن عباس قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة

৩৯. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ*, বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা. বি. খ. ১৩, পৃ. ৭৫, হাদীস নং-৪৭৬৩ ;
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار.

৪০. আল-কুরআন, ৪ : ২ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

www.pathagar.com

পরিমাণে ভোগ করে। যখন তোমরা তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ করবে, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য হিসেব গ্রহনে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৪১]

আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

> *"নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে খায়, তারা তো শুধু তাদের পেটে আগুন ভর্তি করছে ; আর তারা সত্বরই দোযখের আগুনে জ্বলবে।"*[৪২]

উপর্যুক্ত বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয়, ইয়াতীম শিশুরা কখনও অবহেলার পাত্র নয়। বরং মানুষ হিসেবে তারাও বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। রসূল স. বলেছেন : "হে আল্লাহ্! আমি দুই দুর্বল (ইয়াতীম ও নারী) -এর প্রাপ্য অধিকার রক্ষা করব।"[৪৩] আল্লাহ্ তাআলা নারী ও পুরুষকে একজনকে অপরজনের ভূষণ তুল্য এবং একে অপরের পরিপূরক ঘোষণা দিয়ে তাদের বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। স্ত্রী যে স্বামীর জন্য শান্তির আধার, প্রশান্তির উৎস তা আমরা কুরআনের এ বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য হালাল নয় নারীদের জবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা। আর তাদের আটকে রেখো না তাদের যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করতে, কিন্তু যদি তারা কোন প্রকাশ্য ব্যভিচার করে তবে তা ব্যতিক্রম। তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করবে। তারপর তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে এমন হতে পারে যে, তোমরা এরূপ জিনিসকে অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ্ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।"[৪৪]

রসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে বিধবা নারী, সুশ্রী ও সম্ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ সন্তানদের সেবা-যত্ন ও লালন-পালনের ব্যস্ততায় নিজেকে বিবাহ হতে বিরত রেখেছে যে পর্যন্ত না সন্তান বড় হয়ে পৃথক হয়ে গিয়েছে এরপর মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে এমন নারী

---

৪১. আল-কুরআন, ৪ : ৬ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

৪২. আল-কুরআন, ৪ : ১০
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

৪৩. ইবনে মাজাহ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল আদাব, অনুচ্ছেদ : হাককুল ইয়াতীম, আল-কাহেরা : দারু ইবনুল হাইছাম, ২০০৫, খ. ৪, পৃ. ১০০, হাদীস নং-৩৬৭৮
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة

৪৪. আল-কুরআন, ৪ : ১৯
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

www.pathagar.com

জান্নাতে আমার নিকটবর্তী হবে (দু'আঙ্গুলের মত দূরত্বের ন্যায়")।[৪৫] আবূ হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, "মহানবী স. বলেন, বিধবা নারী ও মিসকীনদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা দিনভর রোযা পালনকারী ও রাতভর তাহাজ্জুদ নামাযে রত ব্যক্তির সমতুল্য সওয়াব পাবে।"[৪৬]

নারীর সামাজিক দায়িত্ব : কুরআন মাজীদে পুরুষের ন্যায় নারীদেরকেও সামাজিক দায়িত্ব ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

"তোমরা মানবগুষ্ঠির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। অর্থাৎ তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত এবং মানব জাতির সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী"।[৪৭] এখানে নারীদেরকেও উত্তম জাতির অর্ধেক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

মানব জাতির বংশ বিস্তারে নর ও নারী উভয়ের ভূমিকা সমান। আল-কুরআনে এসেছে-

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভাজন করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।"[৪৮]

অতএব বোঝা গেল, পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষকে একই উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। পাপ ও পূণ্যের বিচারে পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে-*"আমি বিনষ্ট করি না তোমাদের কোনো শ্রমিকের কর্ম, তা সে হোক পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা একে অন্যের অংশ।"*[৪৯] *"যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী এবং সে ঈমানদার হবে, এরূপ লোক জান্নাতে দাখিল হবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে*

---

৪৫. আবু দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আদাব, অনুচ্ছেদ : ফজলে মান আলা ইয়াতামা : প্রাগুক্ত,
عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأوما يزيد بالوسطى والسبابة امرأة أمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتأماها حتى بانوا أو ماتوا.

৪৬. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আননাফাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলিন নাফাকাতি আলাল আহলি, আল-কুতুবুসসিত্তা, রিয়াদ : দারুস সালাম-২০০০, পৃ. ৪৬২
عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار

৪৭. ইবনে কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০১ হি: খ. ২, পৃ. ৯৩

৪৮. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩
يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

৪৯. আল-কুরআন, ৩ : ১৯৫
أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

www.pathagar.com

না।"[৫০] "যে নেক কাজ করে এবং সে মুমিন, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, আমি তাকে অবশ্যই দান করবো এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং তারা যা করত তার জন্য তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।"[৫১] "যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে সে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল পাবে। আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করে সে পুরুষই হোক কিংবা নারীই হোক, সে যদি মুমিন হয় তবে এরূপ লোকেরাই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে বেহিসাব রিযিক।"[৫২]

ধন-সম্পদ উপার্জন এবং মালিকানার ব্যাপারেও ইসলাম পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-"পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ। আর প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[৫৩]
পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারেও ইসলাম নর ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। আল্লাহ বলেন–

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে। তাদের পক্ষে বৈধ নয় গোপন রাখা যা আল্লাহ তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন, যদি তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়। আর যদি তারা আপস–মীমাংসা করতে চায় তবে ঐ সময়ে তাদের ফিরিয়ে নিতে তাদের স্বামীরা অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের আছে তাদের উপর। আর নারীদের উপর রয়েছে পুরুষদের মর্যাদা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।"[৫৪]

দণ্ডবিধানেও ইসলাম নর ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। মহান আল্লাহ বলেন–*"হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের জন্য কিসাসের মধ্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।"[৫৫]*

---

৫০. আল-কুরআন, ৪ :১২৪
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

৫১. আল-কুরআন, ১৬ : ৯৭ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

৫২. আল-কুরআন, ৪০ : ৪০ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

৫৩. আল-কুরআন, ৪ : ৩২ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

৫৪. আল-কুরআন, ২ : ২২৮ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৫৫. আল-কুরআন, ২ : ১৭৯ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

www.pathagar.com

উত্তরাধিকার আইনে নর-নারী উভয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম সমান গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–"পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[৫৬]

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনায় জ্ঞানার্জন শুধু পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি বরং পুরুষের ন্যায় নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন। এসব নির্দেশনা হতে প্রমাণিত হয় যে, বহু ক্ষেত্রেই পুত্র ও কন্যার মধ্যে সমতা রয়েছে। এসব ব্যাপারে উভয় শ্রেণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পুত্র ও কন্যাতে পার্থক্য করার অধিকার মানুষের নেই। আল্লাহ তাঁর মহাপরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যেখানে যত সংখ্যক পুরুষ এবং যেখানে যত সংখ্যক নারীশিশু পয়দা করতে চান করেন। রসূলুল্লাহ স. কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কন্যাসন্তান বেশি দিয়েছেন। তার পুত্র সন্তান জন্ম নিলেও তারা শিশু কালেই ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম নবীকে কি কারণে বেশি কন্যাসন্তান দান করলেন? নবী-রসূলগণ জানেন ও পুরোপুরি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তাআলা যা কিছু করেন সে সব কিছুর মধ্যে অবশ্যই হিকমত আছে, এজন্য কোন অবস্থাতেই তাঁরা মনক্ষুণ্ন হন না। সাধারণ মানুষকে কন্যা শিশুর অধিকারের ব্যাপারে সচেতন করতে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন– "কন্যাদেরকে অপছন্দ করো না আমি নিজেই তো কন্যাদের পিতা।"[৫৭] ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ কন্যা ও নারীকূলকে দুর্লক্ষণে বলে অভিহিত করার কারণে সাধারণ মানুষও কন্যা শিশুর জন্মকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করে। এ কারণেই অভিশপ্ত হয়েছে কওমে লূত এবং তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছে। আল-কুরআনে এসেছে– *"তিনি যা খুশি সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা বানান। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, সবকিছু করতে সক্ষম।"*[৫৮]

মানব বংশের অস্তিত্ব রক্ষা ও এর প্রসারের প্রয়োজনে ছেলে ও মেয়েসন্তান উভয়ের গুরুত্বই সমান। আল্লাহ তাআলা ছেলে সন্তানদের দ্বারা এক ধরনের কর্ম করান এবং মেয়েসন্তান দ্বারা অন্য ধরনের কর্ম করিয়ে থাকেন। আর এজন্য তাদের দিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক আকৃতি, ভিন্ন-ভিন্ন মন-মেজাজ ও আলাদা আলাদা রুচি-বৈশিষ্ট্য। একজন পুরুষের মধ্যে জীবন-যৌবনের যে চাহিদা আছে তা পূরণ করার জন্য

---

৫৬. আল-কুরআন, ৯৬ : ১ اقرَا باسم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

৫৭. আদ-দাইলামী, আবি শুজা, *আল ফিরদাউস ফি মাছুরিল খিতাব*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬, খ. ৫, পৃ. ৩৭ لا تكرهوا البنات فإني أبو البنات

৫৮. আল-কুরআন, ৪২ : ৪৯-৫০ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

www.pathagar.com

অবশ্যই একজন জীবনসাথী আবশ্যক। নারী ব্যতীত অন্য কিছুতে এ চাহিদা পূরণ হয় না। সারাদিন পরিশ্রম করে ফিরে এলে স্ত্রীর মিষ্টি হাসি ও প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে সব ক্লান্তির অবসান ঘটায়। তাই ইসলামে কন্যাশিশুকে অশুভতো নয়ই বরং সৌভাগ্যের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কন্যা ও পুত্র সন্তান দ্বারা একই রূপ সেবা পাওয়া যায় না। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, রুগ্ন অবস্থায় শয্যাপাশে বেশিক্ষণ অবস্থান ও বিনিদ্র রজনী যাপন করতে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অগ্রবর্তী। ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ঘরের কাজ বেশি করে মেয়েরা। হাসপাতালগুলোতে সেবা শুশ্রূষার দায়িত্বে মেয়েদের বেশি নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। ইসলাম পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে নারীদেরকে এ সেবা কাজের অনুমতি দেয়।

পৃথিবীর বহু মনীষী, বীরযোদ্ধা, বৈজ্ঞানিক, কবি-সাহিত্যিক তাদের নিজ নিজ কর্মে উৎকর্ষ সাধনের পেছনে তাদের স্ত্রীদের অবদান অকপটে স্বীকার করেছেন। এমনকি নারীর সঠিক মূল্যায়ন না করে তাদেরকে যারা ভোগের পণ্য বানিয়েছে, তারাও আজ বহু দেশে নারীর অধীনে কাজ করছেন। রাষ্ট্রীয় দূতিয়ালী থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের জটিল কাজগুলোও আজ নারীরা করছে। আজ নারীরা পুরুষের সাথে সকল কাজে অংশগ্রহণ করে প্রমাণ করছে তারা কোন অংশে বা কোন ব্যাপারে পুরুষ থেকে পিছিয়ে নেই। আবার তথাকথিত সভ্যদেশে নারীকে পিতামাতার উত্তরাধিকার পর্যন্ত দেয়া হয় নি। বিশ্বনবী স. নারীদেরকে মর্যাদা দিতে যে ব্যবস্থা শিখিয়েছিলেন তার কারণে তৎকালীন নারী সমাজ যে কোন উন্নত অবস্থা থেকে বেশি মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিই মায়ের অধিকার পিতা থেকে তিনগুণ বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং পুরুষের সাথে সর্বপর্যায়ে মীরাসের অধিকারী বলে জানিয়েছেন। ছেলের তুলনায় কন্যা পাবে অর্ধেক একথা বলে যারা ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে বলে থাকেন তারা হিসেব করেন না পিতা-মাতার পরিচর্যা কন্যার উপরে নয়, পুত্রের উপর। সংসার পরিচালনার দায়িত্ব স্ত্রীর নয়, পুরুষের। আল্লাহ্ তাআলা বলেন- *"পুরুষগণ নারীগণের উপর কর্তৃত্বশীল, পরিচালক, অভিভাবক।"*[৫৯]

কুরআন মাজীদ ঘোষণা করে যে, জীবনের সব রকমের সংগ্রাম–সাধনা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি নির্মাণে এবং উত্থান–পতনের ক্ষেত্রে সর্বদাই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। জীবনের দুর্বিসহ বোঝা উভয়েই বহন করেছে। উভয়ের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত চেষ্টা–প্রচেষ্টার ফলেই সমাজ, সভ্যতা ও তমদ্দুনের ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারে সর্বকালেই নারী ও পুরুষের যৌথ চেষ্টা ও তৎপরতার কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসে

---

৫৯. আল-কুরআন, ৪ ঃ ৩৪
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

www.pathagar.com

স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দুনিয়ার কোন জাতিই নারী পুরুষ কাউকেই উপেক্ষা করতে পারে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

"মুমিন নর ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আনুগত্য করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। এদের উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল প্রতাপশালী, হিকমতওয়ালা।"[৬০]

ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সময় নারী ও পুরুষ যেমন পাশাপাশি থেকে একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে, ঠিক তেমনি বাতিল নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সমানভাবে তারা অংশীদার হয়ে থাকে। এতে বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই শ্রেণীর লোকদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন–

"মুনাফিক নর এবং মুনাফিক নারী একে অপরের ন্যায়। তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভাল কাজ থেকে বারণ করে, তারা বন্ধ করে রাখে নিজেদের হাত। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিশ্চয় মুনাফিকরাই হল ফাসিক।"[৬১]

জাহিলী যুগে আরব সমাজে কন্যারূপে নারীর বড়ই অমর্যাদা ছিল। কন্যা সন্তানকে জঘন্যভাবে ঘৃণ্য করা হতো। তাকে জীবিত কবর দেয়া হতো। স্বয়ং পিতা কন্যা সন্তানের জন্মকে চরম অপমানজনক মনে করতো। কুরআন মাজীদে কন্যা শিশুর অপমানের চিত্র এভাবে অংকন করা হয়েছে–

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনের মধ্যে ক্রোধ চেপে রাখে। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হল তার লজ্জায় সে নিজের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়; সে ভাবে অপমান সহ্য করেও তাকে জীবিত রেখে দেবে, না কি মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে ? জেনে রেখো, কত নিকৃষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত!"[৬২]

ইসলাম মানবতাবিরোধী এ কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মতই বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কন্যা সন্তানকে জীবিত

---

৬০. আল-কুরআন, ৯ : ৭১ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৬১. আল-কুরআন, ৯ : ৬৭ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

৬২. আল-কুরআন, ১৬ : ৫৮-৫৯
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ)يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

www.pathagar.com

প্রোথিত করলে কিয়ামতের দিন যে তার পিতাকে আল্লাহর দরবারে কঠোরভাবে জবাবদিহি করতে হবে, তাও কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলাম কন্যাসন্তানদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে। মৌলিক অধিকারে তাদেরকে পুরুষদের সমান অংশীদার করা হয়েছে। জাহেলীযুগে আরব সমাজে নারী সমাজ বড়ই অসহায় ছিল। স্বামীর সম্পদে তার কোন অধিকার ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেও স্ত্রী কোন অংশ পেত না। বিধবা নারীদের এই অসহায় অবস্থা দূর করার জন্য কুরআন ঘোষণা দিল–

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। তবে তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের আট ভাগের এক অংশ"।[৬৩]

ইসলাম মা হিসেবে নারীকে যে সম্মান দান করেছে পৃথিবীর আর কোন সম্মানের সাথে তার তুলনা হয় না। পিতা ও মাতা উভয়ের প্রতি সাধারণভাবে সম্মান প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করার পর কুরআনে মাতার প্রতি বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা, প্রসব করা এবং স্তন্য দান করার কষ্ট একাকী বহন করে থাকেন। এ তিন পর্যায়ের ক্লেশ ও যাতনায় পিতার কোন অংশ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

"আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দু'বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। সুতরাং শোকরগুজার হও আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।"[৬৪] মহান আল্লাহ বলেন–"আর তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে বিনম্রভাবে সম্মানসূচক কথা বলো। এবং তাদের সামনে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সাথে অবনত থেক, আর প্রার্থনা কর : হে আমার রব! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন"।[৬৫]

---

৬৩. আল–কুরআন, ৪:১২
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

৬৪. আল-কুরআন, ৩১ : ১৪ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

৬৫. আল-কুআন, ১৭ : ২৩-২৪ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

www.pathagar.com

সৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যখন উভয়ের প্রয়োজন একই রকম, তখন তাদের মধ্যে তারতম্য করা নিতান্তই অযৌক্তিক।

ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহ তাআলার কিতাবকে বিকৃত বা পরিবর্তন করে কিছু লোকের বা পুরুষ শ্রেণীর সুবিধাকে নিশ্চিত করার জন্য নারীদেরকে দুর্লক্ষণে বলে অভিহিত করে। তারা নারীদেরকে প্ররোচনা দানকারী প্রমাণ করার জন্য তাদের কিতাবগুলোর আয়াত পরিবর্তন করে প্রচার করেছে- আদম আ. কে মা হাওয়া আ. নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ানোর কারণে আজ আমাদের পৃথিবীতে আগমন, না হলে আমরা চিরদিন বেহেশতেই থাকতাম। অথচ আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

"এরপর শয়তান তাদের দু'জনকেই সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য প্ররোচিত করল, তারপর তাদের দু'জনকে বের করে ছাড়ল সেখান থেকে যেখানে তারা ছিল।"[৬৬]

আজকের পৃথিবী নারীদের দেহকে যেভাবে ভোগ ও পণ্যসামগ্রী বানিয়ে রেখেছে, অতীতেও একইভাবে তাদেরকে হীন-কুচক্রী আখ্যা দিয়ে শুধু ভোগ্য ও পণ্য বানিয়ে রেখেছিল।

জাহিলীযুগে মানুষ কন্যাসন্তান জন্মকে অশুভ বলে মনে করতো। আর এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জন্ম হওয়ার সাথে সাথে কন্যাসন্তান হত্যা করার রীতি চালু করা হয়। অথচ পুরুষ ও নারীশিশু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতে জন্মগ্রহণ করে। আজও যারা নানা অজুহাতে এই হত্যাকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করছে তারা জঘন্য অপরাধ করছে, তাদের ধারণায় যে সব কারণে কন্যাশিশুদেরকে জন্ম লগ্নেই হত্যা করা হতো, সে সব কারণ নিম্নে চিহ্নিত করা হল–

১. কন্যাসন্তানদেরকে বিয়ে দিতে গিয়ে অপরের কাছে ছোট হয়ে যেতে হয় এবং কন্যার নিরাপত্তার জন্য বরপক্ষকে বরাবরই তোয়াজ করতে হয়। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন মানুষ এটা সহ্য করতে চাইত না।
২. পৃথিবীতে মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে গেলে অবশ্যই যুদ্ধ-বিগ্রহ করে বীরত্বের পরিচয় দিতে হয়। এজন্য প্রয়োজন শক্তিশালী যোদ্ধা সন্তান। কন্যাসন্তানদের নিকট থেকে এ বীরত্ব আশা করা যায় না, বরং তাদের উপস্থিতি ও নিরাপত্তার চিন্তার কারণে ঝামেলামুক্তভাবে লড়াই করাও সম্ভব হয় না। এজন্যই জন্মলগ্নেই তাদেরকে হত্যা করা প্রয়োজন মনে করতো।
৩. পুত্র সন্তান শারীরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হওয়ার কারণে তারা পিতার সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। আর কন্যাসন্তান লজ্জার কারণ হয়।

এসব নানাবিধ কারণে তাদেরকে জন্মলগ্নেই হত্যা করা সমীচীন মনে করা হতো। আপাতদৃষ্টিতে এ কারণগুলো যথার্থ মনে হয়। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

---

৬৬. আল-কুরআন, ২ ঃ ৩২ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

www.pathagar.com

কুরআনের মধ্যে বর্ণিত একটি ঘটনা দ্বারা কন্যাসন্তান-এর গুরুত্ব পুরুষ সন্তানের গুরুত্ব থেকে যে কোন দিক দিয়ে কম নয়, তা জানিয়েছেন। কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে– *"স্মরণ করে দেখ, যখন ইমরানের স্ত্রী বলল- হে আমার রব, আমি আমার গর্ভস্থিত সন্তানকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আপনি তা কবুল করুন; নিশ্চয় আপনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। তারপর যখন সে কন্যাসন্তান প্রসব করল তখন বলল, হে আমার রব! আমি তো কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছি! অথচ আল্লাহ তাআলা তো ভাল করেই জানেন– সে পেটে কি ধারণ করেছিল। পুরুষ সন্তান কন্যাসন্তানের মত নয়। আমি তার নাম রেখেছি মারয়াম। শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমি তাকে ও তার সন্তানকে আপনার হেফাযতে সোপর্দ করলাম।"*[৬৭]

সূরা তাকবীরে বলা হয়েছে– "জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।"[৬৮]

এসব কথা দ্বারা জানা গেল, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই যখন সবার জন্ম; তখন কিছুসংখ্যক মানুষ তাদের ব্যক্তিগত ভুল চিন্তায় কন্যাসন্তানকে অপয়া, অপাংক্তেয় ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, কষ্ট প্রদান ও নিগ্রহ করে, যে অধিকার তাদেরকে দেয়া হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, এটাই সত্যি কথা– "পৃথিবীর জল ও স্থল ভাগের সর্বত্র ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে তখন, যখন ভ্রান্ত মানুষ নিজ হাতেই নিজের অকল্যাণের পথ নিজেরাই রচনা করবে।"[৬৯]

নর ও নারী নিয়ে মানব সমাজ। একজনকে বাদ দিলে বা কম গুরুত্ব দিলে অন্য জন দুর্বল হবেই, যেমন দু'টি হাত বাম ও ডান। বাম হাতের কাজ বাম হাত করবে, আর ডান হাতের কাজ ডান হাত করবে। এখন যদি এক হাতকে অবহেলা করা হয়, অন্য হাতটি অতিরিক্ত চাপে কাহিল হবেই। আবার যদি যার যা কাজ, তাকে তা না দিয়ে যথেচ্ছাচার করা হয়, তাতেও তো ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায় না। এজন্য প্রত্যেকটিকে তার নিজ নিজ স্থানে রেখে ব্যবহার করলে প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রতি সদাচরণ করা হয়।

যে যুক্তিতে কন্যাশিশুকে হত্যা করা হতো তার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে ওপরে যে তিনটি অজুহাত দেখানো হয়েছে সেগুলোর অসারতা একটু চিন্তা করলে বুঝা যায়।

মানবশিশু ধারণ, বহন, প্রসব ও লালন-পালনের জন্য যে গুণাবলি একান্ত জরুরি। নারীদেহে তা বিদ্যমান, মানবশিশু জন্মদানের উপযুক্ত করে সৃষ্টি করার কারণে

---

৬৭. আল-কুরআন, ৩ ঃ ৩৫ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

৬৮. আল কুরআন, ৮১ ঃ ৯-১০ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

৬৯. আল-কুরআন, ৩০ ঃ ৪১
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

www.pathagar.com

নারীদেহ অত্যন্ত নাজুক বা স্পর্শকাতর। কন্যাশিশুর যত্ন-নেয়া এবং তাকে তার চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলার ব্যাপারে মায়ের ভূমিকা প্রধান। পিতা রোজগার করে, মা খরচ করে। শিশুর পরিচর্যায় পিতা অর্থ যোগায়, মা দুধ পান করিয়ে তাকে বড় করে তোলে। আল্লাহর আইনে দুধ পান করানোর বয়স দু'বছর। এই দু'বছরে মা শুধু দুধ পান করানোর কাজই করেন না, নিজের ভাষা, মন-মানসিকতা, তার অজান্তেই শিশুর মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেন। ছেলেশিশুরা এই দুধ পানের বয়স পার হওয়ার সাথে সাথে বাইরে গিয়ে খেলতে ভালবাসে। আর মেয়েরা মাকে আগলে রাখে এবং ঘরে বা বাড়ির আঙিনায় খেলনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আল্লাহর রসূল স. বলেন, "নারী স্বামীগৃহের তত্ত্বাবধায়ক এবং এ সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৭০]

মহানবী স. বলেন, "যখন তোমাদের নেতাগণ হবেন উত্তম ব্যক্তি, ধনীগণ হবেন মহৎ-উদার আর পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তোমাদের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তখন পৃথিবীর উপরিভাগ এর অভ্যন্তর ভাগের চেয়ে অধিক প্রিয়। আর যখন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি হবে তোমাদের নেতা, ধনীরা হবে সবচেয়ে কৃপণ এবং নারীদের পরামর্শেই তোমাদের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তখন পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ হবে উপরিভাগের চেয়ে অধিক পছন্দের।"[৭১] আরো ঘোষিত হয়েছে- "যে নারী ঘরে অবস্থান করবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে ।"[৭২]

কন্যাসন্তানকে এমনভাবে প্রতিপালন করতে হবে, যেন তারা কুরআন ও হাদীসের মৌলিক শিক্ষা পায়, স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া বুঝে, আদর্শ মা, আদর্শ গৃহিণী, স্বামীর অনুগত ও সন্তানের প্রতি মমতাময়ী হয়ে কমপক্ষে দু'বছর দুধ পান করাতে উৎসাহিত হয়। কানযুল উম্মাল গ্রন্থে রসূলুল্লাহ স.-এর একটি কথার উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, যে মুসলিম নারী নিজ সন্তানকে-প্রসব করার পর প্রথম দুধপান করায় সে একজন মানুষকে জীবন দান করার সওয়াব পাবে। আজকের চিকিৎসাবিজ্ঞান স্বীকার করছে– "শিশু জন্মের পর প্রথম (শাল) দুধ শিশুর হৃদযন্ত্র, ফুসফুস ও পাকস্থলির স্বাভাবিক

---

৭০. বুখারী, ইমাম, আস-*সহীহ,* অধ্যায় : আল-জুমুআ, অনুচ্ছেদ : জুমুআতু ফিল কুরা ওয়াল মুদুনি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১ ; মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : ফাদিলাতুল ইমামিল আদিল.., প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৫৯
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

৭১. তিরমিযী, ইমাম, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফিন্ নাহয়ি আন সাব্বির রিইয়াহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬,
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا

৭২. আল-বুরহানপুরী, আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী ইবনে হুসামুদ্দিন আল হিন্দি, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল,* আলেপ্পো : ১৩৭৯ হিঃ
إيا امراة قعدت على أولادها فهي في الجنة

www.pathagar.com

কাজকে গতিময় করে। আবার শিশুর মায়ের প্রসবোত্তর বিভিন্ন কষ্ট নিরাময়ে এ স্তন্যদান সাহায্য করে। এ দুধে ভিটামিন এ প্রচুর পরিমাণে থাকে যা শিশুকে সেই পুষ্টি জোগায় যার কোন বিকল্প নেই। হাদীসে এসেছে-আবু মাসউদ আল-বাদরী রা. নবী করীম স. থেকে বর্ণনা করছেন, "কোন মুসলমান যখন তার পরিবারের জন্য অর্থ ব্যয় করে তা তার জন্য সদকাস্বরূপ হবে।"[৭৩]

আয়িশা রা. বলেন, "আমার কাছে একদিন এক অভাবগ্রস্ত মহিলা এলো। কোলে ছিল তার দুটি মেয়ে। আমি তাকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। অতপর দু'কন্যার প্রত্যেককে সে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি তুলল তার নিজের মুখে দেয়ার জন্য। কিন্তু খেতে পারল না; বরং সে তৃতীয় যে খেজুরটি নিজে খেতে চাচ্ছিল, তা ভাগ করে পুনরায় দু'মেয়েকে দিয়ে দিল। বড়ই চমৎকৃত করল আমাকে তার এই ব্যবহার। তখন আমি রসূলুল্লাহ স. কে তার এই কাজের কথা বললাম। এ কথা শুনে তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন অথবা বলেছেন, তাকে পরিত্রাণ করে দিয়েছেন দোযখের আগুন থেকে।"[৭৪]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "যার তিনটি কন্যা আছে, সে তাদেরকে লালন-পালন করে, এবং তাদেরকে আদর ও সোহাগ করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। ঐ গোত্রের এক লোক বলে উঠল– ইয়া রাসূলাল্লাহ স. যদি দু'টি কন্যা থাকে? তিনি বললেন, হ্যাঁ দু'টি থাকলেও।"

নবী স. বলেছেন, "আমি কি বলব তোমাদেরকে কোনটি উত্তম সাদকা? শোন, সেটা হচ্ছে, তোমার সেই কন্যাটির জন্য দান, যাকে স্বামীর গৃহ থেকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে আর তুমি ছাড়া তার জন্য রোজগার করার কেউ নেই।"[৭৫]

মানুষ যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে তার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে দেয়া হলো-

---

৭৩. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : ফাদলিন্ নাফাকাতি.., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫, বুখারী, ইমাম, আস-*সহীহ,* অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ : মা জাআ আন্নাল আমালু বিন্ নিয়্যাত ওয়াল হাসবাতু.., প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯
عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة

৭৪. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : বিররি ওয়াস্সিলাতি ওয়ালআদাবি, অনুচ্ছেদ : ফাদলিল ইহসানি ইলাল বানাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০২৭, হাদীস নং ২৬৩০
عن عائشة أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار

৭৫. বুখারী, ইমাম, আস-*সহীহ,* অধ্যায় : আলমাগাযি, অনুচ্ছেদ : নম্বর ১২ (শিরোনামহীন) আল-কুতুবুসসিত্তা, রিয়াদ : ২০০০ পৃ. ৩২৭, হাদীস নং ৪০০৬
عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة

www.pathagar.com

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে এসে অবিরামভাবে কাঁদতে শুরু করল। তাকে রসূলল্লাহ স. সান্ত্বনা দিতে তার দুঃখের কথা প্রকাশ করতে বললেন। সে দীর্ঘক্ষণ কান্নার পর বলল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ স. আমি যে নিষ্ঠুরতা করেছি তার কোন ক্ষমা হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ স. অভয় দিয়ে তাকে বললেন, মানুষ যখন সর্বান্তকরণে তাওবা করে তখন সে সদ্যপ্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। এরপর আরো অনেকক্ষণ কাঁদার পর সে তার অপরাধের বর্ণনা দিতে শুরু করল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ স. স্ত্রী আমার গর্ভবতী থাকা অবস্থায় আমি বাণিজ্যে যাই। ফিরে আসলে স্ত্রী বলল, একটি মরা মেয়ে হয়েছিল, তাকে ফেলে দিয়েছি। আমি বিশ্বাস করে নীরব হয়ে গেলাম। স্ত্রী আমার ভয়ে ভূমিষ্ঠ কন্যাকে তার বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। বোন ১২ বছর ধরে সস্নেহে তাকে মানুষ করতে থাকে। যখন সে বড় হয় এবং খুবই সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী হয় তখন স্ত্রীর মনে আশা জাগে যে, আমার মনে এমন সুন্দর মেয়ের প্রতি মমত্ববোধ দেখা দেবে এবং অবশ্যই তাকে হত্যা করবে না। এই আশায় সে আমাকে ঘটনাটা একদিন খুলে বলে। তখন আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল কিন্তু মনের মধ্যে সব কিছু চেপে রেখে পরিকল্পনা আঁটতে থাকি, অভিনয় করতে থাকি মায়া-মমতার। মেয়েকে সদা-সর্বদা মা মা বলে ডাকতে থাকি। বেশ কিছু দিন চলে যাওয়ার পর যখন স্ত্রী নিশ্চিন্ত হল যে, আমি এত বড় আদরের মেয়েকে আর হত্যা করব না। তখন এক কাজের দোহাই দিয়ে তাকে আমি দূরে এক জঙ্গলের কাছে নিয়ে যাই। আগে থেকেই সেখানে একটি গভীর গর্ত খুঁড়ে রেখে এসেছিলাম। ওখানে পৌছতেই হঠাৎ একটি দামি জিনিস তার অজান্তে ফেলে দেই এবং তাকে সস্নেহে মা বলে ডাক দিয়ে ওটা তুলে আনতে বলি এবং আমি অন্য কাজের ভান করে অন্য দিকে সরে যাই। সে নেমে যাওয়ার পর দ্রুতগতিতে ফিরে এসে উপর্যুপরি পাথর নিক্ষেপ করতে থাকি এবং অবশেষে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলি। পাথর নিক্ষেপের সময়ে পুরোপুরি ঢাকা না পড়া পর্যন্ত সে চিৎকার করে করে বলে চলেছিল "আব্বা আপনি কি করছেন? আব্বা আপনি কি করছেন? কিন্তু আমার মনে কোন করুণার উদ্রেক হয়নি।" এতটা বলার পর আবারও সে ডুকরে কেঁদে উঠল। রসূলুল্লাহ স. কিছুক্ষণ নীরবে থেকে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। এই ছিল তখনকার আভিজাত্যবোধ; বরং সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করাকে একট বীরত্বপূর্ণ কাজ মনে করে গৌরবের সাথে কন্যা হত্যা করে বলা হত অবাঞ্ছিত হবু জামাইয়ের উপর প্রতিশোধ নেয়া হল।

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স. যে বিপ্লব সৃষ্টি করলেন তার দ্বারা গোটা ইসলামী সমাজের মন মানসিকতা ও চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। নিচে বর্ণিত একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এ ব্যাপারটি বোঝার জন্য যথেষ্ট হবে।

মক্কা বিজয়ের পর মদীনার পথে রসূলুল্লাহ স. রওয়ানা হচ্ছিলেন, সেই সময়ে একটি শিশু মেয়ে চাচা-চাচা বলে দৌড়ে এলো। আলী রা. তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং

www.pathagar.com

পরে ফাতিমা রা.-এর নিকট গিয়ে বললেন-নাও, এটি তোমার চাচার মেয়ে, মেয়েটি ছিল হামযা রা.-এর। জাফর ইবনে আবূ তালিব এবং ইবনে হারিসা রা. এ মেয়েটিকে নেয়ার জন্য নানা যুক্তি পেশ করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ স. সবার যুক্তি শোনার পর জাফর রা.-এর কথাকে প্রাধান্য দিলেন। মেয়েটির খালা ছিল জাফর রা.-এর স্ত্রী তাই রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত।'[৭৬] মেয়েরা মায়ের জাতি, তাদের মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে রসূল স. বলেছেন- "মায়েদের পদতলে সন্তানের জান্নাত।"[৭৭]

নবী স. হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন সাহাবীগণকে পশু কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন তখন কেউ কুরবানী দিচ্ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি বিব্রতবোধ করলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা রা.-এর সাথে পরামর্শ করলেন। উম্মে সালামা রা. তাঁকে নিজের পশু সর্বাগ্রে কুরবানী করার পরামর্শ দিলেন। নবী স. তাই করলেন। তারপর তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও নিজনিজ পশু কুরবানী করলেন।[৭৮]

হাদীসের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, "একবার সম্মিলিত নারী সমাজ মহানবী স.-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের একজনকে আমীর নিয়োগ করেন। আয়িশা রা. মহিলাদের নিয়ে তারাবীহর নামায পড়তেন।"[৭৯]

নারী নেতৃত্ব সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. বলেন : "সাবা জাতির রাণী বিলকিস যেভাবে পরামর্শ পরিষদের সহায়তায় রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, অনুরূপ ব্যবস্থার অধীনে নারী নেতৃত্ব অনুমোদনযোগ্য।"[৮০]

ইমামা আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ র.-এর মতে, "নারী শ্রম-বিনিয়োগের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে।"[৮১]

হদ্দ ও কিসাস ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যেমন- বিবাহ, তালাক, অসিয়ত, হাওয়ালা, ওয়াক্ফ,হেবা, সন্ধি ইত্যাদি।[৮২]

---

৭৬. তিরমিযী, ইমাম, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস্সিলাতি আন রাসূলিল্লাহি স., অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফি বিররিল খালাতি, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৩, হাদীস নং ১৯০৪,
عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم

৭৭. আল-জুরজানী, মুহাম্মদ বিন আবু আহমদ, *আল কামিল ফি দু'আফায়ির রিজাল,* বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৮, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭
عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات

৭৮. আল-জাওযিয়্যা, ইবনু কায়্যিম, *যাদুল মাআদ*, মিসর : মাতবাআ মুস্তফা আল-বাবিল হালবী, ১৯৫০, পৃ. ৩৮৩

৭৯. হান্নান, শাহ আব্দুল, *নারী ও বাস্তবতা,* ঢাকা ও চট্টগ্রাম: এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০১, পৃ. ২৭

৮০. প্রাগুক্ত

৮১. আল-কাসানী, *আল-বাদায়ে ওয়াস সানায়ে (উর্দূ),* তা.বি, খ. ৪, পৃ. ৪৯৭-৪৯৮

www.pathagar.com

নারীর একান্ত গোপনীয় বিষয়ে এককভাবে নারীর সাক্ষ্য, এমনকি একজন নারীর সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। যেমন-কোন নারী কুমারী কি-না, কোন নারীর ঋতুকালীন সময় শেষ হয়েছে কি-না ইত্যাদি। আধুনিক ফিকহবিদগণ বলেন যে, নারীরা সাধারণত কোমলপ্রাণ হয়ে থাকে। দণ্ডবিধি বিষয়ে সাক্ষ্যদানে তারা বিব্রতবোধ করতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলা হয়েছে। তবে বিচারক ইচ্ছা করলে এক্ষেত্রেও নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন।[৮৩] আল্লাহ্ তাআলা বলেন– "তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না।"[৮৪] "পুরুষ নারীর সমকক্ষ নয়।"[৮৫] ইসলামী জীবন দর্শনে একাধিক বিয়ের অনুমতি থাকলেও অধিকাংশ মুসলিমই এক বিয়ে করে থাকেন। হিন্দু ধর্মের উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী, পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং প্রপৌত্রের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান মীরাস স্বত্ব থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। উপরিউক্ত ছয় জনের কেউ জীবিত না থাকলে কেবল কন্যা মীরাস স্বত্ব লাভ করে।"[৮৬]

বৌদ্ধ ধর্মের উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীদের যে দীর্ঘ তালিকা পেশ করা হয়েছে তাতে পুত্র থেকে শুরু করে পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি হয়ে প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রায় সবাই পুরুষ। অথচ এ তালিকায় মৃতের স্ত্রী, কন্যা, বোন ও পৌত্রীর নাম উল্লেখ নেই। খ্রিস্টধর্মের উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বোন, পিতা-মাতা, প্রত্যেকেই কমবেশি উত্তরাধিকার লাভ করে। কিন্তু নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ নেই।[৮৭]

নর–নারীর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমতা থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ সমাজে শৃঙ্খলা বিধান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কারো উপর কাউকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মীরাস বণ্টনে নর–নারীর তারতম্য বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন, "পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার প্রাপ্য অংশ। আর প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[৮৮]

---

৮২. আল-মারগীনানী, শায়খ বুরহানুদ্দীন, *আল-হিদায়া*, তা.বি, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, খ. ৩, পৃ. ১৩৮-১৩৯

৮৩. রহমান, গাজী শামছুর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, খ. ১, ভাগ-২, পৃ. ২৭০

৮৪. আল-কুরআন, ৪ : ২০

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

৮৫. আল-কুরআন, ৩ :৩৬ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى

৮৬. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, *ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারাইয*, ঢাকা : আর আই এস পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫, পৃ. ১৪০

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৮৮. আল-কুরআন, ৪ : ৩২

www.pathagar.com

বাহ্যিকভাবে পুরুষের মীরাস বেশি মনে হলেও নারী পায় পুরুষের চেয়ে বেশি : মধ্যপ্রাচ্যের খ্যাতিমান চিন্তানায়ক ও আইনবেত্তা শাইখ আলী সাবুনী তাঁর "আল-মাওয়ারিসু ফী শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ" গ্রন্থে একটি উপমা দিয়েছেন : "মনে করুন, কোন এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে তিন হাজার দীনার এবং একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রেখে গেল। ইসলামের মীরাসী আইন মোতাবেক ছেলে পায় দুই হাজার দীনার এবং মেয়ে পায় এক হাজার দীনার। এমতাবস্থায় ছেলেটি বিবাহ করে তার স্ত্রীকে দুই হাজার দীনার দেনমোহর দিল-এখন সে কপর্দকহীন। তারপর তার বোনটির বিবাহ হলো। তার স্বামী তাকে দেনমোহর বাবদ দুই হাজার দীনার দিল। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে, মেয়েটি তার পিতার সম্পদ থেকে ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক সম্পদ পাওয়া সত্ত্বেও এখন সে তিন হাজার দীনারের মালিক আর তার ভাই পিতৃ সম্পদ থেকে দ্বিগুণ সম্পদ পাওয়া সত্ত্বেও সে কপর্দকশূন্য। অথচ এরপরও স্ত্রীর ভরণপোষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং পিতা-মাতা ও ভাইবোনদের দায়িত্ব তার উপর বাধ্যতামূলক। আর তার বোনটি তিন হাজার দীনারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার উপর অবশ্যপালনীয় কোন অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব নেই। এবার ভেবে দেখুন, পিতার পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মালিক মেয়ে তিন হাজার দীনার সঞ্চয়ের সুযোগ পেল। এ পর্যায়ে দেখা যায়, কন্যা সন্তানকেই ইসলাম পুত্র সন্তানের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত তারই প্রমাণ বহন করে।"[৮৯]

উপরের পর্যালোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামই কেবল কন্যা শিশু তথা নারী জাতির সঠিক ও যথার্থ আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে।

উপসংহার

আলোচিত প্রবন্ধে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের নিরিখে যে বক্তব্য বিবৃত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম প্রদত্ত কন্যা শিশুর আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারই ন্যায়ানুগ, ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতার নিরীখে যথার্থ। এর বেশি বা কম করা হলে তা মানবতা, মানব প্রজন্ম এবং স্বয়ং কন্যাশিশুর জন্য অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর হতো। মহাবিজ্ঞানী ন্যায়বিচারক ও সঠিক বণ্টনকারী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানবতার কল্যাণেই তাঁর আইন করেছেন। মানুষের বুঝে না আসলেও তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। তা না হলে মানব সভ্যতা ও মানবতার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

[৮৯] সাম্ভলী, মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন, *পারিবারিক সংকট নিরসনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩, পৃ. ১৭৩- ১৭৪

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৭, সংখ্যা-২৮
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১১

ইসলামের দৃষ্টিতে দরিদ্র ও দারিদ্র্য

সারওয়ার মো. সাইফুল্লাহ্ খালেদ*

[সারসংক্ষেপঃ দরিদ্র ও দারিদ্র্য বর্তমান বিশ্বে একটি অন্যতম আলোচিত বিষয়। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের বস্তুগত ধারণার সাথে ইসলামী ধারণার কোন মিল নেই। ইসলাম ইহকাল এবং পরকালের কল্যাণে ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যয় করতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শনে পারলৌকিক বিষয়াদি তেমন প্রাসঙ্গিক বলে ধরা হয় না। যুগে যুগে মুসলমানদের মধ্যে এমনও দেখা গেছে এবং এখনো হয়তো বা তেমন মুসলমান খুঁজে পাওয়া যাবে যারা পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় বা কেবল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইহলোকে বিত্তশালী হওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। এরা প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েও জৌলুস-হীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত। আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে বিঘ্ন ঘটতে পারে বিবেচনা করে ইহলৌকিক ভোগ-বিলাস তাঁরা এড়িয়ে চলেন। যেটুকু বৈষয়িক সম্পদ হাতে না রাখলে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে মনের একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে সামান্যটুকু হাতে রেখেই তাঁরা তুষ্ট। বৈষয়িকভাবে তাঁরা নিতান্তই দরিদ্র জীবন যাপন করলেও আত্মার পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধিতে তাঁরা অনেক মহান এবং উন্নত। এই উন্নত ও মহান আত্মা তাঁরা মহান আল্লাহ্র প্রতি নিবেদন করেন। কিন্তু তাই বলে ইসলাম দারিদ্র্যকে আদর্শায়িত করে না, যেমন হালাল পথে অর্জিত ধনও প্রয়োজনাতিরিক্ত নিজ অধিকারে রাখাকে প্রশ্রয় দেয় না। শরীয়তের বিধান অনুসারে উত্তরাধিকার বিধি ও যাকাত প্রদানের মাধ্যমে হালাল সম্পদের সুসমবণ্টনে ইসলাম বিশ্বাসী। ইসলাম দারিদ্র্যকে ভালবাসে, তবে দারিদ্র্যকে কামনা করেনা। এ নিবন্ধে দরিদ্র ও দারিদ্র্যকে প্রথমত পশ্চিমা বৈষয়িক দৃষ্টিকোণ এবং দ্বিতীয়ত ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে এটাই দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দরিদ্র ও দারিদ্র্যের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিই উত্তম। নিবন্ধটি সাজানো হয়েছে এভাবে-দরিদ্র ও দারিদ্র্যের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা, দরিদ্র ও দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলাম, ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্যের কারণ।]

ভূমিকা : আমরা সচরাচর দরিদ্র ও দারিদ্র্য শব্দ দুটি পশ্চিমা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে থাকি। এই বিবেচনায় বস্তুগত দারিদ্র্যই প্রাধান্য পেয়ে থাকে যা মূলত বস্তুগত সম্পদের মালিকানা ও ভোগ বিলাসের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইসলাম দরিদ্র ও দারিদ্র্যকে কেবল সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে দরিদ্রকে মূলতঃ দু'ভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে: (১) বৈষয়িক বা বস্তুগত দরিদ্র এবং (২) আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য। দ্বিতীয় প্রকারের দরিদ্র যা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত তা পশ্চিমা অর্থনৈতিক আলোচনায় তেমন একটা প্রাধান্য

* সাবেক স্টাফ ইকনোমিস্ট (১৯৬৮-১৯৭০), পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকনোমিক্স, করাচি, ও সাবেক প্রফেসর, অর্থনীতি ও উপাধ্যক্ষ, কুমিল্লা উইমেন্স কলেজ, কুমিল্লা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

পায় না। এমন কি বস্তুগত দরিদ্র নিরসনের উপায় অবলম্বনের ক্ষেত্রেও যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক বিধিবিধান মেনে চলতে হয়, তার উপরও পশ্চিমা অর্থনীতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করে না। আল্লাহ্ বলেন: "তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না"।[১] ইসলাম এ ক্ষেত্রে মানবজাতিকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেয়, কারণ ইহকালই শেষ কথা নয়। ইহকালের কর্মকাণ্ডের জন্য প্রত্যেককে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। তাই ইহকাল ও পরকালে কল্যাণকর এমন আর্থিক জীবন যাপনের প্রতি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন : "মানুষের মধ্যে যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ইহকালেই দাও বস্তুত পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ নাই। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা কর-তাহারা যা অর্জন করিয়াছে তাহার প্রাপ্য অংশ তাহাদেরই। বস্তুতঃ আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।"[২] অধিকন্তু আল্লাহ আরো বলেন: "পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না?"[৩] কেননা "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে"।[৪] "এবং তোমাদের মৃত্যু হইলে অথবা তোমরা নিহত হইলে আল্লাহরই নিকট তোমাদিগকে একত্র করা হইবে।"[৫] আল্লাহ বলেন: "শুধু আমাকে ভয় কর"।[৬] সুতরাং এ আল্লাহভীতিই পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ ও সাফল্য অর্জনের প্রধান নিয়ামক। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদেরকে দরিদ্র ও দারিদ্র্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে, পশ্চিমা নীতি-আদর্শহীন বস্তুগত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

দরিদ্র ও দারিদ্র্যের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা

১. দরিদ্র ও দারিদ্র্যের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা: পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী দারিদ্র্যের পরিমাপ কি কেবল জনপ্রতি প্রয়োজনীয় কেলরি (Calorie) গ্রহণের মাত্রার ভিত্তিতে শরীর ঠিক রেখে বেঁচে থাকাটাই জরুরি বুঝতে হবে? নাকি জীবনের সাথে

---

১. আল-কুরআন. ৪;২৯ لا تَأكُلوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

২. আল-কুরআন, ২:২০০-২০২

فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۟ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

৩. আল-কুরআন, ৬:৩২

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

৪. আল-কুরআন, ৩:১৮৫ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ

৫. আল-কুরআন, ৩:১৫৮ وَلَئِنْ مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ

৬. আল-কুরআন, ৫:৩ وَٱخْشَوْنِ

www.pathagar.com

যুক্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন ইত্যাদিরও প্রয়োজন আছে? এ ছাড়াও যে বিষয়টি অধিক বিবেচনার দাবি রাখে তা হলো দারিদ্র্যের ধারণাটি কি দেশ কালের প্রেক্ষিতে 'অবিমিশ্র' (Absolute), 'আপেক্ষিক' (Relative) নাকি 'পরিবর্তনশীল' (Dynamic)? অর্থাৎ দরিদ্র কি এমন একটি প্রপঞ্চ (Phenomenon) যা সামাজিক ও ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা নির্ধারিত, নাকি এমন একটি অবস্থান যা কতিপয় সর্বকালীন স্থির সূচক (Static Index) দ্বারা নির্ধারিত।

যে আর্থিক অবস্থাকে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে দারিদ্র্য বলা হত না, আজকের সমাজব্যবস্থায় তাকে দারিদ্র্য বলতে কেউ দ্বিধা করবে না। সমাজে যদি কমবেশি সকলেই একই জীবন যাত্রার মান ভোগ করে তবে সেখানে কেউ কাউকে দরিদ্র বলার সুযোগ থাকে না। সে সমাজে কেউ নিজেকে দরিদ্র ভাবারও কারণ থাকে না। অপরদিকে, কোন দেশ বা সমাজের ভেতরে কিংবা বাইরের কোন দেশে যদি ধন বৈষম্য থাকে এবং সমাজের একটি অংশ অপর অংশের তুলনায় অধিক বিত্তশালী বা ধনী হয়, তাহলে তুলনামূলকভাবে দরিদ্র অংশটির অবস্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ দারিদ্র্যের অনুভূতি সমাজে বা বিভিন্ন দেশের মধ্যে ধন বৈষম্যের মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "দারিদ্র্য সীমারেখা (poverty line) হয়েছে প্রতি বয়স্ক মানুষের জন্য বার্ষিক ১০,৮৩০ ডলার এবং চারজনের একটি পরিবারের বার্ষিক ২২,০৫০ ডলার আয়ের নিরিখে"।[৭] অপরদিকে, Bangladesh, with a 2000 gross national income per capita of just $380 which at purchasing power parity becomes $1,650 per capita and with a (current population of 160 million) and with 29% of the population live on less than $1 a day (or less than $365 per year) and 78% live on less than $2 a day (or less than $730 per year)।[৮] এ হিসেবের ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে গড়ে চার সদস্য বিশিষ্ট প্রায় চার কোটি পরিবারের প্রতিটির বাৎসরিক আয় প্রায় ৬,৬০০ মার্কিন ডলার। এর মধ্যে মোট পরিবার সংখ্যার ২৯% অর্থাৎ ১.১৬ কোটি পরিবারের (জনপ্রতি দৈনিক ১ মার্কিন ডলারের কম হিসেবে) বার্ষিক আয় ১,৪৬০ মার্কিন ডলারের কম এবং ৭৮% অর্থাৎ ৩.১২ কোটি পরিবারের (জনপ্রতি দৈনিক ২ মার্কিন ডলারের কম হিসেবে) বার্ষিক আয় ২,৯২০ মার্কিন ডলার। এ হিসেব থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, মার্কিন মুল্লুকের যে

[৭]. মিতবাক, দিন বদলায়, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫৮তম বর্ষ, ৩২৩ তম সংখ্যা, ২৩ নভেম্বর, ২০১০, পৃ. ১০

[৮]. Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith, *Economic Development*, Delhi: Eight Edition, Published by Pearson Education (Singapore) Pte. Ltd., Indian Branch, 2008, p. 503.

www.pathagar.com

সকল বয়স্ক সদস্য দারিদ্র্য সীমায় অবস্থান করছে তারা বাংলাদেশের গড়পরতা চার সদস্য বিশিষ্ট যে কোন পরিবারের তুলনায় সচ্ছল। আবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে সকল চার সদস্য বিশিষ্ট পরিবার বার্ষিক ২,৯২০ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি বা কম আয় নিয়ে জীবন যাপন করছে তারা চার সদস্যের ঐ সকল পরিবারের তুলনায় সচ্ছল যাদের বার্ষিক আয় ১,৪৬০ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি বা কম, যদিও এটা সত্য যে, উভয় শ্রেণীর বার্ষিক আয়ের পরিবারগুলোই মার্কিন মানদণ্ডে চরম দারিদ্র্য জীবন যাপন করছে। "বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানবেতর জীবনধারা যেমন দেখি, সে রকম দারিদ্র্য আমেরিকায় চোখে পড়েনি কোথাও। এর কারণ, বিকশিত বাজার অর্থনীতির দেশ আমেরিকায় আর আমাদের দেশের জাতীয় বা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত দারিদ্র্যসীমারেখা এক নয়"।[৯] এ থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, দারিদ্র্য সীমায় অবস্থানরত মার্কিন মুল্লুকের বয়স্ক সদস্য ও চার সদস্য বিশিষ্ট পরিবারগুলোর বার্ষিক আয় বাংলাদেশের অধিকাংশ সচ্ছল পরিবার ও সদস্যদের সমান্তরাল বা বেশি বিবেচনা করা যেতে পারে।

ভেবে দেখুন, "সে প্রস্তর যুগের আদিম সাম্যবাদী সমাজে, যখন সব মানুষ অতি অল্প পরিমাণ সম্পন্ন হলেও সমাজের মোট জীবন-উপকরণ সবাই মিলে সমান ভাগ করে নিয়ে জীবন যাপন করত, তখন কি কেউ নিজেকে দরিদ্র (কিংবা ধনী) বলে অনুভব করত? এসব বিবেচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দারিদ্র্য হলো একাধারে একটি বস্তুনির্ভর বাস্তবতা এবং তার চেয়েও বেশি, তা হলো একটি সামাজিক অনুভব যা সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা দ্বারা কালপরিক্রমায় একেক মাত্রায় ও রূপে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সমাজে বৈষম্যের মাত্রা দ্বারা বহুলাংশেই দারিদ্র্যের চেহারা ও অনুভব নির্ধারিত হয়"।[১০]

এ ধরনের ধন বৈষম্য ইসলাম সমর্থন করে না: "আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদিগকে নিজেদের জীবনোপকরণ হইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদের সমান হইয়া যায়। তবে কি তাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে?"[১১] এ থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, ইসলাম ধন-সম্পদের ব্যক্তি মালিকানায় আস্থা রেখেই এর শরীয়া ভিত্তিক সমবণ্টনে বিশ্বাসী।

---

৯. মিতবাক, দিন বদলায়, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫৮তম বর্ষ, ৩২৩ তম সংখ্যা, ২৩ নভেম্বর, ২০১০, পৃ. ১০

১০. সেলিম, মুজাহিদুল ইসলাম, ক্ষুদ্রঋণের জন্য 'খাই-খালাসী আইন' প্রয়োজন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫৮তম বর্ষ, ৩২২তম সংখ্যা, ২২ নভেম্বর, ২০১০, পৃ. ১০

১১. আল-কুরআন, ১৬:৭১ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ

www.pathagar.com

২. পশ্চিমা পুঁজিবাদী সমাজে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কারণ: এ কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে সংক্ষেপে বলা যায়– "The cornerstone of the capitalist mode of production is, however, the fact that our present social order enables the capitalists to buy the labour power of the worker at its value, but to extract from it much more than its value by making the worker work longer than is necessary to reproduce the price paid for the labour power. The surplus-value[১২] produced in this fashion is divided among the whole class of capitalists and landowners, together with their paid servants, from the Pope to the Keiser down to the night watchman and bellow. We are not concerned here with how this distribution comes about, but this much is certain: that all those who do not work can live only on the pickings from this surplus-value, which reach them in one way or another."[১৩]

পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ জাতীয় শ্রম-শোষণ ইসলামী অর্থনীতিতে নৈতিকতা পরিপন্থী। "দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়, যাহারা লোকেদের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়"।[১৪] আরো বলা হয়েছে, "শ্রমিকের পারিশ্রমিক ও ঋণ পরিশোধ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের টালবাহানা করা জুলুম"।[১৫] আল্লাহ্ বলেন: "প্রতিশ্রুতি পালন করিও; নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে"।[১৬] শ্রমিকের ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায়ে টালবাহানাকারীকে আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

৩. পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক ব্যস্ততা: পুঁজিবাদে বস্তুগত সম্পদ আহরণে তৎপর পাশ্চাত্যের মডেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। "আমেরিকা জোর গলায় দাবি করে, তাদের

---

১২. মার্কস-এর ভাষায়: "[The] increment or excess over the original value I call 'surplus-value'. The value originally advanced, therefore, not only remains intact while in circulation, but adds to itself a surplus-value or expands itself. It is this movement that converts into capital. Surplus-value .... splits up into various parts. Its fragments fall to various categories of persons, and take various forms, independent the one of the other, such as profit, interest [i.e. Usury], merchants' profits, rent, &c. .... Whatever be the proportion of surplus-value the industrialist capitalist retain for himself, or yields up to others, he is the one who, in the first instance, appropriates it." *Vide*. Marx, *Capital*. Vol. I. 1984. Pp. 149, 529-530.

১৩. Marx, Karl, Frederick Engels, *Selected Works*, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1962. Vol. I, p. 558.

১৪. আল-কুরআন, ৮৩:১-৩
وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

১৫. মান্নান, অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০. পৃ. ৪৯৯ এই গ্রন্থে হাদিসটি বুখারী ও মুসলিম, সূত্র: মিশকাত, পৃ. ২৫১ থেকে উদ্ধৃত। مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

১৬. আল-কুরআন, ১৭:৩৪ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

www.pathagar.com

কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবার, বন্ধু ও বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবে তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হয় বস্তুগত নানা সংগ্রহ ও ভোগ্যপণ্যের চাহিদা পূরণের জন্য। কোন না কোনভাবে আমেরিকানরা বাজারের দাস হয়ে পড়ছে। শুধু আমেরিকা নয়, বিশ্ব জুড়েই ক্রমশ বেশি বেশি মানুষ এই ভাগ্য বরণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে"।[১৭] এ বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক্ অবহিত: "মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না"।[১৮] সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল-কুরআনের সাবধান বাণী: "হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং প্রবঞ্চক (শয়তান) যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত না করে"।[১৯] পাশ্চাত্যের বস্তুগত কল্যাণ সাধনায় ত্বরাপ্রিয় ব্যস্ত পরলোকে বিশ্বাসহীন মানুষ নিজের অজান্তেই নিজের অকল্যাণ করে বসে: এবং যাহারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি মর্মন্তুদ শাস্তি। আর মানুষ অকল্যাণ কামনা করে; যেইভাবে কল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো অতি মাত্রায় ত্বরাপ্রিয়"।[২০]

বস্তুতান্ত্রিক নাস্তিকতা মানবজাতির জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অকল্যাণকর, যা ইসলাম পছন্দ করে না; কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ ও অন্যান্য দেশে এমন কি মুসলিম দেশেও তাদের অনুসারীরা সে দিকেই ধেয়ে চলেছে। আল্লাহ্ বলেন: "মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়"।[২১]

দরিদ্র ও দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলাম

১. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য: বৈষয়িক দরিদ্র ও দারিদ্র্য বিষয়ে ইসলামী ধারণা প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমাদের জেনে নেয়া প্রয়োজন আল্লাহ্ কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ বলেন: "আমি সৃষ্টি করিয়াছি জিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে। আমি উহাদের নিকট হইতে জীবিকা চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে, উহারা আমার আহার্য যোগাইবে। আল্লাহ্ই তো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত"।[২২]

---

[১৭]. মিতবাক, দিন বদলায়, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫৮ তম বর্ষ, ৩২৩ তম, সংখ্যা, ২৩ নভেম্বর, ২০১০, পৃ. ১০

[১৮]. আল-কুরআন, ৪১:৪৯ لاَ يَسْاَمُ الإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ

[১৯]. আল-কুরআন, ৩৫:৫
يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ

[২০]. আল-কুরআন, ১৭:১০-১১ وانَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً

[২১]. আল-কুরআন, ১০৩:১-৩ وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

[২২]. আল-কুরআন, ৫১: ৫৬-৫৮ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَآ اُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ اُرِيدُ اَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

www.pathagar.com

আল্লাহ্ প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন: "সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও"।[২৩] তিনি আরোও বলেন: "তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, তাহাদের না আছে পথনির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব"।[২৪] আল্লাহ্ মানুষকে নির্দেশ করেন: "তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন; অতএব তোমরা উহার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হইতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁহারই নিকট"।[২৫] অতঃপর আল্লাহ্ বলেন: "আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না"।[২৬] এ ভাবে পৃথিবীতে রিয্ক অন্বেষণ, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন ও অপরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে আখিরাতে সফলকাম হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র ইবাদত্ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

২. দরিদ্র ও দারিদ্র্যের ইসলামী ধারণা: ইসলামী জীবন দর্শনে দারিদ্র্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (ক) আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য এবং (খ) বস্তুগত দারিদ্র্য। ইসলাম যদিও আধ্যত্মিক সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় তবুও এ বিষয় উপেক্ষা করেনি যে, মানুষের জন্য সে পরিমাণ পার্থিব সম্পদ অর্জন করা প্রয়োজন, যে পরিমাণ সম্পদ না থাকলে আল্লাহ্‌র ইবাদতে সম্পদের ঘাটতি জনিত উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ বলেন: "আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না"।[২৭] অর্থাৎ সে পরিমাণ অর্জিত বস্তুগত সম্পদও পৃথিবীতে

---

[২৩]. আল-কুরআন, ৬২:১০ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَاةُ فَٱنتَشِرُوا فِى ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[২৪]. আল-কুরআন, ৩১:২০ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى ٱلأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

[২৫]. আল-কুরআন, ৬৭:১৫
هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ

[২৬]. আল-কুরআন, ২৮:৭৭ وَٱبْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

[২৭]. আল- কুরআন, ২৮:৭৭ وَٱبْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا

www.pathagar.com

পার্থিব চিন্তামুক্ত মনে পারলৌকিক কল্যাণ ও সাফল্য লাভে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে তাঁর ইবাদতের পথ সুগম করার জন্যই ব্যয় করতে হবে।
আমরা এখানে এ দু'প্রকার দারিদ্র্য নিয়ে আলোচনা করব।

ক. আধ্যাত্মিক দারিদ্র্যঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এই দুনিয়ায় সীমিত কালের জীবন যাপনের মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো পারলৌকিক অনন্ত জীবনের মুক্তির পাথেয় সঞ্চয় করা। মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হলো আল্লাহ্ সৃষ্ট এই সীমাহীন বিশ্বজগতের জ্ঞান আহরণ করা, যাতে তারা আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছতে পারে এবং সেখানে তারা সেই সব প্রিয় মহামানবদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে যারা আল্লাহ্র সীমাহীন সৌন্দর্যের সাক্ষ্যদানে যথোপযুক্ত। এই অবস্থান লাভই তাদের জন্য সৌভাগ্যের চূড়ান্ত পর্যায় এবং এটাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্য মহাপুরস্কার-জান্নাত বা বেহেশ্ত। পরকালে এই অবস্থান লাভের জন্যই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানেই তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।

এ দুনিয়ায় মানুষ দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীলঃ একটি আত্মার বিকাশের পক্ষে যা কিছু ক্ষতিকর সে সকল কারণ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং আত্মার বিকাশের ও পরিপূর্ণতার সহায়ক বিষয়গুলো অনুসন্ধান ও নির্ধারণ করা। অপরটি দেহের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলো থেকে আত্মরক্ষা করা ও দেহের সুস্থতা রক্ষার পন্থাগুলো অবলম্বন করা। আল্লাহ্ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও তাঁর পরিচয় লাভ করা এবং তাঁকে ভালবাসাই আত্মার আহার। এ বিষয়ে মানুষ যত বেশি যত্নবান হবে ততই আত্মা পরিপুষ্ট হবে এবং তা তার জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল। অপরদিকে দেহের পরিপুষ্টি ও সুস্থতার জন্য প্রয়োজন খাদ্য ও প্রয়োজনবোধে চিকিৎসা। মনে রাখা দরকার, দেহ নশ্বর কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। আত্মার জন্যই দেহের প্রয়োজন এবং এ দুনিয়াতেই আত্মার পরিপুষ্টির কর্ষণ করতে হবে।

"দুনিয়ার মোহমায়ার অন্ত নাই। তবে মনে করিও না যে, দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থই মন্দ এবং ক্ষতিকর; বরং দুনিয়ায় এমন কতগুলি বস্তু আছে যাহা বস্তুতঃ পারলৌকিক পদার্থ। যেমন, সৎজ্ঞান ও সৎকর্ম। এইগুলি দুনিয়ার অন্তর্গত হইলেও ইহা দুনিয়ার পদার্থের মধ্যে পরিগণিত নহে। এই দুইটি বস্তু মানবাত্মার সহিত পরকাল পর্যন্ত যাইবে"।[২৮]

দুনিয়ার ধনদৌলত ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ

"দেখ, তোমরাই তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে বলা হইয়াছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করিতেছ। যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি

---

[২৮]. ইমাম গাযালী, হুজ্জাতুল ইসলাম, *কিমিয়ায়ে সাআদাত*, ঢাকাঃ অনুবাদকঃ মাওলানা নূরুর রহমান, এমদাদিয়া লাইব্রেরী , ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ৮৬-৯৩

www.pathagar.com

তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করিবেন; তাহারা তোমাদের মত হইবে না"।[২৯] এই পৃথিবীতে সত্য-জ্ঞানচক্ষু উন্মিলনের তাগিদ দিয়ে আল্লাহ্ আরো বলেন: "আর যে ব্যক্তি এইখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট"।[৩০] আল্লাহ্ প্রদত্ত পরম সত্য-জ্ঞানহীন লোক ইহকালে আত্মা বিনষ্টকারী বলে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই দরিদ্র, পার্থিব ধন-সম্পত্তি তার যা-ই থাক না কেন। মানুষের এই আধ্যাত্মিক দারিদ্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ বলেন: "যদি তোমরা বিমুখ হও, তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করিবেন; তাহারা তোমাদের মত হইবে না"।[৩১] আল্লাহ্ পুণ্যাত্মার বিকাশপ্রাপ্ত, আধ্যাত্মিক চর্চা ও জ্ঞান সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত জাতির উপরই আস্থা রাখেন এবং তাদের পছন্দ করেন- পারলৌকিক সম্পদহীন আড়ম্বরপূর্ণ পার্থিব জীবন যাপনকারী আত্মিক দরিদ্রের উপর নয়। তাই আল্লাহ্ বলেন: "যাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে ভালবাসে মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ হইতে এবং আল্লাহ্‌র পথ বক্র করিতে চাহে; উহারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে"।[৩২]

খ. বস্তুগত দরিদ্র ও দারিদ্র্য : ইসলামের দৃষ্টিতে বস্তুগত দরিদ্র ও দারিদ্র্য বিষয়ে আলোচনার আগে আমাদের সংসার বিরাগী বা যুহ্‌দ এবং আসলেও যারা বস্তুগতভাবে দারিদ্র্য তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

প্রকৃত সংসার বিরাগী বা যুহ্‌দ: এ বিষয়ে ইমাম গাযালী র.-এর ভাষ্য হলো:

"যে ব্যক্তি বদান্যতা বা দানশীলতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে অথবা পারলৌকিক সৌভাগ্য অন্বেষণ ভিন্ন অপর কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে প্রকৃত যাহিদ বা সংসার বিরাগী বলা যাইবে না। আবার, কেবল পারলৌকিক শান্তির বিনিময়ে ইহকাল বিক্রয় করা তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণের নিকট নিতান্ত দুর্বল তুচ্ছ ধরনের 'যুহদ' বা বৈরাগ্য। পূর্ণ ও প্রকৃত যাহিদ সেই ব্যক্তিকেই বলা যাইতে পারে, যিনি ইহলোকের ভোগ-বিলাসের প্রতি যেমন অমনোযোগী, তদ্রূপ পরলোকের চিরস্থায়ী ভোগ-বিলাস এবং সুখ-শান্তি হইতেও অমনোযোগী। অর্থাৎ তিনি পার্থিব সুখ-শান্তির বিনিময়ে পারলৌকিক শান্তি ভোগ করিতেও অনিচ্ছুক। ..... ইহলোকের বিনিময়ে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বেহেশ্‌ত পাইতে ইচ্ছুক না হইয়া উভয় জগতের বিনিময়ে কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকে পাইতে চান এবং তাঁহারই দর্শন ও পরিচয়লব্ধ আনন্দে

---

[২৯]. আল-কুরআন, ৪৭:৩৮ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم

[৩০]. আল-কুরআন, ১৭:৭২ وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا

[৩১]. আল-কুরআন, ৪৭:৩৮ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم

[৩২]. আল-কুরআন, ১৪:৩
الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

www.pathagar.com

পরিতৃপ্ত থাকিতে উৎসুক হন। একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার সত্তা ব্যতীত অন্য সমস্ত পদার্থই তাঁহাদের দৃষ্টিতে নিতান্ত তুচ্ছ এবং নগণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আল্লাহ্‌ তাআলার তত্ত্বজ্ঞানে যাহারা পরিপক্কতা লাভ করিয়াছেন কেবল তাহারাই এই শ্রেণীর 'যাহিদ' হইতে পারেন। এই শ্রেণীর সংসার বিরাগী লোক সাংসারিক ধনৈশ্বর্য হইতে পলায়ন না করিলেও ক্ষতি নাই; বরং তাঁহারা মাল-আসবাব পাইলেই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং নিজের জন্য কিছু না রাখিয়া যথাসময়ে যথাস্থানে ব্যয় করিয়া ফেলেন এবং উপযুক্ত প্রাপককে দান করিয়া থাকেন"।[৩৩]

এ ধরনের 'যাহিদ'-এর দৃষ্টান্ত উসমান রা. ও আয়েশা রা.। বিপুল ধন-ভাণ্ডার হাতে পেয়েও উসমান রা. সমস্ত ধন উপযুক্ত প্রাপকের হাতে তুলে দিয়ে নিজে নিতান্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। আয়েশা রা. লক্ষ মুদ্রা হাতে পেয়ে সমস্ত মুদ্রাই দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছেন এবং রোযা ইফতারের পর নিজের আহারের জন্য একটি মুদ্রাও গোশ্‌ত ক্রয়ে ব্যয় করেন নি।

"ফলকথা সংসারের মোহ হইতে হৃদয়ের আকর্ষণ ছিন্ন করতঃ উহা হইতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত থাকাই বৈরাগ্যের লক্ষণ। অর্থাৎ সংসারের অন্বেষণে ব্যস্তও হইয়া পড়িবে না কিংবা সংসার ত্যাগ করিয়া জঙ্গলের দিকে পলায়নও করিবে না; সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সর্বদা সর্বক্ষেত্রে উহার প্রতিকূল আচরণও করিবে না কিংবা সন্ধিসুলভ মনোভাব লইয়া সংসারের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়াও থাকিবে না। সংসারকে লোভনীয় জ্ঞানে ভালও বাসিবে না কিংবা বর্জনীয় জ্ঞানে শত্রুও মনে করিবে না"।[৩৪] এ পৃথিবীর জীবন যাপনে মধ্যপন্থা অবলম্বনই করাই শ্রেয়। আল্লাহ্‌ বলেন: "এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে"।[৩৫]

'যাহিদ' ব্যক্তিগণ শুধু শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম বস্তুই পরিহার করে চলেন না, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য এমন কি হালাল বস্তু ভোগেও নিরাসক্ত হন। ইহকালে তাঁদের জীবনে "religious motives are more intense than economic"[৩৬] এবং মানুষের অর্থনৈতিক জীবনাচরণের পাশ্চাত্যের সনাতন অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এখানে

---

[৩৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭

[৩৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

[৩৫]. আল-কুরআন, ২:১৪৩

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

[৩৬]. Marshall, Alfred, Principles of Economics, London: Eight Edition, The English Language Book Society and Macmillan & Co Ltd, 1962, p.1.

www.pathagar.com

অচল। পার্থিব জীবনের প্রতি 'যাহিদ'-এর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে ইমাম গাযালী র. বলেন:
"মানব জাতি সংসাররূপ জেলখানায় আসিয়া বন্দী হইয়া পড়িয়াছে। এই জেলখানায় আপদ-বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের অন্ত নাই। মানব জাতিকে এই বন্দীখানায় অবস্থানকালে অসংখ্য বিপদ-আপদ ভোগ করিতে হয়। উক্ত বিপদরাশির মধ্যে জীবন যাপনের জন্য মানবজাতি বিশেষ করিয়া ছয় প্রকার দ্রব্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। **(ক)** অন্ন বা আহার্যদ্রব্য, **(খ)** বস্ত্র, **(গ)** বাসগৃহ, **(ঘ)** গৃহের আসবাবপত্র, **(ঙ)** পত্নী, **(চ)** ঐশ্বর্য ও সম্মান। সাংসারিক জীবনের এই ষড়বিধ পদার্থ মানবজাতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও একান্ত আবশ্যকীয়"[৩৭]।
আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে জীবনধারণের এ পার্থিব তালিকা সর্বজনীন; কিন্তু সর্বজনীন এ বিষয়গুলোর ব্যবহারগত দৃষ্টিভঙ্গি একজন 'যাহিদ' অপরাপর সাধারণ মানুষ, যাদের অর্থনৈতিক জীবন ব্যাখ্যায় সনাতন অর্থনীতিকে বলা হয়: "Economics is a study of mankind in the ordinary business of life; it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of wellbeing"[৩৮] এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পার্থিব জীবনে জীবনধারণের এ সর্বজনীন তালিকা একজন 'যাহিদ' কিভাবে ব্যবহার করেন এবং কোন দৃষ্টিতে দেখেন তা বিশ্লেষণ করলেই সাধারণ সংসারি মানুষ থেকে 'যাহিদ'-এর পার্থক্য বুঝা যাবে[৩৯]।
ক. অন্ন বা আহার্য দ্রব্য: আহার্য দ্রব্যের মধ্যে যারা চাল, গমের আটা, ময়দা, সুজি, চিকন চাউলের অন্ন আহার করে তারা সংসার বিরাগী নয়; তারা শরীরসেবী এবং আরামপ্রিয় বলে আখ্যায়িত। যে ব্যক্তি যত নিচুমানের খাদ্যে পরিতৃপ্ত থাকেন তিনি ততোধিক 'যাহিদ' বা সংসার বিরাগী। 'যাহিদ' ব্যক্তির আহার্য দ্রব্যের পরিমাণের তিনটি স্তর নির্ধারিত। কমের মধ্যে দৈনিক আনুমানিক এক পোয়া। মধ্যম পরিমাণ দৈনিক অর্ধ সের এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ এক সের। এর মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চ পরিমাণ আহার্য গ্রহণ করেন, তারা সাধারণ পর্যায়ের 'যাহিদ'। কিন্তু যারা এ সর্বোচ্চ পরিমাণের ঊর্ধ্বে আহার করেন, তারা উদরসেবী ও আরামপ্রিয়-'যাহিদ' নন।
'যাহিদ' কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে তাও নির্ধারিত। এক বেলার খাদ্য সঞ্চয়ে রাখা উন্নত শ্রেণীর 'যাহিদ' বা পরহেযগারীর পরিচায়ক; এর অধিক খাদ্য সঞ্চয়কারী উন্নতস্তরের 'যাহিদ' নয়। ত্রিশ থেকে চল্লিশ দিনের খাদ্য যে সংগ্রহে রাখে সে মধ্যম শ্রেণীর 'যাহিদ'। আর সর্বনিচু পর্যায়ের 'যাহিদ' এক বছরের আহার

---

[৩৭]. ইমাম গাযালী, *কিমিয়ায়ে সাআদাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭
[৩৮]. Marshall, Alfred, Principles of Economics, I b I d, p.1.
[৩৯]. ইমাম গাযালী, *কিমিয়ায়ে সাআদাত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৭৭

www.pathagar.com

সঞ্চয়ে রাখা। এক বছরের অধিক কালের জন্য খাদ্য সঞ্চয়কারী 'যাহিদ' নয় কারণ সে এক বছরের অধিক কাল বাঁচার আশা রাখে।

"রসূলুল্লাহ্ স. নিজের পরিবারবর্গের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চয়পূর্বক তাঁহাদের হাতে সমর্পণ করিতেন। কেননা, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি নিজের জন্য রাত্রির আহার্যও দিবসে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না"।[৪০]

রুটি বা অন্নের সাথে সিরকা বা শাক নিতান্ত নিচু মানের ব্যঞ্জন বলে তা উন্নত শ্রেণীর 'যাহিদ'-এর খাদ্য। তৈল বা তৈল-পক্ক দ্রব্য মধ্যম শ্রেণীর ব্যঞ্জন। গোশত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যঞ্জন এবং প্রবৃত্তির লোভনীয় খাদ্য যা অবিরত খেলে যাহিদ-এর উচ্চমান বিনষ্ট হয়। সপ্তাহে দুই একবার গোশত খাওয়া যেতে পারে।

'যাহিদ' ব্যক্তির পক্ষে দিন ও রাতের মধ্যে এক বেলার বেশি আহার করা সঙ্গত নয়। এক দিনে দু'বার আহার করলে যাহিদ-এর মান ধরে রাখা যায় না। 'যুহ্দ' বিষয়ে সম্যক্ ধারণা লাভের জন্য নবী করীম স. ও তাঁর সাহাবাদের জীবন প্রণালী অনুসরণই যথেষ্ট। আয়েশা রা. বলেছেন :

রসূলুল্লাহ্ স.-এর পারিবারিক জীবনের অবস্থা কখনও কখনও এমন হইত যে, ক্রমাগত চল্লিশ দিন ধরিয়া তৈলের অভাবে তাঁহার গৃহে রাত্রিকালে প্রদীপ জ্বলিত না এবং খোরমা ও পানি ব্যতীত অন্যবিধ কোন পাকান খাদ্য আহার করিতে পাওয়া যাইত না।[৪১]

খ. পরিধেয় বস্ত্র: 'যাহিদ' ব্যক্তিকে কেবল একান্ত প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রেই পরিতৃপ্ত থাকতে হয়, এর বেশী নয়। সাধারণ শ্রেণীর 'যাহিদ'-এর জন্য দু'টি লম্বা পিরহান, একটি টুপি, এক জোড়া জুতা এবং এর সাথে দু'টি পায়জামা ও একটি পাগড়িই যথেষ্ট।

"রসূলুল্লাহ্ স.-এর ইন্তিকালের পর আয়েশা রা. একখানা সূতীর মোটা তহ্বন্দ ও একখানি পশমী কম্বল বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন–'ইহাই রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাকুল্য পোশাক"[৪২]। হাদীসে উল্লেখ আছে–

"যে ব্যক্তি জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনে তদ্রূপ পরিচ্ছদ পরিধান না করিয়া দীন-হীন পোশাক পরিধান করে, তবে তৎপরিবর্তে তাহাকে পরকালে বেহেশতের বিচিত্র কারুকার্যময় সুন্দর পোশাক ইয়াকুত প্রস্তর নির্মিত নৌকার মধ্যে

---

[৪০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

[৪১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

[৪২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

www.pathagar.com

বোঝাই করিয়া দান করা আল্লাহ্র উপর তাহার প্রাপ্য দাবিরূপে অবধারিত হইয়া পড়ে"।[৪৩]

গ. বাসগৃহঃ ঝড়-বৃষ্টি ও শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাসগৃহের প্রয়োজন হলেও সেটা এমন অস্থায়ী হওয়া উচিৎ যেন এই অস্থায়ী সংসারে যুহদ অবলম্বনে তা বাধার কারণ না হয়। যাহিদ ব্যক্তির জন্য বাড়ি অনাবশ্যক উঁচু বা প্রশস্ত ও জাঁকজমকপূর্ণ হলে তাঁরা জাহিদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থাকবেন না। মূলত, কেবল ঝড়-বৃষ্টি ও শীত-গ্রীষ্ম হতে আত্মরক্ষার জন্যই নিবাস নির্মিত হবে, ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য নয়। হাসান রা. বলেছেন–

রসূলুল্লাহ্ স.-এর বাসগৃহগুলো এতটা উচ্চ ছিল যে, একজন মানুষ মেঝের উপর দাঁড়াইয়া হাত উচু করিলে গৃহগুলোর ছাদ স্পর্শ করিতে পারিত"।[৪৪] "যে ব্যক্তি আবশ্যকের অতিরিক্ত গৃহ নির্মাণ করিবে-কিয়ামতের দিন তাহাকে আদেশ করা হইবে, এই গৃহ মাথায় লইয়া দাঁড়াও। কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম হইতে আত্মরক্ষার জন্য যত বড় গৃহের একান্ত প্রয়োজন তত বড় গৃহ নির্মাণ করিলে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না।[৪৫]

ঘ. গৃহের আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যঃ 'যাহিদ' হিসেবে ঈসা আ.-এর জীবন ধারণ পদ্ধতিই সর্বোত্তম। তিনি সঙ্গে একটি চিরুনি ও একটি পান-পাত্র রাখতেন। একদিন এক ব্যক্তিকে হাতের আঙ্গুল দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে এবং অঞ্জলি ভরে পানি পান করতে দেখে চিরুনি ও পানপাত্রটি বর্জন করেন।[৪৬] নবী করীম স. একটি চামড়রার তৈরি খোলের ভেতর খেজুর গাছের সরু আঁশ ভর্তি বালিশ ও একটি পশমী কম্বল রাখতেন। পশমী কম্বলটি দু'ভাঁজ করে তাঁর শয্যা রচনা হতো। একদিন নবী করীম স.-এর পাঁজরে খেজুর পাতার তৈরী চাটাইয়ের দাগ অঙ্কিত দেখে উমর রা. কাঁদতে কাঁদতে বললেন, রোম দেশের 'কায়সার' এবং পারস্য দেশের 'কিসরা' উপাধিধারী কাফের বাদশাহ্গণ আল্লাহ্র শত্রু হয়েও তাঁর প্রদত্ত ভুরি ভুরি নেয়ামতের মধ্যে ডুবে রয়েছে। আর আপনি আল্লাহ্ তাআলার বন্ধু এবং তাঁর প্রেরিত রসূল হয়েও এমন কঠিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছেন। তখন নবী করীম স. উমর রা.-কে সান্ত্বনা দিবার জন্য বললেন: উমর! তুমি কি একথা শুনে সন্তুষ্ট হবে না যে, তাদের ভাগ্যে শুধু এই নশ্বর পৃথিবীর ধন-সম্পদই রয়েছে। আর আমাদের জন্য অবধারিত

---

[৪৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
[৪৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
[৪৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
[৪৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

www.pathagar.com

রয়েছে আখিরাতের অনুপম ও চিরস্থায়ী সম্পদ"।[৪৭] এখানে আলী রা.-এর একটি অমর উক্তি স্মরণীয়; তিনি বলেন: "মহা-প্রতাপান্বিত প্রভু আমাদের ব্যাপারে ভাগ-বন্টনের যে ফায়সালা করেছেন তাতে আমরা তুষ্ট। তিনি আমাদের জন্য রেখেছেন ইল্ম আর শত্রুদেরকে দিয়েছেন সম্পদ"।[৪৮]

"হেমস প্রদেশের শাসনকর্তা উমায়র ইবনে সা'দ উমর ইব্নুল-খাত্তাব রা.-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমার ব্যক্তিগত ভান্ডারে পার্থিব আসবাবপত্র কি কি আছে? তিনি বললেন, একটি লাঠি আছে, উহার উপর ভর দিয়া চলি এবং তদ্বারা সর্প ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রাণীকে আঘাত করি। একটি চামড়ার থলি আছে, উহাতে খাদ্য দ্রব্যাদি রাখি। একটি পাত্র আছে, উহাতে আহার্য রাখিয়া আহার করি, আবার প্রয়োজন হইলে উহাতে পানি রাখিয়া মস্তক ও বস্ত্রাদি ধৌত করি। আর একটি ঘটি আছে, তাহাতে পানীয় রাখিয়া পান করি। আবার প্রয়োজনবোধে উহা দ্বারা উযু-গোসলও করিয়া থাকি। এই কয়েকটি পদার্থই আমার গৃহ-সামগ্রীর মধ্যে আসল। এতদ্ব্যতীত আর যে কয়েকটি পার্থিব সামগ্রী আমার অধিকারে রহিয়াছে তাহা ইহাদের আনুষঙ্গিক"।[৪৯]

নবী করীম স. নিজ অধিকারে কোন স্বর্ণ-রৌপ্য রাখতেন না এবং যারা এসব অধিকারে রাখত, এমন কি নিজ সন্তান হলেও তা পছন্দ করতেন না। দরিদ্রদের মাঝে তা বিলিয়ে দিতেন এবং অপরকেও অনুরূপ করতে আদেশ করতেন[৫০]।

ঙ. বিবাহ্ করা: সাহাল তাস্তারী, সুফ্ইয়ান ইবনে উয়াইনাহ্ প্রমুখের মতে বিবাহের সাথে বৈরাগ্য বা অবৈরাগ্যের কোন সংস্রব নেই। এর প্রমাণ রসূলুল্লাহ্ স. ছিলেন মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 'যাহিদ' এবং তিনি ছিলেন সমগ্র জগদ্বাসীর মহান শিক্ষক। তা সত্ত্বেও তিনি স্ত্রী গ্রহণ করা পছন্দ করতেন ও তাঁদেরকে খুব ভালবাসতেন। বিয়ের ফলে বংশ রক্ষা এবং আল্লাহ্র বান্দা ও নবী করীম স.-এর উম্মত সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পথ প্রশস্ত ও মানুষ হিসেবে নিজেকে পবিত্র রাখা সম্ভব হয়। নবী করীম স. বিয়ের বহু ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: "তোমরা প্রেমময়ী, অধিক সন্তানসম্ভবা নারীকে বিয়ে করবে। কারণ আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো"।[৫১] তিনি আরো বলেন: "যে

---

৪৭. প্রাগুক্ত,

৪৮. মান্নান, অধ্যাপক মাওলানা আবদুল ও অন্যান্য সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০, পৃ. ১৮৯, رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال

৪৯. *কিমিয়ায়ে সাআদাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৫০. প্রগুক্ত, পৃ. ৭৫

৫১. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭, এই গ্রন্থে হাদিসটি আবূ দাউদ শরীফ, খ. ১, পৃ. ২৯৬ থেকে উদ্ধৃত تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

www.pathagar.com

ব্যক্তি পূত:পবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে চায় সে যেন স্বাধীন নারীর প্রণয়বদ্ধ হয়।[৫২] আমি নামায আদায় করি, ঘুমাই, রোযা রাখি আবার ইফতারও করি এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার দলভুক্ত নয়"।[৫৩] এ ছাড়াও রসূলুল্লাহ্ স. ঘোষণা করেন: "যখন তুমি বিয়ে করলে তখন অর্ধেক দীন পূর্ণ করলে; এর অর্থ হলো, বিয়ে মানুষকে যৌনতা, ব্যভিচার, সমকাম থেকে ফিরিয়ে রাখে, যা এ পৃথিবীর অর্ধেক পাপ"।[৫৪] অতঃপর অবশিষ্ট অর্ধেকের জন্য সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে।[৫৫] বিয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্‌রও তাগিদ আছে: "তোমাদের মধ্যে যাহারা 'আয়্যিম' তাহাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যাহারা সৎ তাদেরও"।[৫৬] আল্লাহ্ আরো বলেন: "আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের সংগিনীদিগকে যাহাতে তোমরা উহাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে"।[৫৭]

ইমাম গাযালী র.-এর মতে, বিয়ে করলে যদি স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ্ তাআলাকে ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এমন ব্যক্তির পক্ষে বিয়ে না করাই ভাল। কিন্তু বিয়ে না করলে ঐ ব্যক্তির যদি ব্যভিচারে বা এ জাতীয় গুরুতর পাপে লিপ্ত হওয়ার ভয় আছে বলে মনে হয়, তবে এ পরিস্থিতিতে 'যুহদ'-এর পরিচয় হল তার পক্ষে এমন অনাকর্ষণীয়া গুণবতী সক্ষম নারীকে বিয়ে করা যে তাকে দৈহিকভাবে পরিতৃপ্ত ও ব্যভিচার মুক্ত রেখে একাগ্র মনে আল্লাহ্‌র ইবাদতে সহায়তা করবে"।[৫৮]

চ. ঐশ্বর্য ও মান-সম্মান : ধনৈশ্বর্য ও মান-সম্মান, এ দু'টির লোভ সংসার জীবনে বিষের মতো ক্ষতিকর ও মারাত্মক; তবে এ দু'টি থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ গ্রহণ করা বিষ অপহারক মহৌষধের মতো কাজ করে এবং ঐ পরিমাণ ধন ও মান

---

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮, এই গ্রন্থে হাদিসটি ইবনে মাজা, পৃ. ১৩৫ থেকে উদ্ধৃত
مَنْ ارَدَ انْ يَلْقى اللهَ طاهِرًا مُطهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجَ الحَرَاءِرَ

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

৫৪. নায়েক, ডা. জাকির. *লেকচার সমগ্র*, ঢাকা: সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ২০১০, পৃ. ৪২৪

৫৫. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯, এই গ্রন্থে হাদিসটি মিশকাত শরীফ, খ. ২, পৃ. ২৬৮ থেকে উদ্ধৃত

৫৬. আল-কুরআন, ২৪:৩২ وَانْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

৫৭. আল-কুরআন, ৩০:২১
وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنفُسِكُمْ أزْوَاجا لِّتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

৫৮. ইমাম গাযালী, *কিমিয়ায়ে সাআদাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৬

www.pathagar.com

সাংসারিক ভোগবিলাসের মধ্যে গণ্য হয় না। একান্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ ধন ও মান আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে পারলৌকিক হিতকর বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য। তবে পুণ্যার্জনের লক্ষ্যে দান খয়রাতের সময় আল্লাহ্ নিজের নিতান্ত প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন: "তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তা হলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।"[৫৯]

আল্লাহ্ বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণে উদাসীন না করে, যাহারা উদাসীন হইবে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।"[৬০] নবী করীম স. বলেন: "যাহাকে আল্লাহ্ তাআলা দয়া করিয়া ইসলামের পথ দেখাইয়াছেন এবং অভাব মোচনের পরিমাণ ধন দান করিয়াছেন, আর সে ব্যক্তিও উহাতে পরিতৃপ্ত রহিয়াছে-এমন ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান"।[৬১]

'যুহদ' প্রসঙ্গের সারার্থ : মানুষ পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস ও লোভনীয় বিষয়াদির চিন্তা ও আকর্ষণ হতে নিজের মনকে মুক্ত করে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার হওয়ার অভ্যাস করলে, পরিণামে সে এমন সৌভাগ্য লাভ করতে পারে যে, ইহলোক ত্যাগ করে পরলোক গমন কালে তার মন দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট থাকবে না এবং দুনিয়ার মায়ায় এর প্রতি বার বার ফিরে ফিরে তাকাবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজ শান্তি ও আরাম-আয়েশের স্থায়ী আবাস মনে করে, সে ব্যক্তিই দুনিয়া ছেড়ে যাবার কালে দুনিয়ার প্রতি ফিরে ফিরে তাকায়। দেহের বন্ধনের কারণে দেহ সেখানে থেকে যেতে চায়, আর মৃত্যুকালে আক্ষেপ করে বলে - 'জীবন এত ছোট কেনে'।

আবু সুলাইমান দারানী র.-এর কাছে এক লোক জিজ্ঞেস করেছিল আল্লাহ্ তাআলা যে বলেন: "সেদিন উপকৃত হইবে কেবল সে, যে আল্লাহ্র নিকট আসিবে বিশুদ্ধ (সালীম) অন্তঃকরণ লইয়া"[৬২]। কেমন অন্ত:করণ বা হৃদয়কে 'সালীম' হৃদয় বলা যাইবে? উত্তরে তিনি বলেন, "যে হৃদয়ে আল্লাহ্ তাআলা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের স্থান নাই, সে হৃদয়কে 'সালীম' ও সুস্থ হৃদয় বলা যাইবে।"[৬৩]

এই যেখানে 'যুহদ'-এর পার্থিব জগতের জীবন দর্শন সেখানে বলদর্পী পাশ্চাত্যের পার্থিব জগতের বস্তুগত সাফল্যের নিরিখে গড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের বস্তুগত-দর্শন

---

[৫৯]. আল-কুরআন, ১৭:২৯

وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُور

[৬০]. আল-কুরআন, ৬৩:৯

يٰاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلا اَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون

[৬১]. ইমাম গাযালী, *কিমিয়ায়ে সাআদাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৪

[৬২]. আল-কুরআন, ২৬:৮৯, إِلاَّ مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

[৬৩]. ইমাম গাযালী, *কিমিয়ায়ে সাআদাত, প্রাগুক্ত, খ. ৪*, পৃ. ১৬৬

www.pathagar.com

সকল যুগের জন্যই নেহায়েতই বালখিল্য এবং অচল। বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের প্রভাবে আজকের বাস্তবতায় হয়তো এ জীবন অকল্পনীয়, তবে এই হলো আদর্শ জীবন, যেমন অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাজারে আদর্শ অকল্পনীয় 'পূর্ণ-প্রতিযোগিতা'-অবাস্তব হলেও যার আলোচনা আমরা করি। 'যুহদ' ব্যক্তিগণ দরিদ্র নন, তাঁদের অবস্থান দারিদ্র্য বিষয়ক আলোচনার উর্ধ্বে; কারণ যাঁর স্বভাবে মহত্ত্ব আছে দারিদ্র্য তাঁকে দরিদ্র করতে পারে না।

বস্তুগতভাবে দরিদ্র : ইসলামী পরিভাষায় বস্তুগতভাবে দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যার নিজের নানাবিধ পার্থিব অভাব মোচনের মত অর্থ-সম্পদ নেই এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ-সম্পদ উপার্জনের সামর্থ্যও নেই। তবে দারিদ্র্যের ব্যাপক অর্থ বুঝতে হলে, ধনী কে তা আগে বুঝতে হবে। ধনী তিনিই যাঁর কোন কিছুর অভাব নেই এবং যিনি কারো মুখাপেক্ষীও নন। এই অর্থে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া আর কেউ ধনী নন। মানব, দানব, ফেরেশ্তা, শয়তান বা আর যা কিছু সৃষ্টি জগতে বিদ্যমান, তাদের কারোই নিজ অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব তাদের নিজ ক্ষমতা বলে হয়নি এবং সে সব তাদের আয়ত্তেও নেই। তারা সবাই পরমুখাপেক্ষী এবং দরিদ্র। আল্লাহ্ বলেন–
"আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত"।[৬৪] "এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই"[৬৫]। "তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে এবং তোমাদের পরে যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন, যেমন তোমাদিগকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন"।[৬৬] আয়াতটিতে اَلْغَنِىُّ অর্থাৎ ধনীর ভাবার্থ এই বুঝানো হয়েছে যে, "যিনি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীস্থ সমস্ত কিছুই ধ্বংস করিয়া দিয়া তদস্থলে যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃজন করিতে পারেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা ভিন্ন যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই ফকির"[৬৭] অর্থাৎ দরিদ্র-পার্থিব ধন-সম্পদ যার যাই থাক না কেন।

মানুষ পার্থিব জীবনে বহুবিধ অভাবের সম্মুখীন। ধন-সম্পদের অভাবও তাদের একটি। অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের অভাব যেমন দারিদ্র্য, অর্থ-সম্পদের অভাবও তেমন দারিদ্র্য।

দু'কারণে মানুষ নির্ধন হয় : প্রথমত, কোন ব্যক্তি হয়তো স্বেচ্ছায় ধন ত্যাগ করে–এ প্রকার ব্যক্তি 'যাহিদ' এর পর্যায়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, কোন ব্যক্তির হয়তো ধন হাতে

---

৬৪. আল-কুরআন, ৪৭:৩৮ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ

৬৫. আল-কুরআন, ১১২:৪ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ

৬৬. আল-কুরআন, ৬:১৩৩
وَرَبُّكَ ٱلْغَنِىُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنۢ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ

৬৭. ইমাম গাযালী, *কিমিয়ায়ে সাআদাত, প্রাগুক্ত, খ. ৪*, পৃ. ১৩৪-১৩৫

www.pathagar.com

আসে না-এ প্রকার লোক ফকির বা দরিদ্র। বস্তুতঃ ধন-সম্পদে অভাবী লোকই দরিদ্র। এ প্রকার অভাবী লোক তিন শ্রেণীর হতে পারে: (১) ধন নেই, কিন্তু ধন উপার্জনের জন্য যারপর নাই তৎপর-এরা লোভী শ্রেণীর দরিদ্র। (২) যে দরিদ্র ব্যক্তি রিক্ত হস্ত হওয়া সত্ত্বেও ধন লাভের স্পৃহাকে সম্পূর্ণ দমন করে ফেলেছে, কেউ দান করলেও গ্রহণ করে না এবং ধন হাতে রাখাকে সর্বান্তকরণে ঘৃণা করে-এ ব্যক্তি 'যাহিদ'। এঁদের বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। (৩) যে দরিদ্র ব্যক্তি ধন উপার্জনের জন্য চেষ্টা করে না, কিন্তু চেষ্টা বিনা ধন হাতে এলে তা ফেলে দেয় না, কেউ দান করলে গ্রহণ করে কিন্তু না দিলেও সন্তুষ্ট থাকে-এ ব্যক্তি আপন অবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট দরিদ্র। শরীয়তের বিধান মতে সকল শ্রেণীর দরিদ্র লোকই দারিদ্র্যের সুফল ভোগ করবে, এমন কি লোভী দরিদ্র হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি ধন লাভে বঞ্চিত হয়ে দরিদ্র থেকে যায় সে-ও দারিদ্র্যের সুফল ভোগ করবে।[৬৮]

দারিদ্র্যের ফযীলত : আল্লাহ্ বলেন: لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِيْنَ (অর্থাৎ এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য)। আল্লাহ্ তাআলার কাছে ফকির বা দরিদ্রদের মর্যাদা এত উচ্চ যে, তিনি এই আয়াতে দরিদ্রদেরকে মুহাজিরদের অগ্রবর্তী করেছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নিজের দরিদ্র অবস্থার প্রতি এতটাই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত যে, কেউ কিছু দিলেও তা গ্রহণ করে না এবং ধন-সম্পদকে ঘৃণা করে, এ সব লোক ধনী লোকের পাঁচ শত বছর আগে বেহেশ্‌তে যাবে। আর যারা ধনোপার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও ধনী হতে পারেনি, এই শ্রেণীর লোভী দরিদ্রলোক সৎভাবে মৃত্যু বরণ করলে ধনী লোকের চল্লিশ বছর আগে বেহেশ্‌তে যাবে। "রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন: আমার প্রিয় দুইটি পেশা আছে, যে ব্যক্তি উক্ত পেশাদ্বয়কে ভালবাসে সে যেন আমাকেই ভালবাসে। আমার সেই পেশা দুই'টির একটি দরিদ্রতা, অপরটি জিহাদ"।[৬৯]

নবী করীম স.-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ যা বলেন তার সারমর্ম এই: "হে মুহাম্মদ! আপনি দুনিয়া এবং দুনিয়াদারদের পার্থিব সৌন্দর্যের প্রতি নজর দেবেন না; এই পার্থিব সম্পদ তাদের বিপদের কারণ হবে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে আপনার জন্য যা রক্ষিত আছে তা অতি উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী"।[৭০]

নবী করীম স. বলেছেন : "আমাকে বেহেশ্‌ত দেখান হইয়াছিল। দেখিলাম-বেহেশ্‌তবাসীদের অধিকাংশই দরিদ্র শ্রেণীর লোক। দোযখও আমাকে দেখান হইয়াছিল। তথায় দেখিলাম, অধিকাংশ দোযখীই ধনী শ্রেণীর লোক। আমি বেহেশ্‌তে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা খুব অল্প দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: স্ত্রীলোকরা

---

[৬৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬
[৬৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭
[৭০]. আল-কুরআন, ২০:১৩১
وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

www.pathagar.com

কোথায়? উত্তর আসিল: দুইটি রঙ্গিন পদার্থ অর্থাৎ স্বর্ণ এবং যাফরান তাহাদিগকে বেহেশ্‌ত হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে"[৭১]। নবী করীম স. আরো বলেন: "আল্লাহ্ তাআলা যখন মানুষকে অতিমাত্রায় ভালবাসেন, তখন তাদের উপর নানাবিধ বিপদ-আপদ চাপাইয়া দেন। আর যাহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় অত্যন্ত ভালবাসেন তাহাদিগকে 'এক্‌তেনা' করেন। সাহাবীগণ 'এক্‌তেনা' শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন: 'কাহারও ধন-সম্পদ সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া এবং পরিজনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলাকে 'এক্‌তেনা' বলা হয়"[৭২]।

আলী রা. বলেন: রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন–

"যে সময় মানুষ ধন-সম্পদ সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিবে, দালান-কোঠা-ইমারত নির্মাণে উৎসাহিত থাকিবে এবং দারিদ্র্যদিগকে শত্রুর ন্যায় মনে করিবে, তখন আল্লাহ্ তাআলা জনসমাজে চারি প্রকার 'বালা' (আপদ-বিপদ) প্রেরণ করিবেন– (১) দুর্ভিক্ষ, (২) রাজশক্তির অত্যাচার, (৩) বিচারকদের পক্ষপাতমূলক আচরণ, (৪) কাফের ও শত্রুদের দৌরাত্ম্য"[৭৩]। সমকালীন বিশ্বে আমরা এ দৃশ্য লক্ষ্য করছি।

নিজের অধিকারে সামান্য যা কিছু জীবনোপকরণ আছে তাতেই যে সৎ প্রকৃতির দরিদ্র সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সবচেয়ে ভালবাসেন। আবুদ্দারদা রা. বলেছেন–

"পার্থিব ধন-সম্পদের উন্নতি দেখিয়া যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয় এবং প্রতি মুহূর্তে আয়ু ক্ষয় হইয়া যাইতেছে দেখিয়া চিন্তিত না হয়, তাহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে কি মঙ্গল থাকিতে পারে যে, পার্থিব ধন-সম্পদ তো বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আয়ু প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে"।[৭৪]

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে মুআয বলেছেন–

"মানুষ দরিদ্রতা ও অভাবকে যেমন ভয় করে, যদি দোযখকে তাহারা তেমন ভয় করিত, তবে দারিদ্র্যতা এবং দোজখ উভয় হইতেই তাহারা নির্ভয় হইতে পারিত। আর তাহারা দুনিয়া পাওয়ার জন্য যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে, যদি বেহেশ্‌ত প্রাপ্তির জন্য তদ্রূপ পরিশ্রম করিত, তবে তাহারা দুনিয়া ও বেহেশ্‌ত উভয়ই লাভ করিত"[৭৫]। এতে বুঝা যায়, পাপ-পুণ্য, দু:খ-দারিদ্র্য, অভাব-অনটন এবং বেহেশ্‌ত-দোযখ প্রাপ্তি সবই মানুষের কর্মফল-এ সব মানুষের নিয়তি নয়। "দারিদ্র্য কারোও

---

[৭১]. ইমাম গাযালী, *কিমিয়ায়ে সাআদাত, প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৩৮। شَغَلَهُنَّ الاحْمَرَانِ الذَهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ

[৭২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

[৭৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪০

[৭৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

[৭৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

www.pathagar.com

নিয়তি বা বিধিলিপি আল-কুরআন এই ধরনের মতবাদ স্বীকার করে না। উপরন্তু ইসলামে আলস্য ও সন্ন্যাসবাদেরও কোন স্থান নেই"[৭৬]। মহান আল্লাহ্ বলেন–
"উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না, আর এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে, আর এই যে, তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে– অতপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান।[৭৭] সুতরং বুঝা যাচ্ছে মানুষ ইহকাল এবং পরকালে তার কর্মফলই ভোগ করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্যের কারণ

ইসলাম দারিদ্র্যকে অপছন্দ করে : উপরের আলোচনা থেকে এই কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, ইসলাম দারিদ্র্যকে আদর্শায়িত করেছে বা ধন উপার্জনকে নিরুৎসাহিত করেছে। শরীয়তের বিধিমতে ধন উপার্জন এবং ব্যয়ের উপর ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করে। যেমন, আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ বলেন–"আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না"।[৭৮] আল্লাহ্ আরো বলেন : "আর সন্ন্যাসবাদ-ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমি উহাদের ইহার বিধান দেই নাই"।[৭৯]

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ"[৮০]। "যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিজ করুণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্ত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"[৮১]। তাই আল্লাহ্ বলেন, "সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও

---

৭৬. হামিদ, মুহাম্মদ আব্দুল, *ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, ঢাকা: সম্পাদনা: প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ২০০২, পৃ. ২৭৪

৭৭. আল-কুরআন, ৫৩:৩৮-৪১
الاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَىٰ وَاَن لَيْسَ لِلاِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الاَوْفَىٰ

৭৮. আল-কুরআন, ২৮:৭৭
وَٱبْتَغِ فِيمَآ اٰتَاكَ ٱللّٰهُ ٱلدَّارَ ٱلاٰخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَاَحْسِن كَمَآ اَحْسَنَ ٱللّٰهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلاَرْضِ إِنَّ ٱللّٰهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

৭৯. আল-কুরআন, ৫৭:২৭ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ

৮০. আল-কুরআন, ২:২৬৮ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللّٰهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَٱللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

৮১. আল-কুরআন, ৯:২৮ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللّٰهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنَّ ٱللّٰهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও"[৮২]। "সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁহারই ইবাদত কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে"[৮৩]। আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সাবধান বাণীর মধ্যেই লুক্কায়িত আছে ধন উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান মেনে চলার নির্দেশ।

যে বিষয় মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ ও ভালবাসা থেকে বিরত রাখে তা মন্দ ও জঘন্য। কোন কোন সময় দারিদ্র্য কারো কারো পক্ষে এতটাই অসহনীয় হয়ে পড়ে যে, সে আল্লাহ্‌র প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে, যেমনটা অনেকের পক্ষে ধন-দৌলতের আধিক্যের কারণেও হয়। সুতরাং অভাব মোচনের পরিমাণ ধন একেবারে ধন শূন্যতা থেকে ভাল। "এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ স. আল্লাহ্ তাআলার কাছে দু'আ করতেন: "ইয়া আল্লাহ্! আমার বংশধর এবং উম্মতদিগকে অভাব মোচনের পরিমাণ অন্ন-বস্ত্র দান করিও"[৮৪]। নবী করীম স. এরূপ প্রার্থনার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন: "দারিদ্র্য মানুষকে কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যায়"। তিনি আরো বলেন, "হে আল্লাহ্! আমাকে দরিদ্রের জীবন দান কর। দরিদ্রের মতোই মৃত্যুবরণ করতে দাও এবং কিয়ামতে দরিদ্রের সাথেই পুনরুজ্জীবিত করো" (তিরমিযী), তিনি নিজের জন্য এ-ও প্রার্থনা করতেন "হে আল্লাহ্! আমি দারিদ্র্য, অভাব ও লাঞ্ছনা হতে তোমার পানাহ চাই" (বুখারী)[৮৫]। এর থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম দারিদ্র্যকে অপছন্দ করে ঠিকই কিন্তু দরিদ্রকে ভালবাসে।

ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র্যের কারণ : উপরে পশ্চিমা পুঁজিবাদী সমাজে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের কারণ সম্পর্কে সাক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আল-কুরআনের আলোকে মুসলিম সমাজে ধন বৈষম্য ও দারিদ্র্যের কারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো। এ প্রসঙ্গে দারিদ্র্যের যে কারণগুলোকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি, তার মধ্যে প্রধানত : **ক.** আল্লাহ্‌র বিধান থেকে বিচ্যুতি, **খ.** মানব সৃষ্ট সমস্যা, **গ.** সম্পদশালীদের দায়িত্বহীনতা, **ঘ.** সম্পদের বৈষম্যমূলক বণ্টন ব্যবস্থা, **ঙ.** ধনীক শ্রেণীর মানসিকতা, **চ.** দরিদ্র শ্রেণীর মানসিকতা, **ছ.** ক্ষমতার কেন্দ্রায়ণ ও সংহতকরণ, **জ.** রিবা ও **ঝ.** দুর্নীতির প্রভাব।

আল্লাহ্‌র বিধান থেকে বিচ্যুতি : আল্লাহ্ বলেন: "তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয় এবং

---

[৮২]. আল-কুরআন, ৬২:১০

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِى الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ

[৮৩]. আল-কুরআম, ২৯:১৭ فَابْتَغُوا عِندَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

[৮৪]. ইমাম গাযালী, *কিমিয়ায়ে সাআদাত প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৪২

[৮৫]. হামিদ, মুহাম্মদ আব্দুল, *ইসলামী অর্থনীতি: একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩, ২৬৯

www.pathagar.com

সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্যদানে বিরত থাকে"[৮৬]।

বর্তমান মুসলিম সমাজে আল্লাহ্‌র এ বাণীর যথার্থতা আমরা লক্ষ্য করে থাকি। লোক দেখানো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি অনেকেই পালন করে কিন্তু অর্থনৈতিক বিধিবিধানের পরিপূর্ণ আমল যা আল্লাহ্‌র ইবাদতেরই অঙ্গ তা তারা করে না। ফলে অভাবগ্রস্ত লোকেরা শরীয়ত মাফিক নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কোন প্রকার সামাজিক সহায়তা পায় না। যার ফলে দারিদ্র্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। এর প্রতিকার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দেয়া অর্থনৈতিক শিক্ষা, যেমন উত্তরাধিকার আইন ও যাকাত ব্যবস্থার মত শরয়ী বিধানাবলীর যথাযথ বাস্তবায়ন করা। পূর্ণাঙ্গ ইসলাম বলতে কেবল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন বুঝায় না, ব্যক্তি, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যাবতীয় ইসলামী বিধি-বিধানের পরিপূর্ণ আমলও জরুরি।

মানব সৃষ্ট সমস্যা : আল্লাহ্ বলেন–

"আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসপোযোগী এবং আকাশকে করিয়াছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করিয়াছেন এবং তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুন্দর এবং তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক; তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ কত মহান"[৮৭]। আল্লাহ্ আরো বলেন: "আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন"[৮৮]।

আল্লাহ্ পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই রিয্ক ও পার্থিব-পারলৌকিক কল্যাণ অর্জনের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু মানুষ আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করে যাবতীয় পার্থিব সমস্যার সৃষ্টি করে ও পারলৌকিক কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন: "হে মুমিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া

---

[৮৬]. আল-কুরআন, ১০৭:১-৭

ارَأَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّين فذلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلمِسْكِين فوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلمَاعُونَ

[৮৭]. আল-কুরআন, ৪০:৬৪

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ قَرَاراً وَٱلسَّمَآءَ بِنَـآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلعَالَمِينَ

[৮৮]. আল-কুরআন, ৪৫:১৩

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى ٱلأَرْض جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

www.pathagar.com

থাকে এবং লোককে আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে। সেদিন বলা হইবে, ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করিতে। সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর"[৮৯]। সর্বসাধারণের জন্য মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ মুষ্টিমেয় লোক কুক্ষিগত করার মাধ্যমে সৃষ্ট এহেন পার্থিব সমস্যা ইহকাল এবং পরকাল, উভয় কালের জন্যই মানুষের জন্য অকল্যাণকর।

সম্পদশালীদের দায়িত্বহীনতা : আল্লাহ্ সম্পদশালীদের দায়িত্বহীনতার ব্যাপারে বলেন: "সে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না, অতএব এই দিন সেথায় তাহার কোন সুহৃদ থাকিবে না এবং কোন খাদ্য থাকিবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত, যাহা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাইবে না"[৯০]। অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করা অর্থে এখানে বুঝানো হয়েছে, বিত্তশালীদের সম্পদ এমন ভাবে ব্যবহার করা যাতে কর্মহীন অভাবগ্রস্তরা কাজ করে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ পায়। অর্থনীতির ভাষায় বিত্তশালীরা তাদের সম্পদ অনুৎপাদনশীল কাজে বা ভোগ-বিলাসে ব্যয় না করে উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী কাজে বিনিয়োগ করবে এবং অভাবগ্রস্তরা সেখানে জীবন যাপনের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। এ না করলে সম্পদশালীদের জন্য পরকালে মর্মন্তুদ শাস্তির বিধান রয়েছে; কারণ সম্পদশালীর সম্পদ জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা ইবাদত্ তুল্য।

সম্পদের বৈষম্যমূলক বণ্টন ব্যবস্থা : আল্লাহ্ বলেন: "আল্লাহ্ জনপদবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যাহা দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্র, তাঁহার রাসূলের[৯১] রাসূলের

---

৮৯. আল-কুরআন, ৯:৩৪-৩৫

يَاَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلأحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ امْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ اَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ

৯০. আল-কুরআন, ৬৯:৩৩-৩৭

إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ ٱلعَظِيمِ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ لاَّ يَاكُلُهُ إِلاَّ ٱلْخَاطِئُونَ

৯১. এখানে রাসূল বলতে রাষ্ট্রকে বুঝানো হয়েছে। দেখুন, Pickthall, Mohammed Marmaduke. 'The Meaning of The Glorious Koran', London: published by The New American Library, New York and Toranto, The New English Library Limited, 12th Printing, foot note 2, p.393,

www.pathagar.com

স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাহাতে তোমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেন তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর"[৯২]। আল্লাহ্‌ভীতি আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ ব্যক্তি বিশেষের ন্যায়সঙ্গত ভোগ, ব্যয় ও জনসাধারণের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক সমবন্টনের ও বিতরণের প্রধান নিয়ামক। কিন্তু সচরাচর লক্ষ্য করা যায় মানুষ-এমনকি মুসলিম সমাজও সম্পদ আহরণ, ভোগ, ব্যয় ও বন্টনের ক্ষেত্রে আল্-কুরআন ও হাদিসের নিয়মাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করে না। এর ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে সম্পদের আয় ও বন্টন ব্যবস্থায় বৈষম্য দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজে ও রাষ্ট্রে সম্পদের আয়, ব্যয় ও বন্টনের সুষম ও ন্যায্য বন্টনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রায় সকল রাষ্ট্রই, মুসলিম রাষ্ট্রসহ, এ ব্যাপারে উদাসীন। ফলে এ ধরনের শরীয়ত বিরোধী বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন করে।

ধনীক শ্রেণীর মানসিকতা : আল্লাহ্ বলেন: "যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ"[৯৩]। সম্পদশালীদের এই কৃপণতা তাদের সমাজ বিচ্ছিন্নতা ও সমাজ বিমুখতারই ফল। সম্পদ তারা না কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী উৎপাদনশীল বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করে, না বিত্তশালীদের উপর শরীয়া মোতাবেক সমাজের কোন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত জনগণের কল্যাণের ও হক্ আদায়ের কাজে ব্যবহার করে। এর শাস্তি যে ভয়ঙ্কর তা আল্লাহ্ বলেছেন: "জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়া ছিল। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল"[৯৪]। ধনীক শ্রেণীর এ মানসিকতার শরীয়ামুখী পরিবর্তন না হলে তাদের জন্য যে ভয়াবহ পরিণতি রয়েছে সে ব্যাপারেও আল্লাহ্ সতর্ক করেছেন: "দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও উহা বার বার গণনা করে; সে ধারণা করে যে, তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে; কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুতামায়; তুমি কি জান হুতামা কী? ইহা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত হুতাশন, যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে; নিশ্চয় ইহা উহাদিগকে

---

[৯২]. আল-কুরআন, ৫৯:৭

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

[৯৩]. আল-কুরআন, ৭০:২০-২১ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا

[৯৪]. আল-কুরআন, ৭০:১৭-১৮ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ

www.pathagar.com

পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে"[৯৫]। ইসলাম জনগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে শরীয়া-সমাজমুখী মানসিকতায় বিশ্বাসী।

দরিদ্র শ্রেণীর মানসিকতা : আল্লাহ্ বলেন: "আর এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে, আর এই যে, তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে-অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান"[৯৬]। আল্লাহ্ আরো বলেন: "এবং তোমরা কর্ম করিতে থাক; আল্লাহ্ তো তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রাসূল ও মুমিনগণও করিবে"[৯৭]। আলস্য ও কর্মবিমুখতা দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। ইসলাম তাই মানুষকে পরিশ্রমের মাধ্যমে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে যাওয়ার তাগিদ দেয়। পরিশ্রম বিনা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভাগ্য বিনির্মাণে অলসভাবে শুধু আল্লাহ্র উপর নির্ভশীলতার শিক্ষা ইসলাম দেয় না। আল্লাহ্ বলেন :"এবং আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে"[৯৮]। সুতরাং দারিদ্র্য হতে আত্মরক্ষার জন্য বান্দার নিজ চেষ্টা ও কর্মের বিকল্প নেই। অবশ্য কর্মক্ষম অভাবী লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রকে যেমন করতে হবে, যেমনটি করেছিলেন নবী করীম স. এক ভিক্ষুককে একটি কুঠার কেনার ব্যবস্থা করে দিয়ে তার জীবনধারণের জন্য বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা বাজারে বিক্রি করতে।[৯৯] তেমনি দরিদ্রলোককে আলস্য ও কর্মবিমুখতার মানসিকতাও ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন: "তুমি ধৈর্য ধারণ কর, কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না"[১০০] আর তাই হাত পা গুটিয়ে বসে কেবল আল্লাহ্র উপর ভরসা করে থাকার মানসিকতা ত্যাগ করে হালাল কর্মের মাধ্যমে নিজ দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টায় ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ্ সহায় হন।

ক্ষমতার কেন্দ্রায়ণ ও সংহতকরণ : আল্লাহ্ বলেন: "বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন

---

[৯৫]. আল-কুরআন, ১০৪:১-৯

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍٱلَّذِى جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةِ وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

[৯৬]. আল-কুরআন, ৫৩:৩৯-৪১

وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلأَوْفَىٰ

[৯৭]. আল-কুরআন, ৯:১০৫ وَقُلِ ٱعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ

[৯৮]. আল-কুরআন, ১৩:১১ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

[৯৯]. এ উদাহরণটি এখানে জনগণের জীবন ধারণের জন্য সরকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টির দায়িত্ব পালনের রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

[১০০]. আল-কুরআন, ১১:১১৫ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ

www.pathagar.com

কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান"[১০১]। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্‌র হাতেই কেন্দ্রীভূত এবং সংহত, মানুষের হাতে নয়। কিন্তু আমরা যা দেখি তা হলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের নামে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত এবং সংহত হয়, যাদের আর্থ-সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রায়শঃ দরিদ্রজনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। আল্লাহ্‌র বক্তব্য হচ্ছে: "যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাহাদিগকে আমি যে রিয্‌ক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে"[১০২] তারাই সফলকাম হয়। এখানে উত্তরাধিকার[১০৩] ও যাকাতের[১০৪] শরীয়তি বিধান মেনে সম্পদের ন্যায্য ব্যয় ও বন্টনের মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে, যা বিত্তশালীরা এড়িয়ে চলে। আল্লাহ্ ন্যায়বিচারক, তাই তিনি বলেন: "তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। কাফিরদের কুফরী কেবল উহাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী উহাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে"[১০৫]। একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর দেয়া বিধানকে সকল ক্ষমতার উৎস ও কেন্দ্র

---

[১০১]. আল-কুরআন, ৩:২৬

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

[১০২]. আল-কুরআন, ৪২:৩৮

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

[১০৩]. আল-কুরআন, ৪:১১-১২

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًاوَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

[১০৪]. আল-কুরআন, ২:৪৩ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَآتُوا ٱلزَّكَاةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ

[১০৫]. আল-কুরআন, ৩৫:৩৯

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

www.pathagar.com

বিবেচনা করে দরিদ্রের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সমাজ ও রাষ্ট্রকে ক্ষমতা ও বিত্তের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ বলেন: "তোমার প্রতিপালক এইরূপ নহেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করিবেন অথচ উহার অধিবাসীরা পুণ্যবান"[১০৬]। অতএব, দারিদ্র্যমুক্ত পুণ্যবান জাতি হিসেবে ইহলোকে ও পরলোকে আত্মরক্ষা ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ইসলামের আলোকে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়া জরুরি।

রিবা: আল্লাহ্ বলেন : "মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সূদ দিয়া থাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়; উহারাই সমৃদ্ধিশালী"[১০৭]। আল্লাহ্ আরো বলেন: "ভাল ভাল যাহা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ ছিল আমি তাহা উহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছি তাহাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহ্র পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য, এবং তাহাদের সূদ গ্রহণের জন্য, যদিও উহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য"[১০৮]। "আল্লাহ্ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন"[১০৯]। এর অর্থ এই যে, জনগণের দারিদ্র্য মোচনের ক্ষেত্রে সূদ কোন কাজেই আসে না বরং এর মাধ্যমে দরিদ্রের ধন-সম্পদ সুকৌশলে আত্মসাৎ ও গ্রাস করে কতিপয় বিত্তশালী আরো ধনী হয় আর জনগণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না"[১১০]। তাই ইহকাল ও পরকালে সফলতা অর্জনের জন্য আল্লাহ্ বিত্তশালীদেরকে সূদে দরিদ্রদের ঋণ দেয়ার বদলে দান করার কাজে উৎসাহিত করেন। আল্লাহ্ সূদকে নিরুৎসাহিত করে উপদেশ দেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সূদের যাহা বকেয়া আছে তাহা ছাড়িয়া দাও যদি তোমরা মুমিন হও"[১১১]। যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে সূদী ব্যবসা ব্যাপক

---

[১০৬]. আল-কুরআন, ১১:১১৭ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

[১০৭]. আল-কুরআন, ৩০:৩৯

وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ ٱللَّهِ وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

[১০৮]. আল-কুরআন, ৪:১৬০-১৬১

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

[১০৯]. আল-কুরআন, ২:২৭৬ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ

[১১০]. আল-কুরআন, ৪:২৯ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ

[১১১]. আল-কুরআন, ২:২৭৮ يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

www.pathagar.com

জনগণের দারিদ্র্যের মূল; মুষ্টিমেয় লোক এতে উপকৃত হয় এবং সমাজে দারিদ্র্য, পাপ ও বৈষম্য বাড়ে[১১২]।

দুর্নীতির প্রভাব : আল্লাহ্ বলেন: "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জানিয়া শুনিয়া অন্যায়রূপে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না"[১১৩]। সমাজের প্রভাবশালীদের অনেকেরই আল্লাহ্‌র এ নির্দেশ উপেক্ষা করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার হীন প্রচেষ্টা প্রায়শঃ আমাদের চোখে পড়ে। এ জাতীয় দুর্নীতির প্রভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র আরো দরিদ্র এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও ঘুষ, প্রতারণা, জুয়া, মাদক, বাজারে পণ্যাদির ব্যাপারে ভূয়া প্রচারণা ও ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে মহল বিশেষ অন্যায়ভাবে নিরীহ ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের ঠকিয়ে থাকে। আল্লাহ্ বলেন: "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার"[১১৪]। আল্লাহ্ আরো বলেন: "তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তিস্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না; তোমরা মুমিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর"[১১৫]। শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ধনীক শ্রেণী শ্রমিককে পূর্ণমাত্রায় খাটিয়েও তার পারিশ্রমিক ন্যায্য ও সঠিক পরিমাণে নিয়মিত দেয় না, এবং প্রভাবশালীরা লোকদের নিকট থেকে তাদের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় আদায় করে কিন্তু অপরের প্রাপ্য সঠিকভাবে পরিশোধ করে না। এ বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন: "দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়, যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া

---

[১১২]. Khaled, Sarwar Md. Saifullah, Flaws of the Prevailing Micro-credit Financing System and Search for an Islamic Alternative, Dhaka, *Thoughts on Economics*, Islamic Economics Reasearch Bureau, Vol. 21, No. 02, April-June 2011, Pp.27-50

[১১৩]. আল-কুরআন, ২:১৮৮

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[১১৪]. আল-কুরআন, ৫:৯০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

[১১৫]. আল-কুরআন, ৭:৮৫

وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

www.pathagar.com

দেয়, তখন কম দেয়। উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে মহাদিবসে"[১১৬]? মহাপ্রভু সর্বশক্তিমান্ আল্লাহ্ মানুষের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণে ন্যায়ের পক্ষে এবং যাবতীয় দুর্নীতির বিপক্ষে।

উপসংহার

এ দুনিয়ায় ধনী দরিদ্রের বৈষম্য মানুষেরই সৃষ্টি। এ পৃথিবীর যাবতীয় নেয়ামত আল্লাহ্ তাআলা সকল মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। এর মধ্যে কিছু নেক বান্দা আছেন যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য অতি সাধারণ ও পার্থিব লোভ-লালসাহীন সৎজীবন যাপন করতে ভালবাসেন এবং তাতেই অভ্যস্ত ও সন্তুষ্ট। আপাত দৃষ্টিতে বৈষয়িক লোকের কাছে তাঁদের দরিদ্র মনে হলেও প্রকৃত অর্থে আধ্যাত্মিক বিবেচনায় তাঁরা এতটাই উন্নত ও সমৃদ্ধ যে, এ পৃথিবীর ধন-দৌলতের প্রতি তাঁদের কোন লোভ বা মোহ নেই। এ লক্ষ্যে তাঁরা নিজের বিপুল অর্থ-সম্পদও নির্দ্বিধায় অভাবী জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে নিজের জন্য তেমন কিছুই রাখেন না। তাঁদের প্পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহ্ভীতি এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নির্ভর। সাধারণ সংসারাসক্ত লোকের কাছে তাঁদের বৈষয়িক আচরণ বোধগম্য না হলেও তাঁরা আল্লাহ্কে বুঝেন এবং আল্লাহ্ও তাঁদের বুঝেন। এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। ইসলামী পরিভাষায় এঁদের যাহিদ বলা হয়েছে।

এ থেকে এমন অনুমান করার কোন সুযোগ নেই যে, ইসলাম সংসার ধর্ম বর্জনকে আদর্শায়িত করে। এ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবী করীম স. সংসার জীবন যাপন, রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ পরিচালনা ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ এবং ধর্ম প্রচার-সবই করেছেন। তবে যেটা মনে রাখা দরকার তা হলো এ সবই তিনি করেছেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য। তিনি আদর্শ মানুষ ছিলেন, আদর্শ স্বামী ছিলেন, আদর্শ পিতা ছিলেন, আদর্শ বন্ধু ছিলেন, আদর্শ যোদ্ধা ছিলেন, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন এবং সমগ্র মানব জাতির সামনে তাঁর জীবন সর্বকালীন আদর্শ এবং অনুকরণীয়। তিনি দারিদ্র্যকে অপছন্দ করতেন ঠিকই কিন্তু দরিদ্রদের ভালবাসতেন বলে দরিদ্রের মতো জীবন যাপন করতেন। তাঁর সাহাবীরাও তাই করতেন। আল্লাহ্ বলেনঃ "যে কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি উহাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাহাদিগকে কম দেওয়া হইবে না। উহাদের জন্য আখিরাতে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং উহারা যাহা করে আখিরাতে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক"[১১৭]। আর তাই আল্লাহ্ বলেনঃ

---

[১১৬]. আল-কুরআন, ৮৩:১-৫

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ الا يَظُنُّ أُولَـٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

[১১৭]. আল-কুরআন, ১১:১৫-১৬,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

www.pathagar.com

"যাহারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদিগকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা যালিম আল্লাহ্ উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন"[১১৮]।

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি দুনিয়াতে পার্থিব আয় বন্টনের ব্যাপারে ইসলাম শরীয়াভিত্তিক ন্যায্য সমবন্টনে বিশ্বাসী। তাই আল্লাহ্ মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন: "জীবনমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতেন দিন তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হইবে। যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। তোমাদিগকে নিশ্চয় তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে"[১১৯]। পার্থিব জীবনে যাবতীয় ভোগ-বিলাস-ব্যসন, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার হতে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ্ নির্দেশিত পথে সংযমী জীবন যাপন করে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য বলে ইসলাম বিবেচনা করে।

আজ কাল কেউ কেউ মনে করেন, "কুরআনের সামাজিক বিষয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর মধ্যে অবশ্যই একটি পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। প্রথমটি যেহেতু সপ্তম শতকের আরবের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রদত্ত হয়েছে, সেহেতু বর্তমান যুগ-সমস্যার প্রেক্ষিতে তা অসঙ্গতিপূর্ণ; অতএব তা পরিত্যাজ্য এবং কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক অনুশাসনগুলোই চিরন্তন সত্য রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তাঁরা এ বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তাঁরা এটাও ভুলে যান যে, পাশ্চাত্যজগত এ যাবত যত অবদান পেশ করেছে, ইসলামের সৌন্দর্য ও অবদান সে তুলনায় অপরিসীম ও অতুলনীয়"[১২০]। ইসলামী বিধি-বিধানের এ জাতীয় পছন্দ ও সুবিধা মাফিক ব্যবহার আল্লাহ্ পছন্দ করেন না এবং তিনি বলেন, "যাহারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে ও তাঁহার রাসূলদিগকেও এবং আল্লাহে ও তাঁহার রাসূলের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি আর তাহারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করিতে চাহে, ইহারাই প্রকৃত কাফির এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি"[১২১]। এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলামকে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে প্রসাধন হিসেবে ব্যবহার করার কোন সুযোগ নেই, গ্রহণ করতে হবে পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল জীবন বিধান হিসেবে।

---

[১১৮]. আল-কুরআন, ১৪:২৭,

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ

[১১৯]. আল-কুরআন, ৩:১৮৫-১৮৬,

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

[১২০]. জামিলা, মরিয়ম, *পাশ্চাত্য জড়বাদের দার্শনিক ভিত্তি* : ইসলামী দর্শন, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৫৩

[১২১]. আল-কুরআন, ৪:১৫০-১৫১

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৭, সংখ্যা-২৮
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১১

ওয়াক্ফ : একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান*

[সারসংক্ষেপ : ওয়াক্ফ পুণ্যলাভের একটি উপায়। ইসলামে ওয়াক্ফ কেবল বৈধ রীতিই নয়, বরং একটি প্রশংসনীয় কাজ। ইসলাম এ কাজে উৎসাহ প্রদান করে। ইসলামের শুরু হতে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এই সুন্দরতম ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। ওয়াক্ফ এমন একটি পুণ্যের কাজ যার দ্বারা নিজের প্রিয় সঞ্চয়কে নিজের পছন্দনীয় কাজে ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিয়োজিত করা হয় এবং সেবার এ ধারায় জীবনের পরম লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন করা যায়। ওয়াক্ফ হচ্ছে সমাজসেবা ও জনকল্যাণের একটি স্থায়ী ব্যবস্থা। দাতার মৃত্যুর পরও তার সে দানের সওয়াব ও মানবতার কল্যাণ অব্যাহত থাকে।]

ওয়াক্ফ-এর পরিচয়

ওয়াক্ফ-এর একাধিক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো–

* 'ওয়াক্ফ' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ-আটকে রাখা, বেঁধে রাখা, স্থগিত করা, নিবৃত্ত রাখা ইত্যাদি। ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে শরীয়তের পরিভাষায়, কোন বস্তুকে ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় রেখে এর উৎপাদন ও উপযোগকে গরীবদের মধ্যে কিংবা যে কোন কল্যাণকর খাতে দান করাকে ওয়াক্ফ বলা হয়।[১]
* ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র.-এর মতে, কোন বস্তুকে আল্লাহর মালিকানায় এমনভাবে দিয়ে দেয়া যে, এর উৎপাদন ও উপযোগ বান্দাদের নিকটই প্রত্যানীত হবে অর্থাৎ-এর উৎপাদন ও উপযোগ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে। তাঁদের মতে ওয়াক্ফ সম্পাদন করার সাথে সাথেই তা অপরিহার্য হয়ে যায়। কাজেই তা আর বিক্রয় করা যায় না, হেবা করা যায় না এবং উত্তরাধিকার হিসাবেও তা বন্টন করা যায় না।[২]
* ওয়াক্ফ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ-চুক্তি বা উৎসর্গ, বাঁধা দেয়া, সংযত করা। মুসলিম আইনের পরিভাষায় এর অর্থ– কোন বস্তুকে রক্ষা করা, তাকে তৃতীয়

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাড্ডা আলাতুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজ, বাড্ডা, ঢাকা

১. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী,* বৈরুত : দারু ইহ্য়াইত তুরাস আল-আরাবী, তা.বি., খ. ২., পৃ.৩৫০

২. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত হতে বাঁধা দেয়া।[৩]

* ওয়াক্ফ আরবী শব্দ। এর অর্থ ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত কোন সম্পত্তি নিরাপদে হেফাজত করা, চুক্তি বা উৎসর্গ করা। আইনের পরিভাষায় ওয়াক্ফ অর্থ– কোন মুসলমান কর্তৃক তার সম্পত্তির কোন অংশ 'ধর্মীয়, পবিত্র বা সেবামূলক' কাজের জন্য স্থায়ীভাবে দান করা। রোমান আইনে 'সম্পত্তি অর্পণ' এবং হিন্দু আইনে 'দান' ওয়াক্ফ-এর সমতুল্য।[৪]
* আক্ষরিক অর্থে ওয়াক্ফ বলতে বুঝায় নিবৃত্তি বা আটক, বাঁধা দেয়া বা সংযত করা। মুসলিম আইনের পরিভাষায় এর অর্থ মূলত কোন বস্তুকে রক্ষা করা, ওটাকে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত হতে বাঁধা দেয়া।[৫]
* স্যার ডি. এফ. মোল্লা বলেছেন, ওয়াক্ফ পুণ্যময়, ধর্মীয় ও দাতব্য বলে স্বীকৃত কোন উদ্দেশ্যে ইসলামী ধর্মমত অনুযায়ী ব্যক্তি কর্তৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্থায়ীভাবে উৎসর্গ করাকে বুঝায়।[৬]

গাজী শামছুর রহমান-এর মতে প্রকৃতপক্ষে ওয়াক্ফ বলতে বুঝায়-

১. একটি উৎসর্গ
২. এটা একটি স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির উৎসর্গ
৩. এ উৎসর্গ এমন উদ্দেশ্যে যা ইসলামী আইনে পুণ্যজনক, ধর্মীয় ও দাতব্য বলে স্বীকৃত
৪. উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যে গ্রান্ট বা অনুদানও এর অন্তর্ভুক্ত
৫. মুসলিম বা অমুসলিম যে কেউ ওয়াক্ফ সৃষ্টি করতে পারে।[৭]

মুনজের কাহফ বলেছেন–

"From the Shariah point of view, a waqf may be defined as" holding a maal (asset) and preventing its usufruct for the benifit of an objective reprenting righteousness/philanthropy." Hence a waqf is a continuously usufruct giving asset as a long its principle is preserved, priservation of

---

৩. আস-সারাখসী, আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনে আবূ সাহ্ল আহমাদ শামছুল আয়িম্মা, *আল-মাবসূত*, করাচী : ১৯৮৭, খ. ১২, পৃ.২৭

৪. হক, আহমেদ আমিনুল, মো. মমতাজ, ওয়াকফ, *বাংলা পিডিয়া*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, খ. ২, পৃ.৯৪

৫. Khalid, Rashid, *Waqf Administration in India*, New Delhi, 1978, pp. xvii; Mircea Eliade, Encyclopedia of Religion, N.Y. 1986, p.337

৬. Molla, D.F, *Principles of Mohamedan law*, Calcatta Eastern Law House, 1955, p.161

৭. রহমান, গাজী শামছুর, *ওয়াক্ফ আইনের ভাষ্য*, ঢাকা : ঢাকা ল' বুক হাউজ, ১৯৮৮, পৃ.১১

www.pathagar.com

principal may result from its own nature, for example, as a land, or from arrangements and conditions prescribed by the waqf founder.[৮]

Encyclopedia of Religion-vol-15-এ ওয়াক্ফ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

The Arabic term waqf (pl. awqaf) refers to the act of didicating property to a Muslim foundation and by extension, also means the endowment thous created – The meaning of the Arabic word is "stop" that is stop from being treated as ordinary property. The property is then said to be mawquf, In the law of sunni. Moliki school and hence is north west Africa, the terminoloty is 'habis' or 'hubs', meaning "retention."

To creat a 'waqf' the legitimate owner of a property must state that it is blocket in perpetuity, ... the property in waqf remains the possession of the founder and his heirs, but they are blocked from the usual rights of ownership.[৯]

ওয়াক্ফ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভারতীয় The Wakf Act, 1954'-এর ৩ এর (1) ধারায় বলা হয়েছে–

`Wakf' means the permanent dedication by a person professing Islam of any movable or immovable property for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable and includes

i. A Wakf by user

ii. grants (including mashrut-ul-khidmat) for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable; and iii. a wakf-al-alaulad to the extent to which the property is dedicated for any purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable.[১০]

হযরত উমর রা. খায়বরে প্রাপ্ত তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দামী সম্পত্তি যখন ওয়াক্ফ করে দেন তখন তিনি কয়েকটি শর্ত দিয়ে বলেছিলেন, এ সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না, হেবা করা যাবে না, উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ মালিক হবে না। হযরত উমর রা. উক্ত শর্তাধীনে ফকীর, আত্মীয়-স্বজন, দাস মুক্তকরণ, মুসাফির-অতিথি সেবা ও অন্যান্য

---

৮. Kahf, Monzer, *'Financing the Development of Walkf property' The Amirican journal of islamic social sciences (Economics)* 1999, vol-6, no-4, p. 41

৯. Eliade,Mircea, *Encyclopedia of Religion,* N.Y. 1986, pp. 337-38

১০. Husain, Dr.S.Athar and Rashid, Dr. Khalid, *Walkf laws and Administration in India,* Lucknow : Eastern Book Company, 1973, p.22

www.pathagar.com

ভাল কাজের জন্য সম্পত্তিটি ওয়াক্ফ করেন। তিনি আরও বলে দেন যে, মুতাওয়াল্লী এর থেকে প্রয়োজনীয় খোরপোষ নিতে পারবেন। তবে তিনি তা জমা করতে পারবেন না। সংগতভাবে নিজের বন্ধু-বান্ধবদেরও খাওয়াতে পারবেন।[১১]

হযরত উমর রা.-এর ঘটনায় যে সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, মূলত এটাই হলো ওয়াক্ফের যথার্থ সংজ্ঞা। অর্থাৎ কোন সম্পত্তি কিংবা কোন বস্তু মহান আল্লাহর নামে ওয়াক্ফ করা হলে তার আয় ফকীর, গরীব, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীমদের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। তা বিক্রয় কিংবা দান করা যাবে না এবং যিনি ওয়াক্ফ করেছেন তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও বন্টন করা যাবে না। ওয়াক্ফ দ্বারা ওয়াক্ফকারীর অধিকার নিঃশেষ হয়ে মালিকানাটি আল্লাহর নিকট চলে যায়। যিনি ওয়াক্ফ করেন তাকে 'ওয়াকিফ' এবং যার ওপর ওয়াক্ফ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাকে 'মুতাওয়াল্লী' বলা হয়।

বস্তুত ওয়াক্ফ হল ধর্মীয় বা দাতব্য কাজে নিবেদিত কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ভার বহনের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বরাবরে স্থায়ীভাবে দানকৃত নিষ্কর সম্পত্তি বা ভূমি।

ওয়াক্ফ-এর শ্রেণী বিভাগ

ওয়াক্ফ প্রধানত : দুই প্রকার

ক. ওয়াক্ফ আলাল-খায়ের বা কল্যাণকর ওয়াক্ফ;

খ. ওয়াক্ফ আলাল-আওলাদ বা পারিবারিক ওয়াক্ফ।

ওয়াক্ফ আলাল-খায়ের অনুযায়ী কোন সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয় সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণের জন্য দান করা হয়। আর ওয়াক্ফ আলাল-আওলাদ অনুসারে ওয়াক্ফকারী ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি বা অংশ বিশেষ দান করা হয়। এ ধরনের ওয়াক্ফকে সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয় স্বজনের নামের সাথে কল্যাণকর কাজের কথাও থাকে। উভয় প্রকার ওয়াক্ফই চিরস্থায়ী হতে হবে।

ওয়াক্ফ আলাল খায়েরকে ওয়াক্ফ লিল্লাহও বলা হয়। মসজিদ, ঈদগাহ, মাদরাসা, কবরস্তান, মুসাফিরখানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু তৈরি, জনসাধারণের পানির অভাব মোচনের জন্য কূপ, খাল, পুকুর, ইত্যাদি খননসহ যে কোন কল্যাণকর খাতে ওয়াক্ফ করা যায়। ওয়াক্ফ আলাল-আওলাদ সম্পর্কে বলা হয়, কোন মুসলিম তার সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে এর আয় হতে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে তার পরিবার, সন্তান-সন্ততি বা বংশধরদের আর্থিক সাহায্য বা ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। এ ছাড়া তিনি নিজের যাবজ্জীবনের ভরণপোষণ এবং দায়-দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে পারেন।[১২]

---

১১. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ,* ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি, খ. ১, পৃ. ৩৮৫

১২. আল-মারগীনানী, বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী আল-ফারগানী, *আল-হিদায়া,* দিল্লী : কুতুবখানা রহীমিয়া, তা.বি., খ. ৪, পৃ.৫৫১

www.pathagar.com

এরূপ ওয়াক্ফের শর্ত হল এর দ্বারা সুবিধা ভোগের উপকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শেষ পর্যন্ত দরিদ্রদের জন্য অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে। আত্মীয়দের জন্য ওয়াকৃফ করা হলে ওয়াক্ফদাতার মা, বাবা, দাদা ও ঔরষজাত সন্তান তার অন্তর্ভুক্ত হয় না।[১৩]

এ ছাড়াও আরেক প্রকার ওয়াক্ফ হচ্ছে মিশ্র ওয়াক্ফ। মিশ্র ওয়াক্ফে ধর্মীয় ও দাতব্য প্রকৃতির সর্বজনীন উদ্দেশ্য এবং উৎসর্গকারীর, তার পরিবার ও বংশধরদের ভরণ-পোষণ উভয় উদ্দেশ্যই রয়েছে।[১৪]

ওয়াক্ফ-এর মূলনীতি

১. ওয়াক্ফকারীর (ওয়াকিফ) সংশিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তরের পূর্ণ অধিকার থাকতে হবে। সুতরাং তাকে পূর্ণ মানসিক বৃত্তিসম্পন্ন (আকিল), পূর্ণ বয়স্ক (বালিগ) এবং স্বাধীন (হুর্‌র) ব্যক্তি হতে হবে। ওয়াক্ফ করণীয় বস্তুর ওপর তার পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব থাকতে হবে। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমগণের ওয়াক্ফ তখনই আইনগত শুদ্ধ হবে যখন তা ইসলাম বিরোধী কোন কাজের জন্য সম্পাদিত হবে না ।

২. ওয়াক্ফকৃত বস্তু স্থায়ী প্রকৃতির হতে হবে এবং তার আয় উৎপাদনকারীর হতে হবে। সুতরাং এটা মূলত একটি স্থাবর সম্পত্তি হবে। অস্থাবর বস্তুর ওয়াক্ফ সম্পর্কে মতভেদ আছে। হানাফীদের এক দল আলেম অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফ আইনসিদ্ধ মনে করেন না। তবে তাদের অধিকাংশ এবং শাফি'ঈ ও মালিকীগণ ঐ সকল বস্তু সম্পর্কে ওয়াক্ফ স্বীকার করেন, যেগুলো শরীয়ত অনুসারে আইন সঙ্গত চুক্তির বিষয়বস্তু হতে পারে। যথা– পশম ও দুধের জন্য প্রাণী, ফলের জন্য বৃক্ষ, শ্রমের জন্য ক্রীতদাস, অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থ প্রভৃতি ওয়াক্ফ করা যেতে পারে।

৩. ওয়াক্ফ এমন কাজের জন্য হতে হবে যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়, যদিও বাহ্যত অনেক সময় তা প্রকাশ পায় না। দু'প্রকার ওয়াক্ফ-এর মধ্যে প্রভেদ করা হয়। ওয়াক্ফ খায়রী নিশ্চিতরূপে ধর্মীয় অথবা জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর কাজের উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ (যথা– মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল, পুল, সেচ বা পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি) এবং 'ওয়াক্ফ আহলী' বা 'যুররী' পারিবারিক ওয়াক্ফ (যথা– সন্তান-সন্ততি, পৌত্র-পৌত্রাদি অথবা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের অনুকূলে ওয়াকফ)। এই প্রকার ওয়াক্ফ-এর আসল উদ্দেশ্য অবশ্য সর্বদাই আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে হবে। যথা ঃ কিছু অংশ দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ হবে। কারও নিজের অনুকূলে ওয়াক্ফ করা নিষিদ্ধ।

৪. ওয়াক্ফনামা লিখিত হওয়া অত্যাবশ্যক নয়; তথাপি সাধারণত এর জন্য

---

১৩. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৩৭৯-৮০

১৪. হক, আহমেদ আমিনুল, মো. মমতাজ, ওয়াকফ, *বাংলা পিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৪

www.pathagar.com

লিখিত দলীল সম্পাদন করা হয়। ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফ-এর উদ্দেশ্য সঠিকরূপে বর্ণনা করবেন এবং ঠিক ঠিকভাবে উল্লেখ করবেন কোন উদ্দেশ্যে এবং কার অনুকূলে উক্ত ওয়াক্‌ফ করছেন।

৫. বৈধ ওয়াক্‌ফ চূড়ান্তরূপে গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলোও পূরণ করা প্রয়োজন–

ক. ওয়াক্‌ফ করতে হবে চিরকালের জন্য। নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের অনুকূলে স্থাপিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বেলায় তা হতে অর্জিত আয় তার মৃত্যুর পর গরীবদের জন্য বরাদ্দ করত ওয়াক্‌ফ সম্পাদন করতে হবে। সুতরাং তা হস্তান্তর যোগ্য নয়।

খ. ওয়াক্‌ফ অবিলম্বে কার্যকর হবে, তা স্থগিত রাখার অন্য কোন শর্ত তাতে থাকবে না। তবে ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যু পর্যন্ত তা স্থগিত রাখার শর্ত আরোপ করা যায়। কিন্তু ওয়াক্‌ফকে যদি ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যু পর্যন্ত স্থগিত রাখার শর্ত প্রদান করা হয় তাহলে তা উইল এর অনুরূপ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কার্যকর হবে।

গ. ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয় আইনগত চুক্তি। ইমাম আবূ হানিফা র.-এর মতে (কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. এবং পরবর্তী হানাফীগণের নয়) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকারীর মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত করা না হলে ওয়াক্‌ফকারীর পক্ষে ঐ ওয়াক্‌ফ বাতিল করে তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে। সুতরাং হানাফী মতে ওয়াক্‌ফকারী সর্বদা তদীয় সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে যথাবিহিত মোকদ্দমা দায়ের করতে পারে। বিচারক ইমাম আবূ হানিফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর সিদ্ধান্তের যে কোনটি অবলম্বনে বিচার করতে পারেন। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে, ওয়াক্‌ফ অপরিবর্তনীয় বলে বিচারক ঐ বিধান অনুসারে ওয়াক্‌ফ বহাল রেখে দরখাস্ত নাকচ করতে পারেন।

ঘ. হানাফীগণের মতে, ওয়াক্‌ফ চূড়ান্তভাবে আইন সিদ্ধ হবার জন্য শর্ত হচ্ছে যাদের অনুকূলে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তাদের নিকট অথবা তত্ত্বাবধায়কের নিকট ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অর্পণ করা। অপর মাযহাবগুলো এবং ইমাম আবূ ইউসুফের মতে, ওয়াক্‌ফকারীর স্বীকারোক্তি ঘোষণার সাথে সাথে ওয়াক্‌ফ চূড়ান্ত হয়ে যায়। জনহিতার্থে ওয়াক্‌ফ-এর (মসজিদ বা কবরস্তান) ক্ষেত্রে উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু কোন একজন লোক ব্যবহার করলেই অর্পণ চূড়ান্ত হয়ে যায়।

অপর পক্ষে মালিকীগণের নিকট উপরোক্ত বিষয়গুলো অপরিহার্য নয়। যথা–ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি একমাত্র ওয়াক্‌ফকারীই নয়, বরং তদীয় উত্তরাধিকারগণও প্রত্যাহার করতে পারে।

www.pathagar.com

৬. মুসলিম আইনে কোন প্রতিষ্ঠান আইনত সিদ্ধ ব্যক্তিরূপে গৃহিত হত না বিধায় সম্পত্তি বিষয়ক আইনে ওয়াক্‌ফ-এর অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখা যায়। একটি মত হল, (ইমাম শায়বানী, ইমাম আবূ ইউসুফ পরবর্তী হানাফীগণ, ইমাম শাফি'ঈ এবং তার মতাবলম্বী আলিমগণ) এতে দাতার মালিকানা স্বত্ব লোপ পায়। সাধারণ কথায় বলা হয়-মালিকানা আল্লাহর হাতে চলে যায়। এর ফলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে দাতার এবং অপরাপর সমস্ত মানুষের মালিকানা স্বত্ব অস্বীকার করা হয়। দ্বিতীয় মতানুসারে (ইমাম আবূ হানিফা এবং মালিকী) দাতার নিজের এবং তার উত্তরাধিকারগণেরও মালিকানা স্বত্ব অব্যাহত থাকে। তাদেরকে উক্ত অধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হয় মাত্র। তৃতীয় মত অনুসারে (কোন কোন শাফি'ঈ ফকীহ, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল) মালিকানা স্বত্ব দান গ্রহিতার হাতে চলে যায়। সকল আইনবিদদের মতেই দত্তসম্পত্তির উৎপন্ন আয়ের মালিক হবে দান গ্রহীতাগণ।

৭. ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনার দায়িত্বভার মোতাওয়াল্লির হস্তে ন্যস্ত থাকে। তিনি তার উক্ত কাজের জন্য বেতন পাবার উপযুক্ত, দাতাই সাধারণত প্রথম পরিচালক নিযুক্ত করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দাতা স্বয়ং পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন।

দাতা ইসলাম ধর্ম বর্জন করলে ওয়াকফকারীর দীনি অর্জন বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি নাগরিক অধিকারে চলে যায়। যে সকল দত্ত সম্পত্তির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে তা সম্পত্তি বিষয়ক আইনের গৃহিত নীতিমতে বিধিসম্মত উত্তরাধিকারের (দরিদ্র হলে) অথবা দরিদ্র কিংবা জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করতে হবে।[১৫]

ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি

ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে কতকের সম্পর্ক ওয়াক্‌ফ-কারীর সঙ্গে, কতকের সম্পর্ক ওয়াক্‌ফ কর্মের সঙ্গে এবং কতকের সম্পর্ক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সঙ্গে।

ওয়াক্‌ফকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ওয়াক্‌ফকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানবান ও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। কাজেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক, পাগল ব্যক্তির ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ নয়।

২. ওয়াক্‌ফকারী ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে। ক্রীতদাসের ওয়াক্‌ফ সহীহ নয়। ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফকারী মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং কোন অমুসলিম যদি বিধি মোতাবেক ওয়াক্‌ফ করে তবে তা বৈধ হবে।

---

১৫. রহীম, মুহাম্মাদ আবদুর, *ওয়াকফ, ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, খ. ৬, পৃ. ২১১-১২

www.pathagar.com

ওয়াক্ফ কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ইসলাম অনুমোদিত পুণ্যকর্মের জন্য ওয়াক্ফ করতে এবং তার ঘোষণা দিতে হবে। যেমন মসজিদ, মাদরাসা, রাস্তাঘাট, সরাইখানা ইত্যাদি।

২. ওয়াক্ফ তৎক্ষণাৎ কার্যকর করতে হবে এবং কোন শর্তের সাথে সংশিষ্ট করা যাবে না। যেমন অমুক ব্যক্তি যদি আসে তবে আমার এ জমি ওয়াক্ফ ।[১৬]

৩. ওয়াক্ফকালে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয় করে তার অর্থ নিজ ইচ্ছেমত ব্যয় করার শর্ত আরোপ করা যাবে না। যেমন কেউ বলল, আমি এ জমি এই শর্তে ওয়াক্ফ করছি যে, যখন ইচ্ছা আমি এটা বিক্রয় করে এর অর্থ নিজ কাজে খরচ করতে বা দান সদকা করতে পারব। এরূপ শর্ত আরোপ করলে 'ওয়াক্ফ' সহীহ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।[১৭]

৪. ওয়াক্ফকালে বিবেচনার জন্য সময় হাতে রাখা যাবে না। যেমন কেউ বলল, আমি এ জমি এই শর্তে ওয়াক্ফ করছি যে, তিনদিন বিবেচনা করে দেখব এবং ইচ্ছে হলে এ সময়ের মধ্যে প্রত্যাহার করতে পারব। এরূপ শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্ফ সহীহ হবে না। তবে মসজিদের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন অর্থাৎ মসজিদের জন্য এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

৫. ওয়াক্ফ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা যাবে না। কাজেই নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ওয়াক্ফ করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। অবশ্য স্থায়িত্বের বিষয়টি মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়।[১৮]

৬. নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা তার বংশধরের জন্য ওয়াক্ফ করলে তা বৈধ হবে না। কেননা এক সময় তাদের শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ ওয়াক্ফ স্থায়ীভাবে হওয়া শর্ত। সুতরাং ওয়াক্ফ করতে হবে এমন খাতে যা স্থায়ী হয়। যেমন সাধারণভাবে দরিদ্রদের জন্য, মসজিদের জন্য ইত্যাদি।

ওয়াক্ফ সম্পত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তাবলি

১. ওয়াক্ফ করার সময় ওয়াক্ফ-এর বস্তুতে দাতার মালিকানা থাকা শর্ত। কাজেই জোরপূর্বক দখলকৃত জমির ওয়াক্ফ বৈধ নয়, এমনকি পরবর্তীতে তা কিনে

---

১৬. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৩৫২

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৬

www.pathagar.com

মূল্য পরিশোধ করলেও পূর্বের ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে না।[১৯] তবে অন্যের মালিকানাধীন বস্তু তার অনুমতি ব্যতীত যদি ওয়াক্‌ফ করে এবং পরবর্তীতে প্রকৃত মালিক তা অনুমোদন করে তবে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে।[২০]

২. ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুর পরিমাণ ও অবস্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন কেউ বলল, আমি আমার জমি থেকে ওয়াক্‌ফ করলাম, কিন্তু কোথাকার কতটুকু জমি তা উল্লেখ করল না, এরূপ ওয়াক্‌ফ বৈধ হবে না। তবে কোন সুপ্রসিদ্ধ জমি বা বাড়ি, যা সকলেই চেনে তার পরিমাণ বা সীমারেখা উল্লেখ না করলেও ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হবে।

৩. ওয়াক্‌ফ বৈধ হবার জন্য উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে ওয়াক্‌ফ বস্তু কোন স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর সম্পত্তি হবে না বরং স্থাবর সম্পত্তি হতে হবে। অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ বৈধ নয়। তবে যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিক্রম। হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালিদ রা. সহ আরও বহু সাহাবী যুদ্ধ সামগ্রী ওয়াক্‌ফ করেছিলেন এবং মহানবী স. তা অনুমোদন করেছিলেন।[২১]

ওয়াক্‌ফ করার নিয়ম

নির্দিষ্ট কিছু শব্দ দ্বারা ওয়াক্‌ফ সংঘটিত হয়। যেমন–
ওয়াক্‌ফ-এর ভাষায় বা ওয়াক্‌ফকারীর নিয়তে এটা পরিষ্কার থাকতে হবে যে, সে যে সকল বস্তু ওয়াক্‌ফ করছে তা সংরক্ষিত রাখা হবে। সেই সঙ্গে উপরে বর্ণিত শর্ত সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এমন কোন শর্ত বা শব্দ যুক্ত করা যাবে না যদ্বারা উক্ত শর্তসমূহ লংঘিত হয়।

ওয়াক্‌ফ লিখিত ভাবে করা যেতে পারে আবার মৌখিক ভাবেও করা যেতে পারে। তথাপি এর জন্য সাধারণত লিখিত দলীল সম্পাদন করা হয়। দাতা দান বা ওয়াকফ বোঝায় এমন শব্দের মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। অথবা সে অন্য ভাষা অবলম্বন করলে তার সাথে সংযোগ করবে 'তা বিক্রি করা, দান করা, অথবা ওয়াসিয়ত করা যাবে না। (অন্যথায় তা সদকা হবে)। অধিকন্তু ওয়াক্‌ফকারী ওয়াকফের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বর্ণনা করবেন এবং ঠিক ঠিক ভাবে উল্লেখ করবেন কোন উদ্দেশ্যে এবং কার অনুকূলে উক্ত ওয়াক্‌ফ করেছেন।[২২]

সুতরাং 'ওয়াক্‌ফ' এর ভাষা হবে এরূপ–আমার এই জমি আমার জীবদ্দশায় এবং আমার মৃত্যুর পর স্থায়ীভাবে ওয়াক্‌ফ, আমার এই জমি দরিদ্রদের জন্য ওয়াক্‌ফ,

---

১৯. ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ, আশ-শায়খ আল ইমাম কামালউদ্দীন মুহাম্মাদ, *শরহে ফাতহুল কাদীর লিল আজিযিল ফাকীর*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল আলামিয়্যাহ, তা.বি, খ. ৫, পৃ. ৪১৭

২০. প্রাগুক্ত

২১. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৭

২২. রহীম, মুহাম্মাদ আবদুর, "ওয়াকফ", *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২১১

www.pathagar.com

আমার এই জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ, আমার এই জমি আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াক্ফ। এটা বিক্রয় করা যাবে না এবং এর মধ্যে উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবে না। আমার এই জমির ফসল স্থায়ীভাবে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আমার মৃত্যুর পর এই জমির ফসল অমুক পাবে এবং তার পর তার আত্মীয়বর্গ এবং তাদের পর গরীবগণ। মোটকথা, ওয়াক্ফ-এর শর্তসমূহের পরিপন্থী না হয় এমন যে কোন ভাষাই ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওয়াক্ফকৃত মূল সম্পত্তি সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হলে কিংবা স্থায়ীভাবে চলতে পারে সেভাবে ওয়াক্ফ করা না হলে ওয়াক্ফ বলে গণ্য হবে না।[২৩]

স্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফ

স্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফ বৈধ। মহানবী সা. একখণ্ড জমি মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্ফ করেছিলেন। তাছাড়া আবূ বকর সিদ্দীক রা. তাঁর মক্কা শরীফের বাড়িটি, উমর রা. খায়বরের জমি, উসমান রা. কিছু জমি, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস রা. তাঁর মদীনার একটি ও মিসরের একটি বাড়ি ওয়াক্ফ করেছিলেন। এভাবে বহু সাহাবী থেকে স্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফ করার প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৪]

ফসলের জমি, বাড়ি, গোসলখানা, জলাশয়, রাস্তা ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। জমি ওয়াক্ফ করলে তাতে অবস্থিত বৃক্ষ ওয়াক্ফ-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু ফসল অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে সুস্পষ্টভাবে ফসলের কথা উল্লেখ করা হলে তা ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। যেমন বলল, আমি এই জমিতে যা কিছু আছে সব সহ জমিটি ওয়াক্ফ করলাম। এক্ষেত্রে সে জমিতে যাওয়ার পথ ও পানি সেচের ঘাট ওয়াক্ফ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৫]

জমিতে বৃক্ষ থাকলে বৃক্ষসহ জমি ওয়াক্ফ করতে হবে। বৃক্ষ ব্যতীত কেবল জমি ওয়াক্ফ করলে তা বৈধ হবে না। জমির অংশ বিশেষ ওয়াক্ফ করলে কতটুকু অংশ তা উল্লেখ করতে হবে। পুরো অংশ ওয়াক্ফ করা হলে তার পরিমাণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।[২৬]

---

২৩. মান্নান, অধ্যাপক মাওলানা আবদুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ২০০০, পৃ. ৬৬৫

২৪. আল-কাসানী, আবূ বক্র ইব্ন মাসউদ, আলাউদ্দীন, ইমাম, *বাদাইউস্ সানাঈ ফী তারতীবিশ শারাঈ*, বৈরুত : ১৯৮২, খ. ৬, পৃ.২২০

২৫. ইবনে আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন, *রদ্দুল মুহ্তার আলাদ-দুররিল মুখতার*, বৈরূত : তা.বি, খ. ৬, পৃ.৫৬২

২৬. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ ৩৫২

www.pathagar.com

অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্‌ফ

কোন অস্থাবর সম্পত্তি যদি স্থাবর সম্পত্তির অধীনে থাকে তবে স্থাবর সম্পত্তির অধীনে তার ওয়াক্‌ফ বৈধ। যেমন কোন জমিতে চাষাবাদের সামগ্রী আছে, এখন জমির মালিক যদি জমির সাথে সেসব সামগ্রীর ওয়াক্‌ফ করে দেন তবে তা বৈধ হবে। যুদ্ধের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। কোন অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াকফের প্রচলন যদি থাকে তার ওয়াক্‌ফও বৈধ। যেমন, জানাযা ও কবর খননের সামগ্রী।[২৭]

কুরআনুল কারীম, বই পুস্তক ও দীনী কিতাবাদি ওয়াক্‌ফ করা বৈধ। ওয়াক্‌ফকারী যদি কোন নির্দিষ্ট মসজিদের জন্য কুরআনুল কারীম ওয়াক্‌ফ করে তবে তা সেই মসজিদেই সংরক্ষিত রাখা উচিত। অন্যত্র স্থানান্তর করা উচিত নয়। নির্দিষ্ট মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ না করে শুধুমাত্র মুসল্লীদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হলে অন্য মসজিদে নেয়া বৈধ হবে। অর্থ– সম্পদ ওয়াক্‌ফ করাও বৈধ। তবে 'ওয়াক্‌ফ' বস্তুর মূল্যকে অবশিষ্ট রেখে কেবল তার উৎপাদন উপযোগ দ্বারাই উপকার লাভ বৈধ। তাই এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে, মূলধন ব্যয় করা যাবে না, বরং তার লভ্যাংশ ব্যয় করতে হবে।[২৮]

ওয়াক্‌ফ-এর বিধান

ওয়াক্‌ফ সম্পাদিত হবার পর তা বেচা-কেনা করা বা অন্য কোনভাবে কাউকে তার মালিক বানিয়ে দেয়া যাবে না। বরং যে কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তজ্জন্য তা সংরক্ষিত থাকবে। সে সম্পত্তি থেকে যা উৎপন্ন হবে তা যথানিয়মেই ব্যয় করতে হবে। মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে মসজিদের দখল প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না।[২৯]

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা

ওয়াক্‌ফকারী ইচ্ছে করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করতে পারে। সে পরিবর্তনের ইখতিয়ার তার নিজের জন্যও নির্দিষ্ট করতে পারে। আবার অন্যের ওপরও ন্যস্ত করতে পারে কিংবা নিজের ও অন্যের উভয়ের ওপরও তা ন্যস্ত রাখতে পারে। যার ওপরই ন্যস্ত করা হোক না কেন পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করলে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা বৈধ।[৩০]

---

২৭. ইবনে আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন, *রাদ্দুল মুহ্‌তার আলাদ-দুররিল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ.৫৫৫

২৮. *প্রাগুক্ত*

২৯. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬৫

৩০. কামালউদ্দীন, মুহাম্মাদ, আশ শায়খ আল ইমাম ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহেদ, *শরহে ফাতহুল কাদীর লিল আজিযিল ফাকীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪২৮

www.pathagar.com

ওয়াক্ফদাতা যদি পরিবর্তনের শর্ত আরোপ না করে সে ক্ষেত্রে 'ওয়াক্ফ' সম্পত্তির দু' অবস্থা হতে পারে। এক অবস্থায় পরিবর্তন করা বৈধ এবং অপর অবস্থায় বৈধ নয়।

যে অবস্থায় পরিবর্তন করা বৈধ তা হল, ওয়াক্ফ সম্পত্তি এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, তা দ্বারা কারো কোনও উপকার সাধিত হয় না। এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যেমন–

ক.ফসলের জমি, কিন্তু তাতে আদৌ ফসল জন্মে না। ফসল জন্মালেও এত খরচ পড়ে যে, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয়ে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে আদালত সে সম্পত্তি পরিবর্তন করতে পারে। এ পরিবর্তনের জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে, যথা–

- ক. ওয়াক্ফ সম্পত্তি ক্রয় করতে হবে,
- খ. পরিবর্তনের রায় দানকারীকে (কাযী, বিচারক) বিজ্ঞ, আল্লাহভীরু হতে হবে।
- গ. এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে হবে যে, বিক্রেতার কাছে ঋণগ্রস্ত নয়,
- ঘ. নিজের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের কাছেও বিক্রি করা যাবে না,
- ঙ. পরিবর্তে যে জমি ক্রয় করা হবে তা একই মহল্লায় তার চেয়ে উৎকৃষ্ট ও লাভজনক হতে হবে।[৩১]

ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফকালে যদি পরিবর্তনের শর্ত আরোপ না করে এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি যদি কিছুটা লাভজনক হয়, সে অবস্থায় ওয়াক্ফ সম্পত্তি পরিবর্তন করা যাবে না।[৩২]

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ দুই ভাবে হতে পারে :

ক. মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান।

খ. মসজিদের উন্নয়ন ও আসবাবপত্রসহ অন্যান্য ব্যয়ের জন্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান।

মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি ওয়াক্ফ করলে তা সম্পন্ন না করা পর্যন্ত দাতার মালিকানায় থাকবে। ওয়াক্ফ কথা বা কাজ উভয় পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হতে পারে। ইমাম আবূ ইউসুফ র.-এর মতে, ওয়াক্ফকারী যদি এই ঘোষণা প্রদান করে যে, আমি এই জমিকে মসজিদ বানালাম, তবে সেই ঘোষণাই যথেষ্ট। এর দ্বারাই তা মসজিদরূপে গণ্য হবে এবং দাতার মালিকানাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা র. ও ইমাম মুহাম্মদ র.-এর মতে মসজিদের ঘোষণা দেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান এবং আযান ও ইকামতসহ

---

৩১. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০০

৩২. *শরহে ফাতহুল কাদীর লিল আজিযিল ফাকীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩৫

www.pathagar.com

সালাত আদায়ও জরুরী। অন্যথায় দাতার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না এবং তা মসজিদ রূপে গণ্য হয় না।[৩৩]

মসজিদের জন্য 'ওয়াকফ' করার পর মোতাওয়াল্লির হাতে সমর্পণ দ্বারাও মসজিদ চূড়ান্ত হয়ে যায়, যদিও সালাত আদায় করা না হয়।[৩৪]

মসজিদ সাব্যস্ত হয়ে যাবার পর ওয়াক্ফ প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকেনা এবং তা বিক্রয় করা কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে তাতে কারও মালিকানা লাভের অবকাশ থাকে না।[৩৫]

মসজিদের উন্নয়ন ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা যেতে পারে। ওয়াক্ফ এ গরীব দুঃখীদের সাহায্য করার কথা যোগ করা যেতে পারে। যদি গরীবদের সাহায্যের কথা উল্লেখ করা হয় তবে মসজিদের ব্যয় নির্ধারণ করার পর কিছু বেঁচে থাকলে উদ্বৃত্ত অংশও তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।[৩৬]

এমনিভাবে গাছ-পালা ও অর্থ-সম্পদ ইত্যাদিও ওয়াক্ফ করা যায়, যা মোতাওয়াল্লির হাতে অর্পণ করা দ্বারা চূড়ান্ত হবে।[৩৭]

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি কেবল মসজিদের নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজেই ব্যবহার করা যায়; সাজ-সজ্জা ও অলংকরণের কাজে ব্যয় করা বৈধ নয়।[৩৮]

কেবল মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় যদি উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা মসজিদের জন্য আয়কর খাতে বিনিয়োগ করা হবে, দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না।[৩৯]

জনহিতকর কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা

ঈদগাহ, মাদরাসা, কবরস্থান, মুসাফিরখানা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেতু তৈরী, জনসাধারণের পানির অভাব মোচনের জন্য কুয়া, খাল, পুকুর ইত্যাদি খননসহ যে কোন কল্যাণকর খাতে ওয়াক্ফ করা যায়। মহানবী স. মুসাফিরদের জন্য একখণ্ড জমি ওয়াক্ফ করেছিলেন।[৪০]

উসমান রা. মদীনাবাসীর পানির কষ্ট দূর করার জন্য 'রুমা' নামক কূপ ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন।[৪১]

---

৩৩. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫৪
৩৪. প্রাগুক্ত
৩৫. *শরহে ফাতহুল কাদীর লিল আজিযিল ফাকীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩৫
৩৬. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৪৬০
৩৭. প্রাগুক্ত
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১
৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৩
৪০. *শরহে ফাতহুল কাদীর লিল আজিযিল ফাকীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১৫
৪১. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ*, ঢাকা : রশীদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি, খ. ১, পৃ. ৩৮৯

www.pathagar.com

ওয়াক্ফ করার সময় কবরস্থানে গাছ-পালা থাকলে উত্তরাধিকারীগণ তা কেটে নিতে পারে, কিন্তু কবরস্থান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে গাছ-পালা ওয়াক্ফকৃত ভূমির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ওয়াক্ফ করার পর যদি কবরস্তানে বৃক্ষ জন্মায় তবে তা রোপনকারীর হবে। কে রোপনকারী তা জানা না থাকলে সে বৃক্ষ আদালতের রায় অনুযায়ী ওয়াক্ফরূপে গণ্য হবে এবং তার বিক্রয় লব্ধ অর্থ কবরস্থানের কাজে ব্যবহৃত হবে।[৪২]

মুমূর্ষু ব্যক্তির ওয়াক্ফ

মুমূর্ষু ব্যক্তি ইচ্ছে করলে তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওয়াক্ফ করতে পারে, তার বেশী নয়। উত্তরাধিকারীদের অনুমতি সাপেক্ষে বেশী করা যেতে পারে। অনুমতি না দিলে এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত অংশের ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। যদি কিছু সংখ্যক উত্তরাধিকারী অনুমতি দেয় এবং কিছু সংখ্যক না দেয় তবে অনুমতিদাতাদের অংশ পরিমাণ কার্যকর হবে আর বাকীদের অংশে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে।

মুমূর্ষু ব্যক্তির ওয়াক্ফকৃত জমিতে যদি বৃক্ষ থাকে এবং তার মৃত্যুর পূর্বে তাতে ফল ধরে তবে তাও ওয়াক্ফ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ওয়াক্ফ-এর দিনই যদি তাতে ফল থাকে, তবে তা ওয়াক্ফ-এর মধ্যে দাখিল হবে না। বরং তা উত্তরাধিকারীগণ পাবে।[৪৩]

মুমূর্ষু ব্যক্তির যদি তার সম্পত্তির সমপরিমাণ ঋণ থাকে তবে তার ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে।[৪৪] ঋণ যদি সম্পত্তির সমপরিমাণ না হয়, বরং তার চেয়ে কম হয়, তবে ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে ওয়াক্ফ বৈধ হবে।[৪৫]

উপসংহার

মহানবী স. বলেছেন– "মানুষ মারা যাওয়ার পর তিনটি আমল ছাড়া তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, আমল তিনটি হচ্ছে– সাদাকায়ে জারিয়া, যে ইলম দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করবে।"[৪৬] মানুষ মরণশীল। মৃত্যুর পর তার যাবতীয় পুণ্যকর্ম বন্ধ হবার পরও সদকায়ে জারিয়ার পুণ্য অব্যাহত থাকে। ওয়াকফ-এর মাধ্যমে সমাজের মানুষ যেমন উপকৃত হয় তেমনি সমাজের বিত্তশালীদের পরকালীন নাজাতের জন্যও এটি একটি উত্তম মাধ্যম। তাই নিজের পরকালীন মুক্তি এবং সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য সাধ্য অনুসারে সকলের ওয়াকফ করা উচিত।

---

৪২. *ফাতওয়ায়ে আলমগীরী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫৪

৪৩. প্রাগুক্ত

৪৪. *শরহে ফাতহুল কাদীর লিল আজিযিল ফাকীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৮

৪৫. *রাদ্দুল মুহ্তার আলাদ-দুররিল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬০১

৪৬. তিরমিযী, ইমাম, *আস-সুনান*, দিল্লী : মাকতাবা রশিদীয়া, তা. বি. খ. ১, পৃ. ২৫৬

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৭, সংখ্যা-২৮
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১১

প্রচলিত ও ইসলামী আইনে মানহানি প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ : আইন মানবজীবনের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। নির্ভুল আইন, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, এর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্য প্রকাশ যে কোন সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধির পূর্বশর্ত। আইনের প্রতি অসম্মান কিংবা আইন লঙ্ঘন দ্বারা সমাজের শান্তি বিনষ্ট হয়। জীবন, সম্পদ ও সম্মানের অধিকার রক্ষাকে ইসলাম মৌলিক মানবাধিকার গণ্য করে। এক্ষেত্রে ইসলাম মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করে না। একটি সুখময় সমাজের জন্য জীবন, সম্পদ ও সম্মানের সুরক্ষাকে ইসলাম শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি বলে অভিহিত করেছে। যে সমাজে জীবন ও সম্মানের সুরক্ষা নিশ্চিত নয় সেই সমাজে কোনো অবস্থাতেই শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। ইতিহাস সাক্ষী, রসূলুল্লাহ্ স. এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগে এ তিনটি বিষয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছিলো। এগুলোতে আঘাত করার ধৃষ্টতা কেউ করলে তাকে নিশ্চিত শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। শুধু আমাদের দেশে নয় বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত ক্ষুণ্ন হচ্ছে মানুষের মান-সম্মান কিন্তু প্রচলিত আইন ও শাস্তি মানুষের মান-সম্মান রক্ষা করতে পারছে না। তাই আলোচ্য নিবন্ধে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনে মানহানির প্রতিকার ও প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।]

মানহানির সংজ্ঞা

মান শব্দের আভিধানিক অর্থ : সম্মান, তাজিম, মর্যাদা, সম্ভ্রম, গৌরব, ইজ্জত মান দেয়া ইত্যাদি।[১]

হানি শব্দের অর্থ : ক্ষতি, অপচয়, লোকসান, দোষত্রুটি, বিনাশক, লঘুতা, ক্ষুন্ন ইত্যাদি।[২]
অতএব, মানহানি শব্দের শাব্দিক অর্থ হয় : মর্যাদার ক্ষতি, সম্মান ক্ষুণ্ন, সম্মানের লঘুতা বিধান, মর্যাদাহানি। যেমন বলা হয় : মানের গুড়ে বালি, মান ইজ্জত নষ্ট ইত্যাদি।[৩]
মান শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো : Measure, weighing, Weight, Standard, Measuring, Degree (of an expression), Pride, Respect, Honour, Respectability, dignity, Magnitude, Reputation, Value, Pique,

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, উত্তরা, ঢাকা

১. এনামুল হক, ড. মুহাম্মদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪, পৃ. ৯৭৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০৩

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭৮

www.pathagar.com

Resentment, Feigned resentment out of love, Measuring instrumen & Meter.[৪]

যেমন বলা হয় : Do honour to অর্থাৎ মান রাখা, treat with honour অর্থাৎ মান দেয়া, Return honourably অর্থাৎ মানে মানে ফিরে আসা, Steal away honourably অর্থাৎ মানে মানে সরে পড়া, Maintain honour & Dignity অর্থাৎ মানমর্যাদা রক্ষা করা ইত্যাদি।[৫]

মানহানি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Defanatory, Disrespectful, Libellous, Destitute of honour or respect, Free from pride or vanity ইত্যাদি।[৬]

মান শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো : عرض، مجد، كرم، احترام، درجة ইত্যাদি। যেমন বলা হয় : و لقي العرض অর্থাৎ– তিনি গালিগালাজ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে মুক্ত, আবার বলা হয় : رجل كرم ونساء كرم وأرض অর্থাৎ মহান পুরুষ, মহতী মহিলা, দামী ভূমি ইত্যাদি।[৭]

পারিভাষিক অর্থে মান হলো : ইজ্জত, আবরু, খ্যাতি ও মর্যাদা যা দ্বারা মানুষ অহংবোধ করে থাকে।[৮]

আর হানি শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো : طعن، خسارة، ضيعة، ضرر ইত্যাদি। অর্থাৎ– এমন কোন কথা বলা, কাজ করা, লেখা যা মর্মভেদী, মর্মে ব্যথা দেয়া, কুৎসা রটনা, কুখ্যাতি ইত্যাদি।[৯]

পরিভাষায়, নিন্দাবাদ দ্বারা সুনাম নষ্ট করা বা ক্ষুণ্ন করাকে মানহানি বলে।[১০]

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ভাষ্যানুযায়ী মানহানির সংজ্ঞা হলো-

> "যে ব্যক্তি এ অভিপ্রায়ে বা এরূপ জেনে বা এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকা সত্ত্বেও কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলী বা চিহ্নাদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে

---

৪. *Bangla Academy English-Bengali Dictionary,* Edetor, Zillur Rahman Siddiqui, Dhaka : Bangla Academy, 2004, P. 366; *Oxford Advnced Learner's Dictionary,* **English-Bengali-English**, Editor : Md. Kamruzzaman Khan, Dhaka : Oxford Press & Publications, 2009, P. 567

৫. *Ibid.*

৬. *Ibid.*

৭. ইবনে মানযূর, আবুল ফজল জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাররম আল-আফরীকী, *লিসানুল আরব*, বৈরূত : দারু সাদির, ২০০৪, খ. ১০, পৃ. ১০৮-১০৯

৮. আল-আযহারী, মুহাম্মদ আলাউদ্দীন, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, খ. ২, পৃ. ১৬৭২

৯. ইব্‌নে মানযূর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ১২২

১০. রহমান, গাজী শামছুর, *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, পৃ. ১০৪৭; ঐ, *মানহানি*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৬, পৃ. ২৫

www.pathagar.com

অনুরূপ নিন্দাবাদ অনুরূপ ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করবে। সেই ব্যক্তি কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, উক্ত ব্যক্তির মানহানি করেছে বলে গণ্য হবে।"[১১]

সুনাম মানুষের বৈধ অধিকার

বৈধ অধিকার বলতে আইনের বিধান অনুসারে বলবৎযোগ্য অধিকারগুলোকেই বুঝানো হয়। তাই যে সকল অধিকার রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সংরক্ষিত থাকে এবং প্রযুক্ত হয় তা-ই এ শ্রেণীর অধিকার।

অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে, বৈধ অধিকার ষোল প্রকার। ১. সর্বজনীন অধিকার ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক অধিকার ২. আইনানুগ ও ন্যায়ের অধিকার, ৩. মালিকানা ও ব্যক্তিপদভিত্তিক অধিকার, ৪. গণঅধিকার ও ব্যক্তি অধিকার, ৫. ক্রটিমুক্ত ও ক্রটিযুক্ত অধিকার, ৬. ইতিবাচক ও নেতিবাচক অধিকার, ৭. কায়েমী স্বত্ব ও দৈব্য স্বত্ব অধিকার, ৮. স্বীয় স্বত্বে ও অন্যের স্বত্বে অধিকার ৯. পূর্বস্থিত ও প্রতিকারমূলক অধিকার,[১২] ১০. পূর্ণ ও অপূর্ণ অধিকার, ১১. প্রধান অধিকার ও আনুষঙ্গিক অধিকার, ১২. উত্তরাধিকারযোগ্য অধিকার ও উত্তরাধিকারের অযোগ্য অধিকার, ১৩. প্রকৃত ও ব্যক্তিগত অধিকার, ১৪. প্রাথমিক অধিকার ও শাস্তিমূলক অধিকার, ১৫. জাতীয় অধিকার ও আন্তর্জাতিক অধিকার ও ১৬. লাভভোগীদের অধিকার।[১৩]

উপরিউক্ত অধিকার শ্রেণীগুলোর মধ্যে মানুষের সুনাম, মান, মর্যাদা ও সম্মান প্রথমটি তথা সর্বজনীন অধিকার ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক অধিকারের মধ্যেই রয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে দু'জন প্রখ্যাত আইনজীবী এএএম মনিরুজ্জামান ও একেএম তোফাজ্জল হোসেন বলেন : মানুষের মান-মর্যাদা, দেহ সম্পর্কিত অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা, কোন বৃত্তি গ্রহণ প্রভৃতি ব্যক্তিগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।[১৪]

মানহানির শর্ত

প্রকাশের মধ্যেই মানহানি নিহিত। সাধারণ অর্থে 'প্রকাশ' বলতে কোন কিছুর প্রচার বা সঞ্চার বুঝায়।

বাংলাদেশ কোড-এর, ২৮ নং আইন 'কপিরাইট আইন-২০০০'-এর আলোকে প্রকাশনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "প্রকাশনা" অর্থ কোন কর্মের অনুলিপি জনগণের নিকট সরবরাহ করার অথবা পৌছানোর ব্যবস্থা করা। তবে শর্ত থাকে যে, এই

---

১১. Whoever by words either spoken or intended to be read, or by signs or by vivible representations, mokes or publishes any imputation, concerning any person intendeng to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation or such person, is said, except in the cases herinafter excepted, to defime that person.
-Bangladesh Panal Code (Act XLV of 1860 Section 499.)

১২. হাওলাদার, আব্দুল কুদ্দস, *আধুনিক আইন বিজ্ঞান*, রাজশাহী, পপুলার প্রেস, ১৯৯৬, পৃ.২২৭

১৩. মনিরুজ্জামান, এএএম ও হোসেন, একেএম তোফাজ্জল, *জুরিস্প্রুডেন্স [লিগ্যাল থিয়োরীসহ]*, ঢাকাঃ ন্যাশনাল ল' বুক হাউজ, ২০০৫, পৃ. ৩৬৭-৩৭২

১৪. *জুরিস্প্রুডেন্স [লিগ্যাল থিয়োরীসহ]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

www.pathagar.com

আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে প্রকাশনা অর্থে নিম্নবর্ণিত কার্য অন্তর্ভুক্ত হবে না। যথা :

ক. নাট্যকর্ম, নাট্যসংগীত, চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত কর্ম,
খ. জনসমক্ষে সাহিত্য কর্মের আবৃত্তি,
গ. [তার, বেতার বা অন্য যে কোন মাধ্যমে] যোগাযোগ, সাহিত্য বা শিল্পকর্মের সম্প্রচার,
ঘ. শিল্পকর্মের প্রদর্শনী,
ঙ. স্থাপত্য শিল্পের নির্মাণ।[১৫]

মোটকথা, আমি যা বলছি বা লিখছি বা আঁকছি তা সবই আমার। এগুলো যখন অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করি তখনই তা প্রকাশ পায় এবং যখন সেই কথা বা লেখা অন্যের বোধগম্য হয় তখনই তা প্রকাশিত বলে মনে করা যায়। কোন বিদেশী নাগরিক যারা বাংলা ভাষা বোঝেন না, তাদের যদি সবার সামনে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করা হয় তা ১মানহানিকর হবে না। কারণ তারা বুঝতেই পারেনি যে তাদের গালমন্দ করা হয়েছে। সুতরাং মানহানির অপরাধের মধ্যে প্রকাশনা অপরিহার্য। যেখানে প্রকাশনা নেই সেখানে মানহানি নেই। মনে মনে গজরালে তাতে কোন দোষ হয় না। এমনকি নিন্দাসূচক কিছু লিখলেও তা দোষ হয় না, যদি না তা প্রকাশিত হয়। লিখে নিজের কাছে রেখে দিলে তাতে কোন অপরাধ হয় না। যার সম্পর্কে লেখা হয়েছে তাকে পাঠিয়ে দিলেও এ ধারার আলোকে মানহানি হয় না। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি বা জনসাধারণের চোখে নিন্দাবাদের কারণে কোন ব্যক্তি হেয় প্রতিপন্ন না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বা লিপি মানহানি বলে পরিগণিত হয় না। অন্যের মনে আক্রান্ত ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র, বুদ্ধি, বর্ণ, পেশা সম্পর্কে যতক্ষণ না হেয়ভাব সৃষ্টি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানহানি হয় না।

যে কর্মকাণ্ড মানহানিরূপে বিবেচ্য

সাধারণত বিভিন্ন মন্তব্য ও কর্মের মাধ্যমে একজন অপরজনকে মানহানি করতে পারে। যেমন-

ক. দৈহিক কাঠামো বর্ণনার মাধ্যমে : কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কাউকে বেঁটে, কুৎসিত, নাক লম্বা, কানে শোনে না, চোখে দেখে না ইত্যাদি দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে অপমান করার নিমিত্তে মন্তব্য করা নিষেধ। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, একদিন আয়িশা রা. বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি সাফিয়ার বেঁটে হওয়াটা পছন্দ করেন না? রসূল স. বললেন : হে আয়িশা! তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।[১৬] দৈহিকভাবে একজন মানুষ অন্য আরেকজনকে

---

১৫. *বাংলাদেশ কোড*, বাংলাদেশ কপিরাইট আইন-২০০০, ২৮নং আইন,প্রথম অধ্যায়,ধারা নং-৩
১৬. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আস-আস আস-সিজিস্তানী, ইমাম, *আস-সুনান*, দামিশক : দারুল কলম, তা.বি., খ.২, পৃ ১১৭

www.pathagar.com

কটুক্তি করলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।"[১৭]

খ. পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে মন্তব্যের মাধ্যমে : পোশাক-পরিচ্ছদের ত্রুটি ধরে অনেক ক্ষেত্রে একে অপরকে অপমান করতে পারে। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি বদমায়েশদের মত পোশাক পরে, অমুক মহিলা এমনভাবে ওড়না পরিধান করে যে, তার অভ্যন্তরীণ অংশ খোলা থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বের করে চলাফেরা করে ইত্যাদি।এ প্রসঙ্গে আয়িশা রা. বলেন, অমুক স্ত্রী লোকটির আঁচল খুব লম্বা। একথা শুনে রসূল স. বললেন : হে আয়িশা! তুমি তার গীবত (অসম্মান) করলে।"[১৮]

গ. বংশ সম্পর্কে কটুক্তির মাধ্যমে : কেউ যদি কাউকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বলে : অমুকের বংশ নীচ বা ইতর অথবা অমুক অজ্ঞাত বংশের তবে এটাও সম্মান নষ্ট করার শামিল। কারণ ইসলামে নিজেকে খুব উচ্চ বংশীয় এবং অন্যকে নিম্ন বংশীয় বলা জায়েজ নয়। রসূল স. বলেছেন : "দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব নেই"।[১৯]

ঘ. অভ্যাস বর্ণনার মাধ্যমে : কেউ যদি কারো অভ্যাস ও আচার-আচরণের কথা উল্লেখ করে বলে, অমুক কাপুরুষ, ভীরু, অলস, পেটুক, নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, পরিণামের কথা ভেবে কাজ করে না ইত্যাদিও মানহানির অন্তর্ভুক্ত। এগুলো রসূল স. নিষেধ করেছেন।[২০]

ঙ. ইবাদতের অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে : কেউ যদি কারো ইবাদতের সমালোচনা করে বলে, অমুক ভাল করে নামায পড়ে না অথবা বলে সে তাহাজ্জুদ বা নফল নামায পড়ে না কিংবা সে রমযান মাসের সকল রোযা রাখে না ইত্যাদিও মানহানির পর্যায়ে পড়ে।[২১]

চ. গুনাহের কথা উল্লেখের মাধ্যমে : গুনাহগত মানহানি হলো এমন কথা বলা, অমুক ব্যক্তি ব্যভিচারী, অমুক পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক

---

১৭. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১
يَا ايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

১৮. আল-মুযিরী, ইমাম, *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, বৈরূত, দারুল ফিকর, ১৯৭৮ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৪৩

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২০. *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪২

২১. লাখনাবী, সাইয়েদ আব্দুল হাই, *গীবত*, দিল্লী, তাজ কোম্পানী, তা.বি., পৃ. ৭১

www.pathagar.com

ছিন্নকারী, অমুক মদ্যপায়ী, অমুক চোর, অমুকের অন্তর বিদ্বেষপূর্ণ ইত্যাদি। এসকল কথা বলেও একজন অন্যজনের সুনাম নষ্ট করতে পারে।[২২]

ছ. সরাসরি বা অভিনয়ের মাধ্যমে : বিভিন্ন লোকজনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সরাসরি নকল করে প্রকাশ করলেও মানহানি ঘটে। এক মহিলাকে নকল করে দেখালে রসূল স. বললেন, কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পসন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়।[২৩]

জ. লেখনির মাধ্যমে : লেখনীর মাধ্যমে ও মানহানি হয়। যেমন কেউ যদি কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সংবাদপত্রে রিপোর্ট করে কিংবা বই পুস্তকে অপরের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরলে ব্যতিক্রম ছাড়া এটি যদি অসৎ উদ্দেশে করা হয়, তা মানহানির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যদি এর দ্বারা অপরকে ছোট করাই উদ্দেশ্য হয়। ইসলাম এটি সমর্থন করে না।

যে কর্মকাণ্ড মানহানিরূপে বিবেচ্য নয়

১. জনমঙ্গলের জন্য সত্য দোষারোপ করা।
২. জনগণের প্রতি সরকারী কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে সঠিকতথ্য প্রকাশ করা।
৩. যে কোন জনসমস্যা সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা।
৪. আদালতসমূহের কার্যবিবরণী রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা।
৫. গণ-অনুষ্ঠানের গুণাবলী সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা।
৬. অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সদবিশ্বাসে ভর্ৎসনা করা।
৭. কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সদবিশ্বাসে অভিযোগ করা।
৮. কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার বা অন্য কারো স্বার্থ রক্ষার্থে সদবিশ্বাসে কোন দোষারোপ করা।
৯. সতর্ককৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থে বা গণ-কল্যাণার্থে সতর্কতা অবলম্বন করা।[২৪]

প্রচলিত আইনে মানহানির শাস্তি

ক্ষুব্ধ ব্যক্তির 'মান' এর মূল্য নির্ধারণের কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি নেই। কুৎসার তীব্রতা, পৌণপুণিকতা, বাদীর খ্যাতি, পরিচিতি, পেশাগত মর্যাদা, ব্যবসার পরিধি ইত্যাদিকে বিবেচনায় রেখে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতে মামলা করতে পারে। প্রচলিত আইনে মানহানির দুই ধরনের প্রতিকার ব্যবস্থা রয়েছে–

ক. দেওয়ানী আদালতে

দেওয়ানী আদালতে মানহানির জন্য দুই প্রকার মামলা করা যায়–

১. মানহানিকর কিছু যেন প্রকাশিত না হয়, সে জন্য ইনজাংকশনের মামলা করা যায়। দেওয়ানী আদালত হতে ইনজাংকশন পাওয়ার জন্য দু'টি শর্ত

---

২২. প্রাগুক্ত
২৩. *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৩
২৪. *মানহানি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

www.pathagar.com

পূরণ করতে হবে। তা হলো যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তা অসত্য এবং তা প্রকাশ পেলে বাদীর অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

২. পত্রিকায় মানহানিকর কিছু প্রকাশিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি দেওয়ানী মামলার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে। যিনি মানহানিকর প্রকাশনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন তিনি তার মর্যাদা অনুসারে এবং কুৎসার ভয়াবহতা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন। মানহানিকর তথ্য যদি সত্য হয় তাহলে দেওয়ানী মামলায় প্রতিকার পাওয়া যায় না।[২৫]

দেওয়ানী আদালত কর্তৃক ক্ষতিপূরণ ধার্য

মর্নিং নিউজ নামক একটি দৈনিকে ১৯৪৯ সালের ১৭ এপ্রিল একটি সংবাদ ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাটি তৎকালীন পাকিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীকে জড়িয়ে ভারতে স্টীল বিক্রয় করার সংবাদ ছাপায়। যেহেতু তখন ভারতকে পাকিস্তানের শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হতো তাই ভারতে রড বিক্রি করা একটি দেশপ্রেম বিরোধী কাজ। এই সংবাদ মুদ্রণ করার ফলে মন্ত্রীর সুনাম ক্ষুণ্ন হয় বলে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি তার মানহানির দরুণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবিতে ঢাকা জেলার সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করেন। অতঃপর বিচার প্রক্রিয়া শেষে বিজ্ঞ আদালত ১৯৫৩ সালের ১২ মার্চ বিবাদীর বিরুদ্ধে (তৎকালীন মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীর অনুকূলে) ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেন। বিবাদী উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করেন। মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আপীল শুনানী শেষে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত টাকা প্রদানের আদেশ কমিয়ে তদস্থলে ১২,৫০০ (বারো হাজার পাঁচশত) টাকা ধার্য করে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন।[২৬]

খ. ফৌজদারী আদালতে

বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৫০০ ধারা অনুযায়ী মানহানির শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে "যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির মানহানি করে সে ব্যক্তি দু'বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে-দণ্ডিত হবে।"[২৭] এ ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী প্রমাণ করতে হবে-

ক. অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বিষয় মুদ্রণ বা খোদাই করেছিলেন।

খ. তা মানহানির শামিল ছিল।

গ. তিনি তা মানহানিকর বলে জানতেন বা তার অনুরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।[২৮]

---

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

২৬. *ডিএলআর* ১৫ (১৯৬৩), ঢাকা হাইকোর্ট, পৃ. ৫০১

২৭. *ফৌজদারী দণ্ডবিধি*, ধারা-৫০০

২৮. *মানহানি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

www.pathagar.com

নারীর প্রতি মিথ্যা আরোপের শাস্তি

যে ব্যক্তি কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদা করবার অভিপ্রায়ে এই উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য করে, কোন শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে যে উক্ত নারী অনুরূপ মন্তব্য বা শব্দ শুনতে পায় অথবা অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু দেখতে পায়, কিংবা উক্ত নারীর নির্জনবাসে অনধিকার প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে-যার মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত হতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[২৯]

ব্যাখ্যা

কোন নারীর উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কাজ করবার শাস্তি এই ধারায় বর্ণিত হয়ছে। শাস্তির পরিমাণ অনূর্ধ্ব এক বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
বাংলাদেশে এই ধারার অপরাধ বেড়েই চলেছে। স্কুল কলেজগামী মেয়েদের রাস্তাঘাটে দেয়া শিস, গান গেয়ে ওঠা, চোখ বাঁকা করে তাকানো অহরহ ঘটছে। নারীর শালীনতা এমন একটি বস্তু যা সংরক্ষণের দায়িত্ব নারী-পুরুষ সকলের, অর্থাৎ সমাজের তথা রাষ্ট্রের। তা একমাত্র নারীরই সম্পদ, পুরুষের বৈভব অন্যত্র।
এই ধারার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী প্রমাণ করতে হয় :

১. অভিযুক্ত ব্যক্তি–
   - ক. কোন মন্তব্য করেছিলেন, বা
   - খ. কোন শব্দ করেছিলেন, বা
   - গ. কোন অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন, বা
   - ঘ. কোন বস্তু প্রদর্শন করেছিলেন, বা
   - ঙ. কোন নারীর নিভৃতবাসে অনধিকার প্রবেশ করেছিলেন।

২. অভিযুক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত ক থেকে ঘ-এর ক্ষেত্রে উক্ত সকল কোন নারীকে শুনাতে বা দেখাতে অভিপ্রায় করছিলেন।

৩. এর দ্বারা তিনি কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদা করতে অভিপ্রায় করেছিলেন।[৩০]

মিডিয়ার মাধ্যমে মানহানি

প্রেস ও মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে মানহানি বর্তমান সময়ে একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি। এখানে আমরা প্রেস ও মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে মানহানির প্রসঙ্গটি আলোচনা করবো–

১. প্রতারিত বা প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বিবৃতি প্রদানের শাস্তি : প্রতারিত বা প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বিবৃতি প্রদানের শাস্তি প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কোড "কপিরাইট আইন-২০০০, ২৮ নং আইন, ১৫ অধ্যায়, ৮৮ নং ধারায় উল্লেখ হয়েছে : কোন ব্যক্তি–

ক. কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে এই আইনের কোন বিধানের আওতায় তার যে কোন কার্য সম্পাদনে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে, বা

---

২৯. *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭০, ধারা : ৫০৬

৩০. *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭০

www.pathagar.com

খ. এই আইন বা এর অধীন কোন বিষয় সম্পর্কে কোন কিছু করতে বা না করতে প্রভাবিত করবার অভিপ্রায়ে, মিথ্যা জেনে কোন মিথ্যা বিবৃতি বা ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তিনি অনুর্ধ দুই বছরের কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[৩১]

২. প্রণেতার মিথ্যা কর্তৃত্ব আরোপ

ক. কোন ব্যক্তি প্রণেতা নন এমন কারো নাম কোন কর্মের ভিতরে বা উপরে বা উক্ত কর্ম অনুলিপির ভিতরে বা উপরে এমনভাবে সন্নিবেশ বা সংযুক্ত করেন যাতে এই মর্মে ইঙ্গিত বহন করে যে, ঐরূপ ব্যক্তি কর্মটির প্রণেতা, অথবা

খ. এমন কোন কর্ম প্রকাশ, বিক্রয় বা ভাড়ায় প্রদান করেন অথবা বাণিজ্যিকভাবে জনসমক্ষে প্রদর্শন করেন যে, কর্মের ভিতরে বা উপরে এমন কোন ব্যক্তির নাম এমনভাবে সন্নিবেশ বা সংযুক্ত করা হয়ে থাকে যাতে এই মর্মে ইঙ্গিত বহন করে যে, ঐরূপ ব্যক্তি কর্মটির প্রণেতা বা প্রকাশক, কিন্তু যিনি তার জানামতে ঐরূপ কর্মের প্রণেতা বা প্রকাশন নন, অথবা

গ. দফা (খ) এ উল্লিখিত কোন কর্ম করেন বা সেই কর্মের পুনরুৎপাদন বিতরণ করেন, যে কর্মের ভিতর বা উপরে কোন ব্যক্তির নাম এমনভাবে সন্নিবেশ বা সংযুক্ত করা হয় যাতে এই মর্মে ইঙ্গিত করে যে, ঐরূপ ব্যক্তি কর্মটির প্রণেতা, কিন্তু তিনি তার জানা মতে ঐরূপ কর্মের প্রণেতা নন, অথবা কর্মটি জনসমক্ষে সম্পাদন করেন বা কোন বিশেষ প্রণেতার কর্মরূপে কর্মটি সম্প্রচার করেন যিনি তার জানামতে ঐরূপ কর্মের প্রণেতা নন, তিনি অনূর্ধ দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডণীয় হবেন।[৩২]

৩. সম্পাদকের দায়িত্ব

কোন মানহানিকর বিষয় যখন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় তখন তার জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদক দায়ী হবেন। এক্ষেত্রে তিনি বিষয়টি প্রকাশ হবার পূর্বে দেখেন অথবা না দেখেন তার জ্ঞান ব্যতিরেকে তা প্রকাশ করা হয়েছে মর্মে কোন ঘটনা এইক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। মানহানির অভিযোগের ক্ষেত্রে ইহা একটি কার্যকরী প্রতিরক্ষা যে, মানহানিজনক বিষয়টি প্রকাশ করবার সময় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন এবং তার অনুপস্থিতিতে তা প্রকাশ করা হয়েছে এবং তার অনুপস্থিতিতে তিনি সরল বিশ্বাসে যোগ্য লোকের নিকট ব্যবসথাপনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কিন্তু তিনি সেইরূপ করে থাকলে তার অনুপস্থিতিতে প্রকৃতপক্ষে কে সম্পাদক ছিলেন তার সাক্ষ্য দিতে হবে।[৩৩]

---

৩১. *বাংলাদেশ কোড*, বাংলাদেশ কপিরাইট আইন-২০০০, ২৮ নং আইন, ১৫ অধ্যায়, ধারা নং-৮৮
৩২. *বাংলাদেশ কোড*, বাংলাদেশ কপিরাইট আইন-২০০০, ২৮ নং আইন, ১৫ অধ্যায়, ধারা নং-৮৯
৩৩. *পিএলডি*, ১৯৬৩ লাহোর, ৩২৩

www.pathagar.com

৪. প্রকাশকের দায়িত্ব

যদি অপরাধ আইনের তুলনায় অপরাধ খুবই ছোট হয়, তাহলে সকল আইনজীবির মতে, একজন প্রধান তার অধীনস্ত ব্যক্তির অপরাধমূলক প্রকাশনার অপরাধের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকবেন।[৩৪] এটা হতে পারে যে, অর্পিত দায়িত্বশীলতা যখন একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তার নিম্নপদস্থ কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করে বিশেষত দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে এটাকে সাধারণ আইন থেকে অপরাধ আইনে স্থানান্তর করা হবে। এটা Libel Act 1843, 57 এর ধারাবলে গৃহীত হয়েছে।[৩৫]

৫. মিথ্যা অপবাদমূলক প্রকাশনা প্রচার ও প্রসার

মিথ্যা অপবাদমূলক প্রকাশনা হলো অপরাধ আইন ১৮৪৩ এর ধারা অনুযায়ী একটি লঘু অপরাধ। যার শাস্তি দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড। যদি এটি প্রমাণিত হয়, অপরাধী এটি জানতেন যে অপবাদটি মিথ্যা অথবা এটা যদি সত্যও হয়, তবে সাধারণ অপরাধ আইনে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং তার শাস্তি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বেশি হবে না।[৩৬]

৬. অশ্লীল প্রকাশনা

অশ্লীলতা মূলতঃ ধর্মযাজকের অপরাধ কিন্তু এটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কার্ল ১৬/এ যে, অশ্লীল অপবাদটির প্রকাশনাটি ছিল সাধারণ লঘু অপরাধ আইনের আওতায় কিন্তু বর্তমান এ আইনটি অশ্লীল প্রকাশনা আইন ১৯৫৯ ও ১৯৬৪ এর অন্তর্ভুক্ত।[৩৭]

---

৩৪. *Knupffer v London express Newspapers Ltd,* (1994) AC 116, (1994) 1 All ER 495; Ensor (1887) 3 TLR 366; *Stephen, Digest,* (4th Edition), P. 109.

৩৫. *Walter* (1799) 3 Esp 21; *Gutch, Fisher & Alexander* (1829) Mood & M 433. But of *Holbrook* (1877) 13 Cox CC 650. G AvBbwU বিশ্বের ১৯টি দেশ যথা : যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, চিলি, প্যারাগুয়ে, ফ্রান্স, হংকং, হাঙ্গেরি, ইন্ডিয়া, আয়্যারল্যান্ড, ইটালি, মালায়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড ও ইউনাইটেড স্ট্যাট অব আমেরিকা।

৩৬. *Boaler v R* (1888) 21 *QBD 284.* যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, চিলি, প্যারাগুয়ে, ফ্রান্স, হংকং, হাঙ্গেরি, ইন্ডিয়া, আয়্যারল্যান্ড, ইটালি, মালায়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড ও ইউনাইটেড স্ট্যাট অব আমেরিকায় এ আইনটি জারী আছে।

৩৭. Bailey, Harris & Jones, Ch 5, N.St. John Stevas, *Obscenity & the Law & (1954) Crim LR 817; C.H. Rolph, The Trial of Lady Chatterley; Robertson, Freedom, the Individual and the Law,* Ch 5; D.G.T. Williams. 'The Control of Obscenity' (1965) Crim LR 471, 522. G আইনটি বিশ্বের ১৯টি দেশ যথা : যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, চিলি, প্যারাগুয়ে, ফ্রান্স, হংকং, হাঙ্গেরি, ইন্ডিয়া, আয়্যারল্যান্ড, ইটালি, মালায়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড ও ইউনাইটেড স্ট্যাট অব আমেরিকা।

www.pathagar.com

৭. অপবাদমূলক লিখনী

অপবাদমূলক লিখনী সাধারণভাবে বলা হয় এমন একটি লিখনী যা একজন ব্যক্তির কুৎসা রটনা করা এবং তাকে ঘৃণ্য ও ঘৃণার পাত্র বানায়। আর এটি তাকে মানুষের কাছে হাস্যকর ও ঠাট্টার পাত্র হিসেবে পরিগণিত করে।[৩৮]

তবে অপবাদমূলক লিখনীর এ সংজ্ঞাটি টর্ট আইনের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ সংজ্ঞা নয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে লর্ড এ্যাটবিল এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে : "অপবাদমূলক লেখনীর মাধ্যমে মানহানি হলো এমন কথা, যা একজন ব্যক্তির সামাজিক অধিকারের ভিত্তিতে বাদীকে অনেক নীচু করে দেয়।" বহুল প্রচলিত এ সংজ্ঞাটি "Law of Criminal Libel" আইনের ধারা বলে গ্রহণ করা হয়েছে।[৩৯]

অপবাদমূলক লেখনীর প্রকাশনা আইন হলো লঘু অপরাধ। এ অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে 'Defamatory Libel' আইন-১৮৪৩ এর দ্বারা ৬ মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।[৪০]

৮. মানহানির উদ্দেশ্যে জালদলীল করার শাস্তি

কোন ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করা ও তার মানহানি করার জন্য তার স্বাক্ষর বা সুনাম জালিয়াতি করে কোন দলীল করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায়ে জালিয়াতি করে যে জালকৃত দলিল কোন সম্প্রদায়ের সুনাম নষ্ট করবে অথবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জেনে জালিয়াতি করে, সেই ব্যক্তি যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে-যার মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে-দণ্ডিত হবে তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।"[৪১]

এ ধারায় মানহানি বা সুনাম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে দলিল জাল করার জন্য অপরাধীকে তিন বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করবার বিধান রয়েছে। আলোচ্য ধারার অধীনে অপরাধীকে দণ্ডদানের জন্য প্রমাণ থাকতে হবে–

---

৩৮. *The Defamation Act 1952*. ss 1 & 6, Goldsmuth v Pressdram Ltd (1977) QB 83 at 87, per Wien J., *Gleaves v Deakin (1980)* AC 477 at 487, (1979) 2 All ER 497 at 502, per Viscount Dilhorne

৩৯. Adams (1888) 22 QBD 66, CCR. Law Com Working Paper No 84, Para No. 38; *The Defamation Act 1952*. ss 1 & 6, Goldsmuth v Pressdram Ltd (1977) QB 83 at 87, per Wien J., *Gleaves v Deakin (1980)* AC 477 at 487, (1979) 2 All ER 497 at 502, per Viscount Dilhorne

৪০. J.R. *Spencer in Reshaping the Criminal Law*, 285, quoted by Lord Edmund Davies, (1979) 2 All ER at 505; *Cf Law Com Working Paper* No 84, Paras No. 36 & 37; Foldsmith v Pressdram Ltd (1977) 2 All ER 557 9Wien J). Cf Desmind v Thorn (1982) 3 All ER 2868., (1983) 1 WLR 163 (Taylor J); Sir John Smith & Hogan, *Criminal Law*, Great Britain : The Bath Press, P. 737. যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, চিলি, প্যারাগুয়ে, ফ্রান্স, হংকং, হাঙ্গেরি, ইন্ডিয়া, আয়্যারল্যান্ড, ইটালি, মালায়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড ও ইউনাইটেড স্টাট অব আমেরিকায় বলবৎ রয়েছে।

৪১. *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, পৃ. ১০০

www.pathagar.com

ক. অভিযুক্ত ব্যক্তি দলিল জাল করেছেন;
খ. দলিল জাল করার উদ্দেশ্য ছিল জালকৃত দলিল ব্যবহার করে কোন সম্প্রদায়ের সুনাম নষ্ট করা; অথবা
গ. জালিয়াত জ্ঞাত ছিলেন যে, কারো মানহানির উদ্দেশ্যে উক্ত দলিল ব্যবহৃত হতে পারে; এতদ্‌সত্ত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তি দলিল জাল করেছেন।[৪২]

৯. মিডিয়ার মাধ্যমে অপপ্রচার প্রসঙ্গ

মিডিয়ার মাধ্যমে মানহানি ও অপপ্রচার ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর কেউ কোন খবর বললে মু'মিনদেরকে তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করে গ্রহণ করার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।"[৪৩]

এখানে আল্লাহ্ তাআলা মিডিয়ার সংবাদ গ্রহণের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা এবং ফাসিকের বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সত্যাসত্য যাচাই করে নেয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন। অধিকাংশ মুফাসসিরের অভিমত হলো এ আয়াতটি অলীদ ইব্‌নে 'উকবা ইব্‌নে আবূ মু'আইত সম্পর্কে নাযিল হয়। এ প্রসঙ্গে হারিস ইব্‌ন আবূ যিরার খুযায়ী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদিন আমি রসূল স. এর কাছে যাই। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ইসলাম গ্রহণ করে আমি মুসলমান হয়ে যাই। আমাকে যাকাতের কথা বলেন। তাও আমি মেনে নিলাম এবং বললাম : হে আল্লাহর রসূল স.! আমাকে বিদায় দিন। নিজ সম্প্রদায়ের নিকট যেয়ে তাদেরকে আমি ইসলামের প্রতি আহ্বান করবো এবং যাকাত আদায় করতে বলবো। যে আমার আহ্বানে সাড়া দিবে আমি তার নিকট হতে যাকাত উসূল করে নিজের কাছে রেখে দিব। আপনি অমুক সময় আমার কাছে একজন দূত পাঠিয়ে দিবেন, সে আদায়কৃত যাকাত আপনাকে এনে দিবে। হারিস রা. তাই করলেন এবং যথারীতি যাকাত উসূল করে নিজের কাছে জমা করে রেখে দিলেন কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে রসূল স. এর দূত না পৌছায় সে মনে মনে ভাবলো যে, আল্লাহ্‌র রসূল স. বোধ হয় আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এজন্যই দূত পাঠাতে বিরত রয়েছেন। এই ভেবে তিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে বললেন : আমার নিকট হতে যাকাতের পণ্য নিয়ে যাওয়ার জন্য রসূল স. অমুক সময় একজন দূত পাঠাবেন বলে আমাকে কথা দিয়েছিলেন। রসূল স. তো ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারেন না। বোধ করি তিনি আমার প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। অতএব চল, আমরা রসূল স. এর কাছে যাই। অপরদিকে রসূল স. ওয়াদামত যথাসময়ে ওলীদ ইব্‌ন উকবাকে হারিসের

---

৪২. *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, ধারা : ৪৬৯, পৃ. ৯৯

৪৩. আল-কুরআন, ৪৯ : ৬
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

www.pathagar.com

নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রওয়ানা হয়ে কতটুকু এসে ওলীদ ভয়ে ফিরে যেয়ে রসূল স. কে বলল : হে আল্লাহর রসূল স.! হারিস আমাকে যাকাতের মাল তো দেয়ই নাই বরং উল্টো আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। শুনে রসূল স. ক্ষুব্ধ হন এবং হারিসের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তাদের সাথে হারিসের মুখোমুখি সাক্ষাত হয়ে যায়। দেখে তারা বলল : এই তো হারিস! বলে তাকে তারা ঘিরে ফেলে। হারিস রা. জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কার কাছে প্রেরিত হয়েছ? তারা বলল : তোমার কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন : কেন? বলল : আল্লাহর রসূল তোমার নিকট ওয়ালীদকে পাঠিয়েছিলেন, তুমি নাকি তাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছ? শুনে স্তম্ভিত কণ্ঠে হারিস বললেন : শপথ ঐ সত্তার! যিনি মুহাম্মদ স. কে নবী করে পাঠিয়েছেন। আমি কোন দিন তাকে দেখিইনি আর সে আমার নিকট আসেইনি। অবশেষে হারিস রা. এসে রসূল স.-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছ এবং আমার দূতকে হত্যা করতে চেয়েছ, কথাটা কি ঠিক? হারিস বললেন : না, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমি তাকে দেখিনি, সে আমার কাছে আসেও নি। আমি তো আপনার দূতকে দেখতে না পেয়ে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন মনে করে আবার আসলাম। তখন উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়।[৪৪]

ক. চারিত্রিক মিথ্যা অপপ্রচারের শাস্তি

কেউ কোন পুরুষ বা মহিলাকে যিনা বা পুংমৈথুনের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করল এবং, এ অভিযোগ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ের করল, এ অপরাধে তাকে আশি দোররা দেয়া হবে। এভাবে মানুষের মান মর্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে অভিযোগকারী যদি তার অভিযোগের সমর্থনে চারজন পুরুষের সাক্ষ্য পেশ করতে পারে, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। কুরআন মজীদে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "আর যেসব লোক সুরক্ষিত চরিত্রবান মেয়েলোকদের উপর যিনার অভিযোগ আনে পরে সে জন্য চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিটি দোররা মার। তাদের সাক্ষ্য কখনই কবুল করবে না। ওরা ফাসিক। তবে যারা এই অপরাধ থেকে তওবা করবে ও নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহ নিশ্চয় ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।"[৪৫]

অভিযোগকারী যদি স্বাধীন ও শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার উপযোগী হয় এবং অভিযোগটা হয় যিনা করার এবং তা মিথ্যা হয় বা প্রমাণিত না হয়, তাহলে উপরোক্ত

৪৪. আহমাদ, ইমাম, *আল-মুসনাদ*, মিসর : দারু সাদির, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ২৭৯; তাবারানী, ইমাম, *আল-মু'জামুল কাবীর*, খ. ৩, পৃ. ২৭৪, হাদীস নং-৩৩১৭, আল-হাইছামী, 'আলী ইব্ন আবী বকর, ইমাম, *আল-মাজমা'উয যাওয়ায়িদ*, বৈরূত : দারুল কিতাবুল-'আরবী, ১৪০৭ হি.৭খ., পৃ. ১০৯

৪৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৪-৫

[والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهدأ فا جلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوْ الهم شهادة ابدأ-والئك هم الفاسقون-الاالذين تابوا من بعد ذالك واصلحوا-فان الله غفور رحيم.

www.pathagar.com

শাস্তি তাদের উপর কার্যকর করা হবে। আর অভিযোগ যদি যিনা বা পুংমৈথুন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে হয় এবং তা প্রমাণিত না হয় তাহলে তার উপর তাযীর ধার্য হবে। কিন্তু যিনার মিথ্যা অভিযোগ এক একটি ব্যক্তির, সেই সাথে আর বহু ব্যক্তির জীবনকে চিরতরে কলংকিত করে। অবশ্য এই শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে পাঁচটি শর্ত আর অপবাদদাতার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে।

যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে যে পাঁচটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে তা হল নিম্নরূপ–

(১) তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।
(২) বুদ্ধিমান হতে হবে।
(৩) মুসলমান হতে হবে।
(৪) স্বাধীন হতে হবে।
(৫) সৎচরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

অতএব কোন শিশু, পাগল, অমুসলিম, পরাধীন এবং চরিত্রহীন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দেয়া হলে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না, তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে। আর অপবাদদাতার মধ্যে যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে তা হল-

(১) অপবাদদাতাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।
(২) বুদ্ধিমান হতে হবে।
(৩) স্বাধীন হতে হবে।

অতএব অপবাদদাতা যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা পাগল হয়, তবে শরঈ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। অমুসলিমদেরকেও এ আইনে শাস্তি দেয়া যাবে এমনকি নারীকেও শাস্তি দেয়া যাবে।[৪৬]

খ. মিথ্যা অপপ্রচার বিষয়ে ইসলামি বিভিন্ন দিক

(১) যিনার অপবাদ একটি সর্বজনীন ও সর্বকালীন অপরাধ।
(২) অপবাদের শাস্তি বিষয়ক আয়াতে যদিও মুহসিনাত বা চরিত্রবতী সতী নারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তবুও আইনবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদের ন্যায় সৎ চরিত্রবান পুরুষের প্রতি অপবাদ দেয়া হলেও এ বিধানটি কার্যকর হবে। আর উভয়ে সমশাস্তি লাভ করবে।
(৩) এ বিধান কার্যকর হবে এমন কোন সৎচরিত্রবান পুরুষ বা সতী সাধবী চরিত্রবতী নারীর প্রতি দোষারোপ করা হলে। চরিত্রহীন সম্পর্কে এরূপ দোষারোপ করা হলে এ শাস্তি প্রযোজ্য হবে না।
(৪) এ শাস্তি প্রযোজ্য হওয়ার কতিপয় শর্ত রয়েছে–

---

৪৬. ইবনে হুমাম, কামাল উদ্দীন, *শারহু ফাতহিল কাদীর*, মিসর : মাকতাবাতুত তিযারাতিল কুবরা, ১৩৫৬ হি., খ. ৪, পৃ. ২০৮

www.pathagar.com

(ক) দোষারোপকারীকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।
(খ) সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।
(গ) স্বেচ্ছায় অপবাদ দিতে হবে
(ঘ) যার প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে সে দোষারোপকারীর পিতা কিংবা দাদা হলে চলবে না।
(ঙ) হানাফীদের মতে দোষারোপকারী ব্যক্তিকে বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে, পক্ষান্তরে শাফিঈদের মতে বোবা ব্যাক্তিকেও এরূপ শাস্তি দেয়া হবে।

আর যার প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে তার শর্ত হলো–

(ক) তাকে সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে, তবে ইমাম মালেক ও লাইসের র. মতে পাগলের উপরও এই দোষারোপ করা হলে শরয়ী শাস্তি প্রযোজ্য হবে। কেননা সে একটি প্রমাণহীন কথা বলেছে।
(খ) তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে, তবে প্রায় বালেগ বয়সের মেয়ের প্রতি এ দোষারোপ করা হলে যার সাথে যৌন সংগম করা সম্ভব, তবে দোষারোপকারী শাস্তি পাবে। কেননা এতে কেবল মেয়েটির নয় গোটা পরিবারের ইজ্জত নষ্ট হয়।
(গ) তাকে মুসলমান ও স্বাধীন হতে হবে।
(ঙ) তাকে চরিত্রবান হতে হবে।

উপরোক্ত শর্তগুলো পাওয়া না গেলে শরীয়ী শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তাকে রাষ্ট্রীয় শাস্তিও দেয়া যাবে না। বানানো মিথ্যা বা মিথ্যা অপপ্রচারের বিষয়ে একটি অকাট্য প্রমাণ হলো বিভিন্ন লোকের দ্বারা উম্মুল মু'মিনীনকে উদ্দেশ্য করে মিথ্যা রটনা বা প্রচারণা। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো–

কুরআনুল কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "আর যারা কোন সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই প্রকৃত ফাসিক।"[৪৭]

উপরিউক্ত আয়াতে ব্যভিচারের অভিযোগকারী ব্যক্তির শাস্তি প্রসঙ্গে ইবনে কাছীর র. বলেন : আল্লাহ্ তাআলা ব্যভিচারের অভিযোগকারী ব্যক্তি সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে তিনটি বিধান ওয়াজিব করে দিয়েছেন। ক. তাকে আশিটি দোর্‌রা মারতে হবে। খ. কখনও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। গ. সে আল্লাহ্ ও মানুষের নিকট ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে।[৪৮] এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায়, 'আয়েশা রা.

---

৪৭. আল-কুরআন, ২৪ : ৪
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

৪৮. ইব্‌নে কাছীর, ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৪০১হি., খ. ৬, পৃ. ১৩ ; আল-আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইব্‌ন আব্দিল্লাহ

www.pathagar.com

বলেন, আসমান হতে যখন আমার প্রতি অপবাদ মুক্তির আয়াত নাযিল হল, তখন রসূলুল্লাহ স. দণ্ডায়মান হয়ে তা উল্লেখ করে আয়াত তেলাওয়াত করলেন এবং দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে দোর্‌রা মারার জন্য হুকুম করলেন। অতপর তাদেরকে দোর্‌রা মারা হল।[৪৯]

গ. অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসারের শাস্তি

আল্লাহ্ তাআলা অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসার করা থেকে সকল মু'মিনকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় যারা চায় যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।"[৫০]

উপরোক্ত আয়াতের বর্ণনামতে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসার করা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের শুধু নিষেধই করেননি বরং তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা এ কাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ যারা মু'মিনদের বিরুদ্ধে অশ্লীল প্রচার করে, তাদের জন্য ইহ্কালে ও পরকালে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। ইহকালে তাদেরকে দোর্‌রা (কোড়া) মারা হবে, পরকালের শাস্তি অধিক যন্ত্রণাদায়ক হবে।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে : সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন ; রসূলুল্লাহ্ বলেছেন : "তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দিও না, তাদেরকে লজ্জা দিও না, আর তাদের গোপন বিষয়ে সন্ধান কর না। কারণ যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের গোপন বিষয়ের সন্ধান করবে, আল্লাহও তার গোপন বিষয় খুঁজে তাকে তার ঘরেই লাঞ্ছিত করবেন"।[৫১]

আল-হুসাইনী, *রূহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আজীম ওয়াস সাবয়িল মাছানী,* বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ৭৫

৪৯. তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা, *আস-সুনান,* বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি, খ. ১২, পৃ. ৫৫, হাদীস নং-৩৮৮০; ইব্‌ন মাজাহ, আবূ 'আব্দিল্লাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজিদ, ইমাম, *আস-সুনান,* খ. ৭, পৃ. ৪৭৪, হাদীস নং-২৫৫৭

عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم .

৫০. আল কুরআন, ২৪ : ১৯

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

৫১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪২৪ ; ইব্‌ন হিব্বান, *আস-সহীহ,* খ. ১৩, পৃ. ৭৫, হাদীস নং-৫৭৬৩ ; তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত,* বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি, খ. ৪, পৃ. ১২৫, হাদীস নং-৩৭৭৮

عن ثَوْبَان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُؤذوا عِبادَ الله ولا تُعيِّروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم، طلب الله عورته، حتى يفضحه في بيته"

www.pathagar.com

ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানহানি

ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মানহানি প্রসঙ্গে দণ্ডবিধির ভাষ্যানুযায়ী বলা হয়েছে যে, "যেই ব্যক্তি এইরূপ অভিপ্রায়ে বা এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তিকে অপমান করে এবং তদ্বারা তাহাকে ক্রোধোদ্দীপ্ত করে যে অনুরূপ ক্রোধোদ্দীপনার ফলে সে গণ-শান্তি নষ্ট করিবে বা অন্য যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করিবে, সেই ব্যক্তিকে যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে-যাহার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"[৫২]

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি বিভিন্ন সম্প্রদায় শ্রেণী বা অংশের লোকদের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা অপ অভিপ্রায় সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করিতে পারে এমন অভিপ্রায়ে কোন বিবৃতি, গুজব বা রিপোর্ট প্রণয়ন প্রকাশ বা প্রচার করে সেইব্যক্তি কারাদণ্ডে-যার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"[৫৩]

কোন ব্যক্তি কর্তৃক রাষ্ট্রের মানহানি ঘটলে তার শাস্তি

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, "যে ব্যক্তি মৌখিক বা লিখিত শব্দে চির দৃশ্যমান বা অন্য কোনভাবে এমন কিছু করে, অথবা এমন কোন জনশ্রুতি বা রিপোর্ট প্রণয়ন, প্রকাশ বা বিতরণ করে যা দেশের নিরাপত্তার, জনশৃংখলার, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সংরক্ষণের পক্ষে বা জনসাধারণের আবশ্যকীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও সেবা সংরক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকর কিংবা ক্ষতিকর হইতে পারে, সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে যাহার মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে।"[৫৪]

নিজের সম্মান নষ্ট করলে তার শাস্তি

নিজের সম্মান নিজে নষ্ট করলে তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ নেই। তবে অবহেলার জন্য যদি কোন ব্যক্তির সম্মান নষ্ট হয়, আর এ অবহেলার জন্য যদি কেউ কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।[৫৫]

---

৫২. *দণ্ডবিধির ভাষ্য*, প্রাগুক্ত, ধারা : ৫০৪, পৃ. ১০৬৬

৫৩. প্রাগুক্ত, ধারা : ৫০৫, পৃ. ১০৬৮

৫৪. প্রাগুক্ত, ধারা : ৫০৫-ক, পৃ. ১০৬৯

৫৫. যেমনঃ ডাক্তার গজনবীর শৈল্য চিকিৎসার সুনাম আছে। তাঁর একটি অস্ত্রপাচারে দেখা গেল যে, অবহেলার কারণে রোগীর পাকস্থলীতে একটি সূক্ষ্ম থেকে যায়, যার ফলে রোগীকে কয়েকদিন পর পুনরায় অস্ত্রপাচার করতে হয়। উপরিউক্ত সমস্যায় প্রকারান্তরে বর্ণিত হয়েছে যে, ডাক্তার গজনবীর শৈল্য চিকিৎসায় ইতিমধ্যেই বিশেষ যশ এবং খ্যাতি অর্জিত হয়েছে। সুনামধারী ডাক্তার হলেও অস্ত্র পাচারের ন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তার সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ডাক্তার গজনবী নিয়মিত এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্র পাচার করে থাকেন। যেহেতু ভুল হওয়া বা করা মানুষের স্বভাব, সেহেতু ক্ষেত্রেবিশেষে ভুলের কারণে রোগীর পাকস্থলীতে সূক্ষ্ম যন্ত্র রেখে অস্ত্রপাচার সমাপ্ত করার ন্যায় ভুল করা স্বাভাবিক। এরূপ

www.pathagar.com

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনে মানহানি প্রসঙ্গ

কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তির সুনাম বা সম্মান নষ্ট করা আমাদের দেশের আইনে যেমন দণ্ডনীয় অপরাধ ঠিক তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনেও এটি একটি জঘন্য কাজ। নিম্নে বিশ্বের কয়েকটি দেশের আইনে মানহানির শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আইনে মানহানির শাস্তি প্রসঙ্গ

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আইনে মানহানিকে গুরুতর অপরাধ বলে মনে করা হয়। তাদের মতে, একজন মানুষ অপর একজন বিবেকবান মানুষের দ্বারা আহত হওয়াই হলো মারাত্মক অপরাধ, সেটি শারীরিক হোক বা মানসিক হোক। এ আইনে বলা হয়েছে, একটি আঘাত বা ক্ষতির মারাত্মক আকার নির্ধারণ করা হতো আঘাতের প্রকৃতি, স্থান ও ব্যক্তির মর্যাদা বিবেচনা করে। যদি কোন ব্যক্তি লাঠির দ্বারা মার খেয়ে আহত হতো তাহলে তার আঘাতের প্রকৃতি মারাত্মক আকার ধারণ করত। যদি কোন ব্যক্তি থিয়েটারে বা সভা সমিতিতে বা প্রেটরের সম্মুখে আঘাতপ্রাপ্ত হতো তাহলে তার আঘাতের প্রকৃতি মারাত্মক আকার ধারণ করত। যদি সিনেটর বা সিনেটিরের পর্যায়ে কোন ব্যক্তি নীচু স্তরের কোন ব্যক্তি দ্বারা বা পিতা সন্তানের দ্বারা বা প্রাক্তন মালিক মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের দ্বারা অপমানিত হতো তাহলে এই অপমান মারাত্মক আকার ধারণ করত।[৫৬]

আর যদি অপমানিত ব্যক্তি মামলা চলাকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে অপরাধের শাস্তি রহিত হয়ে যায়। তবে তার পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ যদি পুনরায় মামলা করে তাহলে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হয়।[৫৭]

মূল্যায়নে অবহেলাজনিত দায়িত্বের জন্য তাঁকে ক্ষমা করা সমীচিন হলেও আইনের মাপকাঠিতে এটা ক্ষমাযোগ্য দায় নয়। অস্ত্রপাচার কালে অসাবধানতাবশতঃ রোগীর পাকস্থলীতে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র থেকে যাওয়া নিঃসন্দেহে অবহেলার পর্যায়ভুক্ত, ফলে রোগীটিকে পুনরায় অস্ত্রপাচার করা হয়েছে এবং জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। আইনে জনাব গজনবীর এরূপ কার্যকে অবহেলাপ্রসূত দায় হিসেবে চিহ্নিত করে দায়িত্বের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। অবহেলার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্যের নিরিখে আলোচ্য অবহেলা সাধারণ অবহেলার পর্যায়ে রেখে আদালত ডাক্তার গজনবীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশে দিতে পারেন। অবহেলা যদি সাধারণ প্রকৃতির হয় তবে দেওয়ানী দায় সৃষ্টি হবে ফৌজদারী দায় নয়। অবশ্য আদালতের বিচারে কোন অবহেলা জঘন্য শারীরিক আঘাত বা মৃত্যুর কারণ হলে তা মারাত্মক অবহেলা গণ্য করা হবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধকে ফৌজদারী দায়ে অভিযুক্ত করাও অযৌক্তিক হবে না।- *জুরিস্প্রুডেন্স [লিগ্যাল থিয়োরীসহ]*, পৃ. ৫১৬

৫৬. Buckaland, W.W., *AText Book of Roman law from Augustas to justinian,* Cambridge, Cambridge University Press, 1975, P. 458.

৫৭ Hossain,Hamza, *A Hand Book of Criminology*, Dhaka, Didar Publishing House, 1975, P. 245; Paranjzpe. N.V., *Crominology and Penology,* Allahabad, Central Law Agdncy, 1980, P. 451; Cf Desmind v Thorn (1982) 3 All ER 2868., (1983) 1 WLR 163 (Taylor J); Sir John Smith & Hogan, *Criminal Law*, Ibid., P. 737. এ আইন ইউনাইটেড স্ট্যাট অব আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া,

www.pathagar.com

এ আইনে আরো বলা হয়েছে যে, "কাউকে পরিকল্পিতভাবে অপমান-অপদস্ত করার ক্ষেত্রেও এ আইন প্রযোজ্য। অপরাধী নিজে অথবা অপর কাউকে দিয়ে যদি ভয় দেখায়, গালিগালাজ করে অথবা অপমানজনক কথা বলে অথবা অপমানজনক আচরণ করে তাহলেও এ অপরাধের জন্য অপরাধী উক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে।"[৫৮]
অবশ্য বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড নির্ধারণ হয়ে থাকে। তাই অপরাধটি যদি একজন সম্ভ্রান্ত ও নামী-দামী ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় এবং অধিক গুরুতর হয় তাহলে অপরাধীর শাস্তি উল্লিখিত দণ্ডের চেয়ে বেশিও হতে পারে।[৫৯]
প্রাচ্য আইনে মানহানিকে একটি মানবতা বিরোধী অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের দেশে মানহানির শাস্তি বর্তমান ইসলামী শরীয়তে কাযফ এর শাস্তির আওতায় ছিল এবং এটি অবশ্যই অপমানকারীকে ভোগ করতে হতো যদি সে জীবিত থাকত। এ আইন এখনও প্রচলিত ও কার্যকর আছে।[৬০]

ইসলামী আইনে মানহানি

মানহানির শব্দাবলীর পর্যালোচনা : ইসলামী আইনে মানহানি প্রসঙ্গটি قذف -মিথ্যা অপবাদ, إفتراء -মিথ্যা রটনা বা মিথ্যা ঘটনায় সম্পৃক্ত করা, استهزاء -বিদ্রূপ করা, استخفاف -হেয় প্রতিপন্ন করা, سخر (সাখরুন) ঠাট্টা করা, বিদ্রূপ করা,همزة ও لمزة (হুমাযাহ ও লুমাযাহ) কাউকে কটাক্ষ করা, দুর্নাম করা, عرض ('ইরদ্) সম্মান, মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, বংশমর্যাদা, ظن -সত্যাসত্য যাচাই না করে কোনো কথা বলা বা অভিযোগ করা বা খারাপ ধারণা করা ইত্যাদি শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। নিম্নে এ শব্দগুলোর বিশ্লেষণের পাশাপাশি ইসলামী আইনে এর বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো–

অস্ট্রিয়া, কানাডা, চিলি, হংকং, হাঙ্গেরি, আয়্যারল্যান্ড, ইটালি, নিউজিল্যান্ড, পোল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যাণ্ড-এ বলবৎ রয়েছে
- আওদাহ, আব্দুল কাদির, *আত-তাশরীউল জিনাঈ ফীল ইসলাম*, মিসর : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৫০২; আস-সরুর, ড. আহমাদ ফতহী, *আস-সিয়াসাতিল জীনাঈয়া ফিকরাতুহা ওয়া মাজাহিবুহা ওয়া তাখত্বীতুহা*, মিসর : দারুল নুহজাতিল 'আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৭ খ্রি., পৃ. ১৯-২২

৫৮. DPP v Orum (1988) 3 All ER 449, (1989) 1 WLR 88, DC.; Lodge v DPP (1988) Times, 29 October 1988; Chambers v DPP (1995) Crim LR 896; আল-উসইউতী, ড. সরুউত আনিছ, *ফালসাফাতুত তারীখুল 'ঈকাবী*, মিসর : সমসাময়িক মিসরীয় জার্ণাল, জানুয়ারী, ১৯৬৯ খ্রি., সংখ্যা-২৫৫, পৃ. ২৫১-২৫৩

৫৯. Smith & Hogan, *Criminal Law*, Ibid., P. 769; Lodge v DPP (1988) Times, 29 October 1988; Chambers v DPP (1995) Crim LR 896.Baily, Harris & Ormerod, *Civil Liberties*, 5th edition, 2001, P. 490

৬০. Rupert, *Crime Proof and Punishment*, CFH Tapper, 1981, P. 457; J.R. Spencer in *Reshaping the Criminal Law*, 285, quoted by Lord Edmund Davies, (1979) 2 All ER at 505; *Cf Law Com Working Paper No 84*, Paras No. 36 & 37; Foldsmith v Pressdram Ltd (1977) 2 All ER 557 9Wien J). এ আইন ইন্ডিয়া, আয়্যারল্যান্ড, মালায়েশিয়ায় বলবৎ রয়েছে। -*আত-তাশরীউল জিনাঈ ফীল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৯

www.pathagar.com

কাযাফ (قذف) যিনার অপবাদ

'কাযাফ' (قذف) শব্দের আভিধানিক অর্থ নিক্ষেপ করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হবে, মুহসিন বা মুহসানা তথা কোন সৎপুরুষ বা কোন সতী নারীর প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যিনার অপবাদ দেয়া। এরূপ অপবাদ দেয়া কবীরা গুনাহ।[৬১]

যেমন, কোন ব্যক্তিকে তার জন্মদাতা পিতাকে বাদ দিয়ে অপর কোন ব্যক্তির সন্তান বলে আখ্যায়িত করা। এরূপ অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিকে তার দাবির সমর্থনে অবশ্যই চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। অন্যথায় তাকে মিথ্যা অপবাদের দায়ে (হদ্দে কাযাফ) হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রদান করা হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন : "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে এরপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না এবং তারাই তো ফাসিক।"[৬২]

হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমার পবিত্রতা বর্ণনা সম্বলিত আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন নবী করীম স. মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন, এরপর পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করেন। তারপর মিম্বর থেকে অবতরণ করে দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলা সম্পর্কে শাস্তির নির্দেশ দেন, তখন লোকেরা তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করে।[৬৩]

উল্লেখ্য যে, অপবাদদাতা পুরুষ হোক কিংবা নারী তারা যদি উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা যিনা প্রমাণ করতে না পারে তবে তাদের উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে নারী পুরুষে কোন পার্থক্য করা হবে না।

মুহসিন ও মুহসানার সংজ্ঞা

মুহসিন ও মুহসানা শব্দ দু'টো ইহ্সান (احصان) থেকে নিষ্পন্ন। ইহসান-এর পারিভাষিক অর্থ সহীহ বিবাহের ভিত্তিতে জ্ঞানবান, বালিগ মুসলিম পুরুষ, কোন বালিগ জ্ঞানবান আযাদ 'মুসলিম' নারীর সাথে সহবাস করা এ জাতীয় পুরুষকে পরিভাষায় মুহসিন এবং নারীকে মুহসানা বলা হয়।[৬৪]

ইহ্সান احصان-এর শর্তাবলী

ইহসান এর জন্য ব্যক্তির মধ্যে ছয়টি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক ১. স্বাধীন ২. প্রাপ্ত বয়স্ক, ৩. জ্ঞানবান, ৪. মুসলিম, ৫. সতী-সাধ্বী নারীকে বিবাহ করা, ৬. সহীহ্ বিবাহ।[৬৫]

---

৬১. হোসাইনী, ড. মাহমুদ নজীব, *ইলমুল 'ঈকাব*, মিসর : দারুল নুহজা, ১৯৬৭ খ্রি., পৃ. ১৪

৬২. আল-কুরআন, ২৪ : ৪
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

৬৩. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৫৫, হাদীস নং-৩৮৮০
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلَا تَعْنِي الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ.

৬৪. আবূ জাহরা, মুহাম্মদ, *আল-জারীমাহ ওয়াল উকূবাতু ফীল ফিকহিল ইসলামী*, বৈরূত : দারুল ফিকরিল আরাবী ১৪০১ হি., পৃ. ৬-৭

৬৫. *আস-সিয়াসাতুল জিনাইয়া ফীশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

www.pathagar.com

কোন পুরুষ বা নারীর মধ্যে বৈধ পন্থায় বিবাহ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উপরোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে সে মুহসিন বা মুহসানা বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত শর্তাবলীর কোন একটি বা সবগুলোর অবর্তমানে কোন ব্যক্তিকে মুহসিন বা মুহসানা বলা যাবে না। সুতরাং বালিগ, পাগল, অমুসলিম ও অবিবাহিত কিংবা অশুদ্ধ বিবাহ বা ফাসিদ বিবাহের দ্বারা কোন ব্যক্তির ইহ্সান সাব্যস্ত হবে না।

যে যে শব্দ দ্বারা অপবাদ আরোপ করা হয়

অপবাদ আরোপের শব্দসমূহ তিন প্রকার ১. সারীহ (صريح) স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ, ২. কিনায়াহ (كناية)অস্পষ্ট বা পরোক্ষ ৩. তারীয (تعريض) ইংগিতবহ।

১. **সারীহ (صريح) স্পষ্ট শব্দাবলী :** ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী সরীহ্ শব্দ দ্বারা অপবাদ আরোপ করা হলে এতে অপবাদদাতার উপর হদ্দে কাযাফ তথা অপবাদের দণ্ড কার্যকর হবে। যেমন, কেউ কাউকে সম্বোধন করে বলল, হে ব্যভিচারিনী কিংবা বলল, তুমি যিনা করেছ। তারপর সে যদি শরীয়ত সম্মত পন্থায় সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারে তবে তার উপর হদ্দে কাযাফ কার্যকর হবে।

২. **কিনায়াহ كناية)) তথা অস্পষ্ট বা পরোক্ষ শব্দাবলী :** কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বলল, হে পাপাচারীনী কিংবা বলল, হে দুশ্চরিত্রা নারী অথবা বলল, (ياخبيثة) হে ভ্রষ্টা রমণী কিংবা কোন মহিলা কোন পুরুষের ক্ষেত্রে অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করল। তাহলে এমতাবস্থায় শুধু এসব শব্দ ব্যবহার করার কারণে তা কাযাফ হিসেবে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি উপরোক্ত শব্দাবলী কারো উপর প্রয়োগ করার পর বলে, আমি এসব অপবাদের উদ্দেশে বলিনি এবং প্রতিপক্ষ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তার কথাই শপথের সাথে গৃহীত হবে। এ ক্ষেত্রে বিচারকের উপর কর্তব্য হবে, সুবিচারের আলোকে তার উপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা। কেননা, সে এসব অশ্লীল শব্দ দ্বারা এক ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়েছে তার মানহানি করেছে এবং যিনার অপবাদ না হলেও অন্তত তাকে কলংকিত করেছে। যেহেতু শুধু কিয়াস তথা অনুমানের উপর ভিত্তি করে হদ্দ কার্যকর করা যায় না, সেহেতু এক্ষেত্রে একমাত্র তাযীর দণ্ড প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩. **তারীয (تعريض) অর্থাৎ ইঙ্গিতবহ শব্দ কারো প্রতি প্রয়োগ করা :** যেমন কেউ কাউকে সম্বোধন করে বলল, হে বৈধ সন্তান! অথবা বলল, আমি তো কখনো যিনা করিনি কিংবা বলল, আমার বংশধারা তো পরিচিত অথবা বলল, আমার মা ব্যভিচারিনী নয় ইত্যাদি।[৬৬]

এ তা'রীয অর্থাৎ ইঙ্গিতবহ শব্দ কাযাফ কিনা এ ব্যাপারে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে হানাফী ইমামগণের মতে, এর দ্বারা কাযাফ হয় না। যদিও কাযাফের উদ্দেশ্যেই এসব শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কেউ যদি কাউকে বলে, হে ব্যভিচারী! এমন সময় অপর এক লোক বলল, সত্য বলেছ; তা হলে এসব

---

৬৬. *আস-সিয়াসাতুল জিনাঈয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

www.pathagar.com

সমর্থনসূচক শব্দ দ্বারা অপবাদ হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, সত্যই বলেছো, তুমি যেমন বলেছো, সে তেমনই ছিল। তাহলে তা অপবাদরূপে গণ্য হবে। কারণ প্রথম ব্যক্তি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে বিশেষণ বর্ণনা করেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি সে বিশেষণের সমর্থনে তার নামও উল্লেখ করেছে। আর এ কারণেই তার এই বাক্য অপবাদরূপে পরিগণিত হবে।[৬৭]

যদি কেউ কারো জন্মসূত্র অস্বীকার করে বলে, 'তুমি তোমার পিতার ঔরসজাত নও' তাহলে তা কাযাফ হবে এবং অপবাদদাতা কাযাফ-এর দণ্ডে দণ্ডিত হবে। আর এটা তখন হবে যখন অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির মা হবে স্বাধীন মুসলিম নারী। কেননা এই কাযাফ তথা যিনার অপবাদ মূলতঃ তার মাকে লাগানো হয়েছে। আর বংশ সূত্র ব্যভিচারী সন্তান ব্যতিত অন্য কারো জন্মসূত্র ছিন্ন করা যায় না। যদি কেউ কাউকে রাগান্বিত হয়ে বলে, তুমি তোমার পিতার ঔরসজাত সন্তান নও কিংবা বলে তুমি অমুকের সন্তান না, তাহলে তা কাযাফ হবে আর যদি ক্রোধান্বিত না হয়ে বলে তা হলে কাযাফ হবে না।[৬৮]

যদি কোন পুরুষ কোন সচ্চরিত্রবান পুরুষকে কিংবা কোন সতী-সাধ্বী নারীকে স্পষ্ট যিনার শব্দ দ্বারা অপবাদ দেয়। যেমন বলে, তুমি যিনা করেছ অথবা বলে, হে যিনাকারিনী, তাহলে তা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে। যদি কেউ কাউকে বলে, হে যিনার সন্তান অথবা বলে, হে যিনার পুত্র! অথচ যাকে বলা হল, তার মা হল সতী-সাধ্বী নারী তাহলেও অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে।[৬৯]

যদি কেউ কাউকে বলে, তুমি যিনা করেছ এবং অমুক তোমার সাথে ছিল, তাহলে তা তাদের উভয়ের জন্যই কাযাফ হবে।[৭০] যদি কেউ কাউকে বলে, নিশ্চয় তুমি ছিলে সে ব্যভিচারিনী রমণীর সাথে তাহলে কাযাফ হবে। যদি কেউ কোন আরবীকে অথবা কোন বাঙ্গালীকে অবাঙ্গালী অনারবী বলে সম্বোধন করে তা হলে তা কাযাফ হবে না। যে লোক পূর্ব থেকেই যিনা-ব্যভিচারে অভ্যস্থ এমন লোককে যিনার অপবাদ দিলে তা কাযাফ হবে না।[৭১]

কাযাফ-এর শাস্তি সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলী

কাযাফ তথা ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের কাজটি হদ্দ তথা শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্যে শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর কোন রূপ

---

৬৭. শাইখুল ইসলাম, তাকীউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, আল-*ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ মিন ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ*, রিয়াদ : আল-মুআস্‌সাসতুল ঈদীয়াহ, তা.বি., পৃ. ১৭৯; রাশিদ, ড. 'আলী, *মু'জামুল ক্বানূনিল জিনায়ী*, মিসর : আন-নুহজাতুল আরাবীয়াহ প্রেস, ১৯৫৭ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ৪৯৪; আহমাদ, ড. ওকাজ, ফাকরী, *ফালসসাফাতুল 'উকূবাতু ফীশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ক্বানূন*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., পৃ. ৫০

৬৮. মারগিনানী, বুরহানুদ্দীন, *আল-হিদায়া*, দেওবন্দ : আল-মাকতাবাতুল হিন্দীয়াহ, খ. ২, পৃ. ৫৮

৬৯. *আস-সিয়াসাতুল জিনাঈয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৭০ আশ-শাজলী, ড. হাছান আলী, *আছরুত তবীকিল হুদূদ ফিল মুজতাম'*, রিয়াদ : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৯৬ হি., পৃ. ৯০৫

৭১ *আস-সিয়াসাতুল জিনাঈয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

www.pathagar.com

সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই ব্যভিচার করার অপবাদ দিয়েছে। বরং অপবাদদাতার মধ্যে যে শর্তগুলো থাকতে হবে সেগুলো হচ্ছে-

১. বালিগ হওয়া,
২. জ্ঞানবান হওয়া,
৩. বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, বোবা না হওয়া,
৪. স্বেচ্ছায় অপবাদ আরোপ করা,
৫. শরয়ী বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা।[৭২]

সুতরাং নাবালিগ, পাগল, মুক বা বোবা এবং বল প্রয়োগে বাধ্যকৃত ব্যক্তি অপবাদ আরোপ করলে তাদের উপর হদ্দ কার্যকর হবে না।

অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি পুরুষ হলে তার জন্য শর্ত

অপবাদদাতার উপর শরয়ী দণ্ড কার্যকর করার জন্য অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী থাকতে হবে। যথা–

১. মুসলমান হওয়া,
২. আযাদ হওয়া,
৩. বালিগ হওয়া,
৪. পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়া,
৫. মুক বা বোবা না হওয়া,
৬. যৌনাঙ্গ কর্তিত না হওয়া,
৭. খাসী অর্থাৎ অণ্ডকোষ কর্তিত না হওয়া,
৮. মহিলাদের ক্ষেত্রে তাদের যৌনাঙ্গ বন্ধ না হওয়া অথবা যৌনাঙ্গ ও গুহ্যদ্বার একসাথে মিশে না যাওয়া।
৯. বৈবাহিক সূত্রে অথবা মিলকে ফাসিদের ভিত্তিতে সঙ্গম না হওয়া।
১০. অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি অপবাদদাতার সন্তান বা সন্তানের সন্তান না হওয়া।[৭৩]

কাযাফ বা অপবাদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্তাবলী

১. স্পষ্ট ও পরিষ্কার صريح শব্দ দ্বারা যিনার অপবাদ দেয়া। এরকম বলা যে, তুমি যিনা করেছ বা তোমার যৌনাঙ্গ যিনা করেছে ইত্যাদি।
২. কোন সন্তানের জননী সতী-সাধ্বী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ঐ সন্তানের বৈধ ও স্বীকৃত বংশসূত্রকে অস্বীকার করা। যেমন-তুমি অমুকের সন্তান নও।
৩. অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি (مقذوف) আদালতে কাযাফ-এর বিচারপ্রার্থী হওয়া। বিচার প্রার্থনা না করলে অপবাদদাতার উপর হদ্দের হুকুম সাব্যস্ত হবে না।

---

৭২ হুজ্জাতুল ইসলাম, ইমাম আবূ হামিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-গাজালী, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৩২৯

৭৩. প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

উপরোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া গেলে কাযাফ তথা যিনার অপবাদদাতার উপর কাযাফ এর হদ্দ সাব্যস্ত হবে। অপবাদদাতা যদি আযাদ হয় তা হলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। আর সে যদি ক্রীতদাস হয় তাহলে তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা হবে।[৭৪]

কাযাফের হুকুম

কাযাফের হদ্দ হক্কুল ইবাদ-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এই হদ্দ তখনই কার্যকর করা হবে, যখন অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করে হদ্দ কার্যকর করার দাবি করবে নতুবা হদ্দ কার্যকর হবে না। অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি যদি তার অভিযোগের সমর্থনে শরীয়ত সম্মত উপযুক্ত চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে অপরাধ প্রমাণ করতে না পারে তখন উক্ত অভিযোগ কাযাফ হিসেবে গণ্য হবে এবং অভিযোগকারী আযাদ হলে তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত ও গোলাম হলে ৪০টি বেত্রাঘাত দণ্ড প্রদান করা হবে। কাযাফ-এর স্বীকারোক্তি প্রদানের পর তা অস্বীকার বা প্রত্যাহার করলে আদালতে তা গৃহীত হবে না।[৭৫]

উল্লেখ্য যে, মানহানির শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাতের যে শাস্তির কথা উপরে উল্লেখ হয়েছে, তা ভারত, বৃটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে পূর্বে কার্যকর ছিল। যদিও অনেক দেশেই সরকারীভাবে এটি বিলুপ্তির ঘোষণা দিয়েছে তথাপি পরিবার, বিদ্যালয় এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানে এর ব্যবহার এখনও লক্ষ করা যায়। বেত্রাঘাতের জন্য বেতের তৈরী ছড়ি ছাড়াও রাবার দ্বারা তৈরীকৃত ছড়িও তারা ব্যবহার করত বলে জানা যায়। এটি আমেরিকার কোন কোন রাজ্যে এবং ভারতে সরকারিভাবে এ পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটে।[৭৬]

কাযাফ-এর হদ্দ প্রয়োগের ব্যাপারে হানাফী ইমামগণের অভিমত হচ্ছে, অপবাদকারীকে যিনাকারীর তুলনায় হালকাভাবে বেত্রাঘাত করতে হবে অর্থাৎ ৮০ টা বেতই মারা হবে। তবে যিনাকারীকে যেমন কঠোরভাবে প্রহার করা হয়; তাকে ঠিক ততটা কঠোরভাবে প্রহার করা হবে না। শরীরের একস্থানে সব বেত মারা যাবে না। অপবাদদাতার উপর কাযাফ-এর হদ্দ প্রয়োগ করার সময় তার গায়ের সাধারণ কাপড় খুলে ফেলা যাবে না। কাপড় পরিহিত অবস্থায় তার উপর হদ্দ

---

৭৪. সরুর, ড. আহমাদ ফতহী, *আস-সিয়াসাতুল জিনাঈয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৭৫. *মুজামুল ক্বানূনিল জিনায়ী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯৪

৭৬. Paranjape, N.V., *Criminology and Pelology*, Allahbad : Central Law Agency, 1980, P. 120; Sir John Smith & Hogan, *Criminal Law*, Great Britain : The Bath Press, P. 737; Adams (1888) 22 QBD 66, CCR. *Law Com Working Paper* No 84, Para No. 38; J.R. Spencer in *Reshaping the Criminal Law*, 285, quoted by Lord Edmund Davies, (1979) 2 All ER at 505; *Cf Law Com Working Paper* No 84, Paras No. 36 & 37; Foldsmith v Pressdram Ltd (1977) 2 All ER 557 9Wien J); Cf Desmind v Thom (1982) 3 All ER 2868., (1983) 1 WLR 163 (Taylor J).

www.pathagar.com

প্রয়োগ করা হবে। তবে তুলা বা লোম ইত্যাদিতে পূর্ণ জ্যাকেট জাতীয় পোশাক শরীরে থাকলে তা খুলে নিতে হবে।[৭৭]

কাযাফ-এর শাস্তি ভোগকারীর সাক্ষ্য

হানাফী ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যিনার অপবাদদাতার উপর হদ্দে কাযাফ কার্যকর করার পর তার সাক্ষ্য চির কালের জন্য অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে, "যারা সতী-সাধ্বী রমণীদের উপর অপবাদ আরোপ করে, তারপর চারজন সাক্ষী আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না।"[৭৮]

কাযী শুরাইহ, সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখয়ী, ইবনে সিরীন, সুফিয়ান সাওরী র. প্রমুখ ফকীহগণের মতে তার সাক্ষ্য চিরদিনের জন্য গ্রহণযোগ্য হবেনা। ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের র.-এরও এই অভিমত।

পক্ষান্তরে, আতা, মুজাহিদ, শাবী, ইমাম মালিক, শাফেয়ী, লাইস, আহমদ র. প্রমুখ ফকীহগণের অভিমত হল তাওবা করার পর কাযাফ এ শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে।[৭৯]

২. إفتراء (ইফতিরা)

إفتراء (ইফতিরা) শব্দের অর্থ : মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া অসত্য বক্তব্য, অবাস্তব ভিত্তিহীন কল্পনাপ্রসূত কোন অভিযোগ বা দোষ কারো উপর আরোপ করা।[৮০] ইসলামী পরিভাষায়, "কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানানো প্রচারণাকে ইফতিরা বলা হয়।"[৮১]

আল-কুরআনে এ শব্দটির সরাসরি উল্লেখ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেউ এসব আহার করতে পারবে না', এবং কতক গবাদি পশুর পৃষ্ঠে

---

৭৭. অনুরূপ কোন ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান যদি কোন মুসলমানকে যিনার অপবাদ দেয়, তাহলে কাযাফ-এর হদ্দ স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত লাগান হবে। -*আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ মিন ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭৯

৭৮. আল-কুরআন, ২৪ : ৪-৫
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.

৭৯. সাইয়্যেদ সাবেক, *ফিকহ আল-সুন্নাহ,* ইরাক : দারু মাতবা'আতুশ শায়াব, তা.বি, খ. ২, পৃ. ৩৭৬

৮০. *লিসানুল আরব,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২

৮১. *ইলমুল 'ঈকাব,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; *আস-সিয়াসাতিল জীনাঈয়া ফিকরাতুহা ওয়া মাজাহিবুহা ওয়া তাখত্বীতুহা,* পৃ. ১৯; *আত-তাশরী'ঈল জিনায়ীল ইসলামী,* পৃ. ১৩৪; আল-উসইউতী, ড. সরুউত আনিছ, *ফালসাফাতুত তারীখুল 'ঈকাবী,* মিসর : সমসাময়িক মিশরীয় জার্নাল, জানুয়ারি, ১৯৬৯ খ্রি., সংখ্যা-২৫৫, পৃ. ২৫১

www.pathagar.com

আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কতক পশু যবেহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয় না। এসমস্তই তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে; তাদের এ মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাদেরকে দিবেন।"[৮২]

আল-কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "যারা নির্বুদ্ধিতার দরুণ ও অজ্ঞতাবশত নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ গণ্য করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।"[৮৩]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "(হে নবী!) আপনি বলে দিন, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবে না।"[৮৪]

আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী র. বলেন : ইফতিরা (বানানো মিথ্যা) আর কিয্‌ব (মিথ্যা)-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, মিথ্যা কখনো কল্যাণকরও হতে পারে এবং বৃহত্তর কল্যাণে মিথ্যা প্রয়োগের অবকাশ আছে। যেমনঃ বিবদমান দু'টি পক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও বিবাদ নিরসনে কোন মধ্যস্থতাকারী প্রয়োজনে অসত্য তথা মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে, তা অপরাধ হবে না। কিন্তু ইফতিরা এমন মিথ্যা, যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি করা হয়, বানানো হয় শুধুই অন্যের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে, যাতে কল্যাণের কোন অবকাশ নেই।[৮৫]

কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে কোন অসত্য অভিযোগ করে কিংবা প্রচারণা চালায়, আর প্রচারণায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রচারণাকারীর বিরুদ্ধে অসত্যের অভিযাগ করে এবং প্রচারণাকারী তার প্রচারণার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করে প্রমাণ না করতে পারে তবে মিথ্যা প্রচারণায় অন্যের ক্ষতি করার অপরাধে (মানহানির কারণে) সে তাযিরী দণ্ডে দণ্ডিত হবে।"[৮৬]

---

৮২. আল-কুরআন, ৬ : ১৩৮
وَقَالُوا هَذِهِ أَنعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

৮৩ আল-কুরআন, ৬ : ১৪০
قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ.

৮৪ আল-কুরআন, ১০ : ৬৯ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ

৮৫ ওয়াযারাতুল আওকাফ, *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, আল-কুয়েত, ১৯৯৭, খ. ৭, পৃ. ৯৫; *শরহে ফাতহিল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১২; আল-মাওয়ারদী, আবুল হাসান, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, তা.বি. পৃ. ২০৬; *শারহি ফাতহিল কাদীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৪; মালেকী, ইবন ফারহুন, *তাবছিরাতুল হুক্কাম*, মিশর : আল-মুতাকাদ্দিমুল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ২০৬; আল-হিজাজী, শরফুদ্দীন মূসা, *আল-ইকনা'*, মিসর : মিসরীয় প্রেস, তা.বি., ১ম সংস্করণ, খ. ২, পৃ. ২০৫

৮৬ *তাবসীরাতুল হুক্কাম ফীল উসূলিল আকদিয়াতি ওয়া মানাহিজুল আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪৫; *আল-ইকনা'*, খ. ২, পৃ. ২০৫; *শরহে ফাতহিল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১২

www.pathagar.com

৩. عرض ('ইরদ্)

মানহানির সংশ্লিষ্ট আরেকটি শব্দ হচ্ছে عرض ('ইরদ্)। অর্থ-সম্মান, মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, বংশমর্যাদা, খ্যাতি, যশ ইত্যাদি। ইরদ শব্দ দ্বারা সার্বিক সম্মানকেও বুঝায়। শব্দটি যদি জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে তখন এর অর্থ দাঁড়ায় সুখ্যাতি।[৮৭] হাদীসে এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন–

আবূ হুরাইরা রা. বলেন; রাসূল স. বলেছেন : "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর এক মুসলমানের সম্পদ, সম্মান ও রক্ত হারাম।"[৮৮]

আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূল স. আরো বলেছেন : "এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। সুতরাং কেউ কাউকে অপমানিত করবে না, অপদস্ত করবে না, অত্যাচার করবে না, তোমরা পরস্পর হিংসা করবে না, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাও। (কেননা) প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর এক মুসলমানের সম্পদ, সম্মান ও রক্ত হারাম। তোমরা একজনের প্রস্তাবের উপর অন্যজন প্রস্তাব দিবে না, একজনের উপর অন্যজন ব্যবসা করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে দেখেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তরের দিকে দেখেন। এরপর রাসূল স. বললেন : খোদাভীতি ঐখানে। একথা বলে তিনি তার বক্ষের দিকে তিনবার ইশারা করলেন।[৮৯]

অন্য এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরাইরা রা. বলেন, রাসূল স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি তার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের উপর জুলুম করবে এবং তার সম্মানের হানি ঘটাবে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তার এই অপমানের প্রতিশোধ দিবেন যে দিন কোন দিনার ও দিরহামের লেন-দেন থাকবে না। বরং সেদিন অত্যাচারীর নেকি থেকে নিয়ে ঐ জুলুম ও অপমানের প্রতিদান অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। আর যদি (অত্যাচারী) ব্যক্তির কোন নেকি না থাকে তাহলে অত্যাচারিত ব্যক্তির গোনাহগুলো অত্যাচারীর আমলনামায় দিয়ে দেয়া হবে।"[৯০]

---

৮৭ *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩০, পৃ. ৫০

৮৮. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, মিসর : দারুল ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি., খ. ১৩, পৃ. ২৫, হাদীস নং-৪২৩৮

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُّ المُسْلِمِ عَلى_المُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرّ أنْ يَحْقِرَ أخَاهُ المُسْلِمَ.

৮৯. বাইহাকী, ইমাম, *শু'আবুল ঈমান*, বৈরূত, দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২৩, পৃ. ৩২, হাদীস নং-১০৭০৩

عن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن أخو المؤمن لا يخذله ولا يظلمه لا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ، كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه ، لا يخطب امرؤ على خطبة أخيه ، ولا يبع على بيع أخيه ، وإن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ، التقوى ههنا ، وأشار إلى صدره .

৯০. বুখারী, *আস-সহীহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং-২২৬৯; খ. ৯, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং-২৪৭০।

www.pathagar.com

৪. همزة ও لمزة (হুমাযাহ ও লুমাযাহ)

همزة ও لمزة (হুমাযাহ ও লুমাযাহ) মানহানির সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টি শব্দ। শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থক। যদিও কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেছেন কিন্তু সার্বিক অর্থে শব্দ দু'টি কাউকে কটাক্ষ, নিন্দা, দোষারোপ, দুর্নাম, অসম্মান, লাঞ্ছিত, গীবত, ছিদ্রান্বেষণ, অপমানিত, হেয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অপমান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৯১]

এ শব্দটির ব্যবহার আল-কুরআনে পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

আল্লাহ্ তাআলার বাণী : "দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।"[৯২]

ইব্‌নে কাছীর র. বলেন : যে কথা দ্বারা মানুষকে অপমান ও তুচ্ছ করে সেটি হলো همزة (হুমাযাহ), আর যে কাজের দ্বারা মানুষকে অপমান করে তা হলো لمزة (লুমাযাহ)।[৯৩]

ইব্‌নে আব্বাস রা. বলেন : এ শব্দ দু'টি দ্বারা অপবাদ দেয়া ও পরনিন্দা করাকে বুঝানো হয়ে থাকে। রবী ইব্‌ন আনাস র. বলেন : সামনা-সামনি নিন্দা করাকে همزة (হুমাযাহ) আর আড়ালে নিন্দা করাকে لمزة (লুমাযাহ) বলে।[৯৪]

মুখ বা যবানের মাধ্যমে মানুষকে অপমান করাকে همزة (হুমাযাহ), আর হাত, চোখ, মুখ ও ইশারা দ্বারা অপমান, অপাদস্ত করাকে لمزة (লুমাযাহ) বলে।[৯৫]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন : "পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।"[৯৬]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন : এ আয়াত দ্বারা নিন্দাকারী ও চোগলখোরীকে বুঝানো হয়েছে।[৯৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

এছাড়া কিছু শব্দ পরিবর্তন বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থেও উক্ত বিষয়টি এসেছেঃ আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ২৮, হাদীস নং-৪২৪০; নাসাঈ, ইমাম, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ২৯৯, হাদীস নং-৪৬১১; ইব্‌ন মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৭১, হাদীস নং-২৪১৮

৯১. রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৬৯২ ও ৯১৭

৯২. আল-কুরআন, ১০৪ : ১ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

৯৩. *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৮১

৯৪. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৮১

৯৫. আত-তাবারী, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন কাছীর ইবনুল গালিবিল আমালী, *জামি'উল বয়ান ফী তা'বীলিল কুরআন*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭ হি. খ. ২৪, পৃ. ৫৯৫

৯৬. আল-কুরআন, ৬৮ : ১১ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

৯৭. *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১৯০

www.pathagar.com

৫. سخر (সাখরুন)

মানহানিকর শব্দাবলীর মধ্যে এটি একটি সংশ্লিষ্ট শব্দ। যার অর্থ ঠাট্টা করা, বিদ্রূপ করা, উপহাস করা, পরিহাস করা ইত্যাদি।[৯৮]

এ শব্দটির ব্যবহার আল-কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে পরস্পর পরস্পরকে ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও উপহাস করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন– হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তাওবা না করে তারাই জালিম।"[৯৯]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে উপহাস ও অপমান করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসের বর্ণনায় জানা যায়, রাসূল স. বলেছেন : সত্যকে উপেক্ষা করে চলা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করাই হলো অহংকার। মানুষকে উপহাস ও অবজ্ঞা করা হারাম। কারণ যাকে উপহাস করা হয়, আল্লাহর নিকট সে উপহাসকারী অপেক্ষা বেশি সম্মানিত ও প্রিয় হওয়া বিচিত্র নয়।"[১০০]

৬. استخفاف ও استهزاء (ইসতিখফাফ ও ইসতিহ্যা)

কাউকে ছোট বানানো, হেয় প্রতিপন্ন করা, অবজ্ঞা মনে করা, কারো মান ক্ষুণ্ন করাকেই ইসতেখফাফ বলে।[১০১]

কারো মান ক্ষুণ্ন বা হেয় করা, তা কথা-কর্ম ও বিশ্বাস অনেকভাবে হতে পারে। যেমন : ১. প্রত্যাশিত ২. নিষিদ্ধ

১. প্রত্যাশিত ইসতেখফাফ

প্রত্যাশিত ইসতিখফাফ হলো, কেউ কোন গর্হিত কাজ করলে তার নিন্দা করা। যেমন কোন মুসলমান কুফরী করলো, হারাম কাজে লিপ্ত হলো, বিদআত বা ফাসেকী কাজ করলো এমতাবস্থায় সেই কাজের জন্য তার নিন্দা করা নিষিদ্ধ নয় বরং প্রত্যাশিত ও নন্দিত।[১০২]

---

৯৮. *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০

৯৯. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

১০০. মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ,* বৈরূতঃ দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৪৭, হাদীস নং-১৩১
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

১০১. *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭ ও ৭৬

www.pathagar.com

২. নিষিদ্ধ ইসতিখফাফ

ক. মহান আল্লাহর অমর্যাদা : কোন কথা, কাজ উক্তি ও বিশ্বাস প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার মর্যাদ ক্ষুণ্ন করা হারাম। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন কোন কাজ মুসলমান করলে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : এবং আপনি তাদের প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয় বলবে আমরা আলাপ আলোচনা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলাম। বলুন, তোমরা কি মহান আল্লাহ্, তার নিদর্শন এবং রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে?"[১০৩]

খ. আম্বিয়াগণকে হেয় করা : কোন কথা কর্ম ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে নবীদের মর্যাদাহানি করা। যেমন নবীর কাল্পনিক চিত্র অংকন, মূর্তি তৈরী, গালি দেয়া, ভিত্তিহীন কোন দুষ্কর্মের জন্য দোষারোপ করা, কুরুচি ও অমর্যাদাকর কাহিনী কোন নবীর প্রতি সম্পৃক্ত করা, নবীর মর্যাদার পরিপন্থী কোন ক্ষেত্রে নবীর উক্তি ব্যবহার করা। মোটকথা, যেভাবেই হোক না কেন, যখন মুসলিম সমাজের বিশ্বাসের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয় এমন যে কোন কাজই নবীর মর্যাদাহানিকারী ব্যক্তি মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : যারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[১০৪]

অনুরূপভাবে কুরআন, ফিরিশ্তা, উম্মাহাতুল মুমিনীন, সাহাবা কিরাম সম্পর্কে কটূক্তি ও তাদের অমর্যাদাকর কোন কথা বলা বা কাজ করা ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যে কোনভাবেই হোক কোন ব্যক্তি উল্লিখিত ব্যক্তিদের অমর্যাদা ও মানহানি করলে সে তাযীরী শাস্তিযোগ্য হবে।[১০৫]

৭. ظن (যাননুন)

মানহানির সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি শব্দ হলো ظن (যাননুন)। এর শাব্দিক অর্থ- ধারণা, সংশয়, সন্দেহ, বস্তুত যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীত ইত্যাদি। এশব্দটি কখনো অপবাদ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১০৬]

এশব্দটির ব্যবহার আল-কুরআনে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কারো গোপন তথ্য খোঁজা এবং অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান নির্ভর ধারণা থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান

---

১০২. *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৪৮; *'ইলমুল 'ঈকাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; *আস-সিয়াসাতিল জীনাঈয়া ফিকরাতুহা ওয়া মাজাহিবুহা ওয়া তাখত্বীতুহা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১০৩. আল-কুরআন, ৯ : ৬৫

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ.

১০৪. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৭

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا.

১০৫. *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫০-২৫১

১০৬. *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩১

www.pathagar.com

নির্ভর ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"[১০৭]

ইব্‌নে নুজাইম র. বলেন : কুরআনুল কারীমে যে জায়গায় ظن (যাননুন) শব্দ প্রশংসনীয় ও সওয়াবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে যাননুন শব্দের অর্থ দৃঢ়, অনঢ়, অটল ধারণা। আর যে ক্ষেত্রে এ শব্দটি মন্দ, দূষণীয় ও আযাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে এর অর্থ হবে সংশয়, সন্দেহজনক ধারণা ইত্যাদি।[১০৮]

ظن (যাননুন)-এর প্রকার

অধিকাংশ ফকীহগণের মতে ظن (যাননুন) চার প্রকার : যথা ক. নিষিদ্ধ ধারণা, খ. নির্দেশিত ধারণা, গ. প্রশংসনীয় ধারণা ও ঘ. বৈধ ধারণা।

ক. নিষিদ্ধ ধারণা : আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ।

খ. নির্দেশিত ধারণা : আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা নির্দেশিত। কেননা রাসূল স. বলেছেন : তোমরা কেউ আল্লাহ্ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যুবরণ করো না।"[১০৯]

অনুরূপ যে মুসলমান সম্পর্কে সমাজে সুধারণা রয়েছে, সমাজে যিনি সুনাগরিক হিসেবে পরিচিত ও প্রমাণিত তার সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা নিষিদ্ধ ও সুধারণা পোষণ করা নির্দেশিত।

গ. প্রশংসিত ধারণা : প্রশংসিত ধারণার অর্থ হলো, সাধারণত সকল মুসলমান সম্পর্কে কোন মন্দ প্রমাণ না থাকলে সুধারণা পোষণ করা। আর নামায অজু ইত্যাদিতে সংশয় দেখা দিলে সেখানে ধারণার প্রাবল্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

ঘ. বৈধ ধারণা : বিচারের ক্ষেত্রে দু'জন ব্যক্তি কোন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষ্য দেয়ার দ্বারা যে বিশ্বাস জন্মে তাতে আস্থা স্থাপন করা বৈধ।[১১০]

ظن (যাননুন) বা ধারণা সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ধারণার দু'টি অবস্থা রয়েছে। যেমন–

১. মনের মধ্যে একটা ধারণা উঁকি দিলো, যার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই এবং এই ধারণার বিপরীতের চেয়ে এটি মোটেও অগ্রাধিকার পাবার মতো নয়। এমতাবস্থায় সৃষ্ট ধারণার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত দেয়া বা কাজ করা বৈধ

---

১০৭. আল-কুরআন, ৪৯ : ১২
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ.

১০৮. ইব্‌নে নুজাইম, *আল-আশবাহু ওয়ান নাজাইর*, বৈরূত : মাকতাবাতুত তাওফিকীয়্যাহ, তা.বি., পৃ. ৮১

১০৯. 'আব্দুর রায্যাক, *আল-মুসান্নাফ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ৫৭, হাদীস নং-৪৭৮১

১১০. রামলী, *নিহায়াতুল মুহতায*, হালবী : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৪২৯

www.pathagar.com

নয়। এটা আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যা উপরের আয়াতের মাধ্যমে ফুটে ওঠেছে।

এ সম্পর্কে রাসূল স. বলেছেন : "তোমরা অবশ্যই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অনুমান নির্ভর ধারণা থেকে বিরত থাকবে, কেননা অনুমান নির্ভর কথা জঘন্য মিথ্যা"।[১১১]

২. এমন ধারণা যা জ্ঞাত ও পরিচিত, যে ধারণাকে বলিষ্ঠ করার মত প্রমাণ থাকে, তবে এমন ধারণার ভিত্তিতে কাজ করা ও সিদ্ধান্ত নেয়া বৈধ। কেননা ধারণার প্রাবল্যের ভিত্তিতেই শরীয়তের অসংখ্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ইমাম নববী এবং খাত্তাবী র. বলেন : ধারণার ভিত্তিতে কোন কাজ করা যাবে না এর অর্থ হলো : ধারণাকে যাচাই করে নিতে হবে, যাতে সিদ্ধান্তের দ্বারা কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।[১১২]

রাসূল স. ধারণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরাইরা র. বলেন, রাসূল স. বলেছেন : তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা ধারণা হলো সবচেয়ে মিথ্যা বাণী।[১১৩]

ইমাম খাত্তাবী র. বলেন : উল্লেখিত হাদীসে ধারণা বলতে এমন ধারণাকে বুঝানো হয়েছে যে, যে ধারণা মানুষের ক্ষতি করে এবং যা মানুষের অন্তরের ভাল বিষয়গুলোকে পরিবর্তন করে দেয়। আর এ কারণে এমন এমন ভুল মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে যা পরবর্তীতে আর সংশোধনের সুযোগ থাকে না। ইমাম কুরতুবী র. বলেন : এ হাদীসে ধারণা দ্বারা মিথ্যা অপবাদকে বুঝানো হয়েছে যা ব্যক্তিকে অশ্লীলতার পর্যায়ে নিয়ে যায়।[১১৪]

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, যেভাবেই হোক না কেন ইসলামী আইনে কারো মানহানি করা বা মর্যাদাহানি ঘটানো কোনভাবেই সমীচীন নয় যা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। তাই ইসলামী আইনে যে কোন হারাম কাজের অপরাধের শাস্তি অনির্ধারিত তাযীরী দণ্ড। নিম্নে তা'যীরী দণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো :

---

১১১. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ,* প্রাগুক্ত, বাবু লা ইয়াখতুবু 'আলা খিতবাতি আখিহি, খ. ১৬, পৃ. ১১০, হাদীস নং-৪৭৪৭

عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

১১২. *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ,* প্রাগুক্ত, খ. ২৯, পৃ. ১৮১

১১৩. বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ,* বাবু মা নাহা 'আনিত তাহাদাসি, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৮, হাদীস নং-৫৬০৪; মুসলিম, ইমাম, *আস-সহীহ,* বাবু তাহরীমুয যান্নি ওয়াত তাযাস্সুস, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ৪২১, হাদীস নং-৪৬৪৬

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

১১৪. আল-'আসকালানী, ইব্‌ন হাযার, *ফাতহুল বারী,* বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩২৪ হি., খ. ১৭, পৃ. ২৩৭

www.pathagar.com

তা'যীর পরিচিতি

তা'যীর শব্দের আভিধানিক অর্থ : আরবী ভাষায় তা'যীর শব্দটি 'আল-আযরু' শব্দ থেকে উৎকলিত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ ফেরৎ দেয়া, নিষেধ করা, ছেড়ে দেয়া, সাহায্য করা ও সম্মান করা, ভর্ৎসনা, কষ্ট প্রদান ও শাস্তি অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১১৫] আর এ থেকেই আরবদের বাণী : فإذا نصرته فقد ردت اعداء "যখন আমি তাকে সাহায্য করি তখন তার শত্রুতাসমূহকে বন্ধ করে দেই।[১১৬]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে শক্তি যোগাও ও তাকে সম্মান কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"[১১৭]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "সুতরাং সে সকল লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহায্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নূরের অনুসরণ করেছে-যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধু তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।"[১১৮]

আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে জানা গেল যে, তা'যীর শব্দের অর্থ হলো-সাহায্য করা ও সম্মান প্রদর্শন।[১১৯]

তা'যীর শব্দের অর্থ আবার আদব কায়দা শিক্ষা দেয়াও হতে পারে। কেননা তা দ্বারা গুনাহ দ্বিতীয়বার করতে নিষেধ করে, কদাকার লেনদেন থেকে বারণ করে। তাই বলা হয় (عزرته) অর্থাৎ তাকে সম্মান শিক্ষা দিলাম, আর আদব কায়দা শিক্ষা দেয়ার অর্থে বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তা'যীরের পারিভাষিক অর্থ

ইব্‌নে হুমাম র. বলেন : তাযীর হলো অনির্ধারিত শাস্তি যা আল্লাহর কিংবা মানুষের অধিকার সম্পর্কীয় প্রত্যেক পাপের কারণে ওয়াজিব হয়।[১২০]

ইমাম যাইলায়ী র. বলেন : তাযীর হলো অনির্ধারিত শরীয়ী শাস্তি।[১২১] সুতরাং ন্যায়পরায়ণ মুসলিম শাসকের শরীয়তের বিধান মারফত অধিকার প্রাপ্ত অপরাধীকে

---

১১৫. *তাবসীরাতুল হুক্কাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. খ. ২, পৃ. ২১০

১১৬. আমের, ড. আব্দুল আযীয, *আল-তা'যীর ফীল শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, মিসর : মুস্তফা বাবী হালাভী ওয়া আওলাদুহ, ১৯৭৭, পৃ. ৩৭১

১১৭. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫ . وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

১১৮. আল-কুরআন, ৭ : ১৫৭

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

১১৯. আব্দুল করীম, ড. যায়িদ ইবন, *আল-আফউ আনিল 'উকূবাত ফীল ফিকহিল ইসলামী*, রিয়াদঃ দারুল আম্মা, ১৪০০ হি., পৃ. ২৮২

১২০. আশ-শাওকানী, ইব্‌ন হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, রিয়াদ : মাকতাবাতুত তাওফীকীয়্যাহ, ২০০১, খ. ৪, পৃ. ৪১২

১২১. আল-জাইলায়ী, ওসমান ইব্‌ন আলী, *তাবঈনুল হাকায়িক শরহুদ দাকায়িক*, মিসর : আল-আমীরিয়া প্রেস, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ২০৭

www.pathagar.com

অপরাধ ও নিষিদ্ধ কর্মের জন্য যে কোন প্রকারের শাস্তি প্রদানের এখতিয়ার রয়েছে। তবে ইনসাফ ও শরীয়তে বিধান লক্ষ রেখে শাস্তি দিতে হবে।[১২২]
আর তা'যীর অপরাধের শাস্তি হল এমন যা শরীয়ত সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করেনি বরং শাসকের নির্ধারণের বা চিন্তা গবেষণার প্রতি দায়িত্ব সোপর্দ করা হয়েছে, তবে সাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। যেমন : উপদেশ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন, আটক, জেল-হাজত, বেত্রাঘাত ইত্যাদি। যিনা ব্যতিরেকে অপরাধের জন্য, নিসাব ব্যতিরেকে চুরি ইত্যাদির জন্য এ ধরনের শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে।[১২৩]

তা'যীরের শ্রেণীবিন্যাস

শাস্তির দিক থেকে তা'যীর দু'প্রকার : এক. আল্লাহর হক (অধিকার) সম্পর্কে তা'যীরী শাস্তি প্রদান, দুই. ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে তা'যীরী শাস্তি।

এক. আল্লাহর হক (অধিকার) সম্পর্কে তা'যীরী শাস্তি : ইবাদত তরককারীর প্রতি তা'যীর যেমন : নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত তরককারীর শাস্তি, মদ্যপানের শাস্তি, রমযানে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগ করার শাস্তি। এখানে তা'যীর আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠার জন্য। কেননা এতে সমাজের সাধারণের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। কেননা প্রকৃত পক্ষে অপরাধের শাস্তি ব্যক্তির বিরুদ্ধে বর্তায় না।[১২৪]

দুই. ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে তা'যীরী শাস্তি : যেমন : কোন ব্যক্তি বিশেষকে গালি-গালাজ করা। যিনা ব্যতিরেকে অপবাদ দেয়া, মারধর দিয়ে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি। আল্লাহ ও বান্দার হকের মধ্যে সীমাবদ্ধতা নেই; বরং বান্দার হকের মধ্যেও আল্লাহর হক বিরাজমান, তেমনি যখনই আল্লাহর হক লংঘিত হয়, তখনই নিরপরাধ বান্দারও কষ্ট হয়। তাই একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। হুদূদ ও কিসাসের শাস্তি দেয়া হয় কিছু অপরাধের জন্য, আর অনেক অপরাধ অবশিষ্ট থাকে, যার কোন সুনিদিষ্ট শাস্তি নেই। তাই তাযীরী শাস্তির প্রয়োজন। এসকল অপরাধ যার কোন নির্ধারিত শাস্তি নেই, তা দু'প্রকার :

১. **এর উদাহরণের মধ্য থেকে :** অপরিচিতা মহিলাকে চুম্বন করা, যিনা ব্যতিরেকে অপবাদ দেয়া, বিনা হিফাজতের মাল চুরি করা, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, কাপড়ে ধোঁকা দেয়া, রক্ত খাওয়া, মৃত জানোয়ার ভক্ষণ করা, যিনার সাথে জড়িত কাজ

---

১২২. ওজদী, মুহাম্মদ ফরীদ, *কানজুল উলূম ওয়াল লুগাত*, মিসর : আল-ওয়াজেয, ১৯০৫, পৃ. ৬৬৮

১২৩. *তাবসীরাতুল হুক্কাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৬; *আল-ইকনা'*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৫; *কানজুল উলূম ওয়াল লুগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮

১২৪. আল-*ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ মিন ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; *মু'জামুল ক্বানূনিল জিনায়ী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯৪; *ফালসাফাতুল উকূবাতু ফীশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ক্বানূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

www.pathagar.com

কারবার করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, ঘুষ খাওয়া, আল্লাহর বিধান ছাড়া হুকুম দেয়া ইত্যাদি ধরনের বহু নিষিদ্ধ কাজসমূহ।[১২৫]

২. **ওয়াজিব তরক করা** : তার উদাহরণ : নামাজ বিলম্বে পড়া, ওয়াজিব হকসমূহ আদায় থেকে বিরত করা, শক্তি থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করা কিংবা আমানত ফেরতদান থেকে বিরত থাকা।[১২৬]

যে ব্যক্তি উল্লিখিত পাপসমূহ কিংবা অনুরূপ অপরাধসমূহ করে ফেলে তাকে তাযীর, কষ্ট প্রদান ও শিষ্টাচারের তালীমের এ পরিমাণ শাস্তি প্রদান করা যাবে যা শাসক ঐ অপরাধের জন্য উপযুক্ত মনে করেন। তার গুরুত্ব হিসেবে যা অপরাধী বিবাদী ও বাদীর জন্য শ্রেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি পাপাচারে ডুবে থাকে তার শাস্তি এবং যে প্রথম বার পাপ করে তার শাস্তি এক নয়, যদিও পাপ একই সমান হয়ে থাকে এবং যে ব্যক্তি অন্যের মহিলাদের ও সন্তানদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় আর যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী সন্তানের স্বাভাবিক জীবনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে উভয় সমান নয়।[১২৭]

তাযীরী শাস্তির পরিমাণ

তা'যীরী শাস্তির নিম্নতম কোন নির্ধারিত পরিমাণ নেই। কষ্ট অনুভূত হয় সে পরিমাণ শাস্তি দেয়া বৈধ হবে, তা মারপিট দিয়ে হোক কিংবা হাজতে রেখে হোক কিংবা হুমকি দিয়ে হোক।[১২৮] আল্লাহ তাআলার বাণী : তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকে যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। এমনকি পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নিকট তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠেছিল। আর তারা নিশ্চিত বুঝেছিল যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই তার দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত। পরে তিনি তাদের তাওবা কবুল করলেন, যাতে তারা তাওবায়

---

১২৫. আল-কাছানী, আল্লামা আবূ বকর ইবন মাসউদ আল-হানাফী, *বাদায়ি ওয়াস-ছানায়ি ফী তারতীবিশ শারায়ি*, বৈরূত : দারুল কিতাবুল আরাবী, ১৪০২ হি. খ. ৭, পৃ. ৩৩-৬৭ ও ৩৩৩; *ফালসাফাতুল উকূবাতু ফীশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ক্বানূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; আল-মিকদাসী, আবূ আব্দুল্লাহ ইবন কুদামা, *আল-মুগনী*, রিয়াদ : রিয়াদ লাইব্রেরী, ১৪০১ হি. খ. ৭, পৃ. ১৩৫

১২৬. *মু'জামুল ক্বানুনিল জিনায়ী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯৪; *আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ মিন ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯; *ফালসাফাতুল উকূবাতু ফীশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ক্বানূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১২৭. *আত-তাশরীউল জিনাঈ ফীল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৭৪; *আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ মিন ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯; আল-শারবিযীনী, আল-খতীব, *মুগনী আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনী আলফাজুল মিনহাজ*, বৈরূত : দারুল ফিকর, খ. ৪, পৃ. ১২৯; *মু'জামুল ক্বানূনিল জিনায়ী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫২; *ফালসসাফাতুল উকূবাতু ফীশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ক্বানূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১২৮. *ফতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪৬; *মুগনী আল-মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি মা'আনী আলফাজুল মিনহাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৩; মুহাম্মদ আরাফা আল-দুছুয়ুকী, *হাশিয়া আল-দাছুকী*, বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িল কুতুবিল আরাবীয়াহ, ১৩৭৭ হি., খ. ৪, পৃ. ৪৫৭

www.pathagar.com

স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[১২৯] রাসূল স. এদের বয়কট করেছিলেন। তেমনিভাবে বয়কট বা শয্যাত্যাগও এক প্রকারের তা'যীরী শাস্তি, যেমন ঝগড়াকারী মহিলা থেকে বয়কট করা।[১৩০]

তাযীরী শাস্তি বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত

অপরাধী জ্ঞানবান ও বুদ্ধি সম্পন্ন হলেই তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে, তার বালেগ হওয়া শর্ত নয় এবং সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন এবং যে লিঙ্গেরই হোক না কেন।[১৩১] অবশ্য নাবালেগকে প্রদত্ত শাস্তি শাস্তি হিসেবে গণ্য না হয়ে প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য হবে। তাকে ভদ্র, সভ্য, অধ্যবসায়ী, কর্মঠ, নিয়মানুবর্তী ও ধর্মানুরাগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার উপর তা'যীর কার্যকর হবে। যেমন আমর ইব্‌নে শুআইব র. সূত্রে তাঁর পিতা ও তাঁর পিতা তাঁর দাদার সূত্রে বলেন; রাসূল স. বলেছেন : তোমাদের সন্তানগণ সাত বছরে পদার্পণ করতেই তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও। তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করলে নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার কর।[১৩২]

তা'যীরী শাস্তির সীমা

অপরাধ যদি হদ্দের আওতাভুক্ত না হয় যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে বলল : তুমি পাপাচারী, চোর, মদখোর ইত্যাদি, তবে এসব ক্ষেত্রে বিচারক অপরাধের তারতম্য অনুযায়ী তিরস্কার, বেত্রাঘাত, কয়েদ ইত্যাদি যে কোন শাস্তি নির্ধারণ করতে পারেন। উমর রা. যে উবাদা ইবনু সামিত রা.-কে আহমক বলেছিলেন তা তা'যীরের আওতায় তিরস্কার অর্থেই বলেছিলেন, তাঁকে অপমান বা খাটো করার উদ্দেশ্যে বলেননি। আর তা'যীরের পরিমাণ হদ্দের পরিমাণের চেয়ে কম হতে হবে।[১৩৩] এ ব্যাপারে ফকীহগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[১৩৪]

---

১২৯. আল-কুরআন, ৯ : ১১৮

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

১৩০. ইব্‌ন তাইমিয়া, *আস-সিয়াসাতুশ শারি'ইয়্যাহ ফী ইসলাহির রা'য়ী ওয়ার রা'য়ীয়া*, মিসর : দারুল কুতুবিল আরবী, ১৯৬৯ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ১১১; আল-বাহূতী মানছুর ইব্‌ন ইউনুছ, *কাশ্‌শাফ আল-কুনাআ ফী মাতনিল ইকনা*, বৈরূত : আলামুল কুতুব, ১৪০৩ হি., খ. ৬, পৃ. ১২৫

১৩১. *আল-বাদায়ি ওয়াস সানায়ি*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৩

১৩২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৮, হাদীস নং-৪১৮

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

১৩৩. *মু'জামুল ক্বানূনিল জিনায়ী*, মিসর : আন-নুহজাতুল আরাবীয়াহ প্রেস, ১৯৫৭ খ্রি., খ. ২, পৃ. ২৫৪; *ফালসসাফাতুল 'উকূবাতু ফীশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ক্বানূন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; *আল-হুদূদ ফীশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, পৃ. ২৫৮; *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৮৫৪

১৩৪. এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : لا خلاف بين أصحابنا رضي الله عنهم أنه لا يبلغ التعزير الحد ؛ لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين } إلا أن أبا يوسف رحمه الله صرف الحد المذكور في الحديث على الأحرار .

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. বলেছেন : "যে ব্যক্তি হদ্দ বহির্ভূত অপরাধে হদ্দের সমান শাস্তি দিল সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

অবশ্য সার্বিক কল্যাণের দিক বিবেচনা করে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ হদ্দের পরিমাণের অধিক শাস্তিও দিতে পারেন।[১৩৫]

জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করে অপরাধীকে তা'যীরের আওতায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে। হানাফী ফিক্‌হে এর জন্য "রাজনৈতিক হত্যা" পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। বিচারক যদি মনে করেন যে, অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া ব্যতীত সামাজিক নিরাপত্তা ও শাসন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় তবে সেই ক্ষেত্রে তিনি অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দিতে পারেন। যেমন কোন ব্যক্তি বার বার ডাকাতি, মদ পান ও মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়।[১৩৬]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, সালামা ইব্‌নুল আকওয়া রা. বলেন, রসূল স. সফরে থাকাকালে তাঁর নিকট এক গুপ্তচর আসলো এবং তাঁর কোন এক সাহাবীর নিকট বসে কথাবার্তা বলল, অতঃপর কেটে পড়ল। মহানবী স. বললেন : তোমরা তার অনুসন্ধান করে তাকে হত্যা কর। (রাবী বলেন) আমি তাদের সকলের আগে গিয়ে তাকে হত্যা করলাম এবং রাসূল স. গুপ্তচরের মালপত্র আমাকে প্রদান করেন।[১৩৭]

হদ্দ ও তা'যীর দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি

ইসলামী আইনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী হদ্দের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধীকে একই সাথে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া যায় না। কিন্তু জনস্বার্থ ও শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে একই সাথে উভয়বিধ শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে চার মাযহাবের রায়ই বিদ্যমান। ইমাম মালিক র.-এর মতে মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত হদ্দ ও কিসাসের আওতাভুক্ত অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে একই সাথে হদ্দ ও তা'যীরের শাস্তি প্রদান করা যায়।[১৩৮]

ইমাম শাফি'ঈ র.-এর মতেও উভয়বিধ শাস্তি একত্রে প্রদান করা যেতে পারে। যেক্ষেত্রে আইনত হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যায় না, যেমন পিতাপুত্রকে হত্যা

-*বাদায়ি'উস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারায়ি*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ১৪৭; *তাবয়ীনুল হাকায়িক ফী শারহি কানযুদ দাকায়িক*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০৮

১৩৫. আদ-দিমাশকী, মুহাম্মদ আমীন ইব্‌ন উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার*, দেওবন্দ : দারুল কুতুব, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ১৭৯

১৩৬. *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০০-২০১; *রাদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৯

১৩৭. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২৪৯, হাদীস নং-২২৮১
عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم انسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه.

১৩৮. *আল-তা'যীর ফীল শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

www.pathagar.com

করলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত না করে তার উপর দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হয়, সে ক্ষেত্রে দিয়াত আরোপের সাথে সাথে তাযীরের আওতায় শাস্তি প্রদান করা যায়। ইমাম শাফি'ঈর মতে, মদ্যপানের শাস্তি চল্লিশ বেত্রাঘাত, এর অতিরিক্ত বেত্রাঘাত করা হলে তা তা'যীর হিসেবে গণ্য।[১৩৯]

ইমাম আবূ হানীফা র.-এর মতে, অবিবাহিত যিনাকারীকে নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের অতিরিক্ত নির্বাসন দণ্ড প্রদান করা হলে শেষোক্ত দণ্ড তা'যীর হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর মতে মূল শাস্তির সাথে নির্বাসন দণ্ডও যুক্ত হতে পারে।[১৪০]

যে সব কারণে তা'যীরী শাস্তি রহিত হয়

তিন কারণে তা'যীরী শাস্তি রহিত হয়ে যায়। যেমন : **এক.** অপরাধীর মৃত্যু, **দুই.** বাদী কর্তৃক অপরাধীকে ক্ষমা ঘোষণা, **তিন.** অপরাধীর তাওবাহ্।

এক. অপরাধীর মৃত্যু

যদি অপরাধীকে দৈহিক শাস্তি দেয়া হয় অথবা যা তার জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন : প্রহার, দেশান্তর, গৃহবন্দি, নজরবন্দি ইত্যাদি যা তার অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট মৃত্যুজনিত কারণে তা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু আর্থিক শাস্তি যেমন জরিমানা, ভর্তুকি ইত্যাদির ক্ষেত্রে অপরাধীর জীবদ্দশায় দণ্ড ঘোষিত হলে মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তা কার্যকর হবে। তখন এ দণ্ড তার জীবদ্দশার ঋণের সাথে তুলনা করা হবে, যা মৃত্যুর পরও পরিশোধযোগ্য।[১৪১]

দুই. ক্ষমা

হক্কুল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট অপরাধের তা'যীরী শাস্তি বিচারকের ক্ষমা করার মাধ্যমে রহিত করা বৈধ। এ সম্পর্কে রাসূল স. বলেছেন : "যদি কোন ব্যক্তি কোন লঘু অপরাধ করে তবে তাকে ক্ষমা করে দিও। কিন্তু হদ্দ ও কিসাসযোগ্য অপরাধ হলে ক্ষমা করা যাবে না।"[১৪২]

কোন কোন ফকীহ্ বলেন : আল্লাহর অধিকার সংশ্লিষ্ট তা'যীরী দণ্ড হলেও তা ক্ষমা করা বৈধ নয়। যেমন : নামায ত্যাগে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা যায় না। অনুরূপ কোন সাহাবীকে যদি কেউ অপমান করে, শাসকের কর্তব্য এ অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া। তদ্রূপ যেসব তা'যীরী দণ্ড হদ্দ এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু শর্ত পূরণ না করার কারণে তাতে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, সে ক্ষেত্রে অবশ্য তা'যীরী শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু অপরাধ যদি বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট হয় তবে সেক্ষেত্রে অধিকাংশ ফকীহর মত হল, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিচার দাবি করলে বিচারকের ক্ষমা করার অধিকার থাকবে না। যে ক্ষমার মধ্যে গণস্বার্থ জড়িত সেক্ষেত্রে বিচারকের ক্ষমা বৈধ। অপরাধ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সাথে সংশ্লিষ্ট হলে, ক্ষতিগ্রস্ত

---

১৩৯. *ফালসাফাতুত তারীখুল 'ঈকাবী*, মিসর : সমসাময়িক মিসরীয় জার্ণাল, জানুয়ারী, ১৯৬৯, সংখ্যা-২৫৫, পৃ. ২৫৫

১৪০. *বাদায়ি ওয়াস সানায়ি*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৯

১৪১. *মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ২৩৬

১৪২. *মাজমা'উয যাওয়ায়িদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৩১

www.pathagar.com

পক্ষ বিচার দাবি করলে বিচার নিশ্চিত করা শাসকের কর্তব্য। মোটকথা হলো, শাস্তি প্রয়োগে জনস্বার্থ সংরক্ষিত হলে বিচারক শাস্তি প্রয়োগ করবেন।[১৪৩]

তিন. অপরাধীর তাওবা

অপরাধীর তাওবার কারণে তা'যীরী শাস্তি রহিত হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলী মাযহাবের কিছুসংখ্যক ফকীহর মত হল, তাওবা করলেও অপরাধীর শাস্তি রহিত হবে না। কারণ শাস্তি হলো অপরাধের কাফ্ফারা। তবে তারা বলেন : তাওবার কার্যকারিতা শুধু আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বান্দাহর অধিকার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নয়। কেননা এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন, "যারা কুফরী করে তাদেরকে বল, যদি তারা বিরত হয় তবে যা অতীতে হয়েছে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে।"[১৪৪]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূল স. বলেছেন : "গোনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি নিরপরাধীর মতো।"[১৪৫]

ইসলামী আইনে কোন জনগোষ্ঠী বা দলকে অপবাদের মাধ্যমে মানহানির শাস্তি

কোন ব্যক্তি যদি একটি দলকে অপবাদ প্রদান করে তার শাস্তির বিধান নিয়ে ইসলামী আইনবিদদের একাধিক অভিমত পাওয়া যায়–

১. ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ র.-এর নিকট দলকে অপবাদ দানকারীর একটি শাস্তিই হবে। আর তা হলো আশি বেত্রাঘাত।
২. পক্ষান্তরে ইমাম শাফে'ঈ ও লাইছ ইব্ন সায়াদ র.-এর নিকট দলের প্রতিটি ব্যক্তির অপবাদের জন্য জনপ্রতি শাস্তি প্রাপ্ত হবে।
৩. অপরদিকে ইবনে আবী লাইলা ও শা'বী র. সবাইকে এক বাক্যের মধ্যে একত্র করা ও পৃথক পৃথক ব্যক্তির জন্য পৃথক শব্দ ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁরা বলেন, যদি বলে, হে ব্যভিচারীগণ! অথবা প্রত্যেককে বলে, হে ব্যভিচারী! প্রথমোক্ত বাক্যের জন্য একটি শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আর দ্বিতীয়োক্ত বাক্যের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক শাস্তি বর্তাবে।[১৪৬]

ভিন্নমতলম্বীগণ কুরআনের আয়াতের বহুবচনের শব্দ দ্বারা দলীল পেশ করে বলেছেন, প্রতিটি অপবাদের জন্য পৃথক পৃথক শাস্তি দিতে হবে। তবে এখানে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, পরবর্তীতে তারা তাদের মত প্রত্যাহার করেছেন। আর জমহুরের মতের সাথে ঐকমত পোষণ করেছেন। ভিন্নমতাবলম্বীগণের কিয়াস সম্পর্কে বক্তব্য হল, বান্দার হক ও আল্লাহ্র হকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু অপবাদের শাস্তি বান্দার

---

১৪৩. *মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ২৭৪
১৪৪. আল-কুরআন, ৮ : ৩৮
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ.
১৪৫. ইব্ন মাজাহ, ইমাম, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৮৪, হাদীস নং-৩৪৬০
১৪৬. আর-রাযী, আবূ বকর, *আহকামুল কুরআন*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ১৫৩

www.pathagar.com

হক, যা একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এ মতের উত্তরে বলা হয়েছে, অপবাদের শাস্তি বান্দার হক যা একটি অপরটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না, একথা ঠিক নয়। যেমন : চুরি ও মদ্যপায়িতার শাস্তিও বান্দার হক, তেমনি আল্লাহরও হক যা উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং চুরি ও মদ্যপান বান্দার হক বিধায় তাদের উপর কিয়াস করা বৈধ হয়েছে।[১৪৭]

মানহানি আইন সম্পর্কে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যকার পার্থক্য

মানহানি তথা কারো বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার শাস্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। এ সংক্রান্ত পাশ্চাত্য ও ইসলামী আইনের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন খ্যাতিমান মুসলিম পণ্ডিত আব্দুল কাদির আওদাহ র.। অনেক ক্ষেত্রেই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় মুশকিল হয়ে পড়ে এবং মিথ্যা ও সত্যের পার্থক্য না করে উভয় পক্ষকেই শাস্তি দেয়া হয়। মিথ্যাবাদীকে মিথ্যা থেকে নিবৃত্ত এবং সত্যবাদীকে সত্য বলার জন্যে উৎসাহিত করার উপাদান এসব আইনে নেই। ক্ষেত্র বিশেষে সত্যবাদী শাস্তি পায় এবং মিথ্যাবাদী পুরস্কৃত হয়। ফলে জনগণের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ থাকে না, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে না আর মিথ্যার প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে যায়। ফলে সমাজে গুণীজনের কদর কমে যায় এবং দুষ্টের প্রতি নিন্দাবোধ হ্রাস পায়।[১৪৮]

মানহানি শাস্তির দর্শন

আইন গবেষকবৃন্দ শাস্তির দর্শন হিসেবে কতিপয় মৌলিক বিষয় দাঁড় করিয়েছেন। তা হলো অপরাধগুলোর দ্বারসমূহ রুদ্ধ করা, এ থেকে প্রতিরোধ করা, অপরাধ থেকে হুমকি-ধমকি দিয়ে বিরত রাখা, অপরাধসমূহের উপর পর্দা দেয়া ও গোপন করে রাখা। অপরাধের কাফ্ফারা ও ক্ষমা হওয়া, নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করা। যে কোন শাস্তিই আরোপ করা হোক এর লক্ষ হল, মানুষের কল্যাণ, চিকিৎসা, অপরাধ থেকে বিরত রাখা ও অপরাধীকে অপরাধ করা থেকে ফিরিয়ে রাখা। অপরাধীর অভ্যাসকে তার শিকড় থেকে মূলোৎপাটন করা, অপরাধীকে অপরাধ থেকে সংশোধন করা, বান্দাদের প্রতি করুণা করা, সর্বোপরি তাদের জন্য বরকত বয়ে আনা, পরকালে ক্ষমা ও ভাগ্যবান হওয়া ইত্যাদি। এ পর্যায়ে মানহানির শাস্তির দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে-

---

১৪৭. *রদ্দুর মুহতার আলা দুররিল মুখতার*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৪৩; আল-কাররাফী, শিহাবুদ্দীন, *তানকীহুল ফসূল ফিল উসূল*, মিসর : মনীরীয়াহ প্রেস, ১৩০৬ হি., পৃ. ১৬৯-১৭০

১৪৮. *আত-তাশরীউল জিনাঈ ফীল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪০৭; আবূ জোহরা, অধ্যাপক মুহাম্মদ, *ফালসাফাতুল উকূবাহ ফীল ফিকহিল ইসলামী*, মিসর : আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, তা.বি., খ. ২, পৃ. ১৭১; মাদকুর, মুহাম্মদ 'আব্দুস সালাম, *মাদখালুল ফিকহিল ইসলামী*, বৈরূত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, তা.বি., পৃ. ২৩৬

www.pathagar.com

১. **অশ্লীলতার প্রসারতা বন্ধ করা :** ইসলামী তথা মানবসমাজে মানহানির প্রসার ঘটায় ও সমাজের অনিষ্টতা ডেকে আনে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : "নিশ্চয় যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার ঘটাতে পছন্দ করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। যা আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন তোমরা নও।"[১৪৯]

২. **সতীসাধ্বী নারীদের অপবাদ দেয়া থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা :** অশ্লীলতার মিথ্যা অপবাদ ও অনর্থক বদনাম দ্বারা সতীসাধ্বী ব্যক্তিত্বের অনিষ্টতা ঘটে, যাতে লিপ্ত হওয়া নেহায়েতই জুলুম। সুতরাং তাদের শ্রুতিকে এমন নির্দেশ দ্বারা হিফাজত করা যা অনিষ্ট ও খারাপ বাক্যাচারকে চিরতরে নস্যাৎ করে দেয়।[১৫০]

৩. **ব্যক্তিত্বের অধঃপতন থেকে রক্ষা করা :** নিশ্চয় অপবাদ মানুষের মর্যাদাকে হানি করে। মানুষের মানহানি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, একজন সৎ মানুষ সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যায়। সুতরাং এজন্যই ইসলাম অপবাদের শাস্তির গুরুত্ব দিয়েছে, যাতে মানুষেরা এ ধরনের হীনতা থেকে প্রত্যাবর্তন করে।[১৫১]

৪. **ইজ্জত সংরক্ষণ করা :** বদনামীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। আর অপবাদ দানকারীও শাস্তি দ্বারা মানুষের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে ইজ্জত আবরুর জীবন নিয়ে সে বসবাস করতে পারে না। এজন্য তার উপর একথা সত্য বলে প্রযোজ্য : ممات العزة خير من حياة الذلة "ইজ্জতের মৃত্যু, জিল্লতের জীবন থেকে উত্তম।"[১৫২]

৫. **সন্দেহ থেকে মুক্ত রাখা :** নিশ্চয় মানুষেরা অপবাদদানকারী ও অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে সন্দেহের ও সংকোচের মধ্যে নিপতিত হয়। তাদেরকে লোকেরা বিশ্বাস করতে পারে না, বরং তাদের দিকে মানুষ সন্দেহ ও শঙ্কার চোখে দেখে।

৬. **সতীত্ব ও সততা অক্ষুন্ন রাখা :** নিশ্চয় অপবাদ সততা ভেঙ্গে ফেলে। আর সমাজের চোখে তিরস্কারের বস্তুতে পরিণত হয়। সমাজের কোন সদস্যই তাকে বিশ্বাস করে না। বরং তার বন্ধুবান্ধব ও সাথীদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়ে পড়ে।[১৫৩]

---

১৪৯. আল-কুরআন, ২৪ : ১৯
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

১৫০. সা'ঈদ হাওয়া, *আল-ইসলাম*, কুয়েত : দারুল কলম, ১৯৬৬, পৃ. ৬১৯; *আল-উকূবাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

১৫১. ছাবূনী, মুহাম্মদ আলী, *রাওয়ায়িউল বায়ান*, রিয়াদ : মুয়াআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪১১ হি., ২খ., পৃ. ৭৫

১৫২. সাইয়্যেদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, রিয়াদ : আল-আবীকান কোম্পানী, খ. ২, পৃ. ৩৭২

১৫৩. *ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

www.pathagar.com

৭. **স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরা থেকে রক্ষা করা :** নিশ্চয় অপবাদ স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার মধুর বন্ধন ও সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। একে অন্যের উপর নির্ভর করতে পারে না, বরং তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও বিচ্ছেদের জন্ম দেয়। এভাবেই স্বামী স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়-যা একান্তভাবে পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ।[১৫৪]

৮. **সন্তানদের সম্মান নষ্ট না হওয়া :** নিশ্চয় অপবাদ ইজ্জত সম্মানকে নষ্ট করে দেয়, এমনকি তা সন্তানদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। তারা তাদের অপবাদপ্রাপ্ত পিতাকে সম্মান করে না, এভাবে তাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এমনকি তাদের মধ্যে শক্ত বন্ধন বিনষ্ট হয়। পিতার কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়।[১৫৫]

৯. **অশ্লীলতা থেকে মুক্তি দেয়া :** নিশ্চয় অপবাদ খারাপ ও অশোভন উক্তি দ্বারা অশ্লীলতার দিকে আহবান করে। অপরদিকে মানব চরিত্র কর্দমাক্ত করে তোলে, আর মানবতার মানহানি করে। পক্ষান্তরে এর শাস্তি বাস্তবায়ন দ্বারা অপবিত্র অশ্লীলতা থেকে লোকেরা সংরক্ষিত থাকে। আর এতেই রয়েছে জাগতিক সাফল্য ও পরকালের মুক্তি।[১৫৬]

১০. **ইসলামী সমাজ নির্মাণ করা :** আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য হলো একটা আদর্শ সমাজ নির্মাণ করা, যাতে সমাজের মানুষ কলুষতা থেকে, অশোভন উক্তি থেকে এবং অশ্লীল বাক্যাচার থেকে রক্ষা পেতে পারে।[১৫৭]

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সার্বিক বিচারে গর্হিত আচরণের ফলও গর্হিত হয়। ফলে এ দ্বারা স্বভাবতই পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছেয়ে যায়, আর চরিত্র কলঙ্কিত হয়ে পড়ে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক অপবাদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা যথাযথই হয়েছে। আল্লাহ্ অপবাদের আক্রমণ থেকে ইজ্জত রক্ষার্থে, অশোভন উক্তি থেকে মর্যাদার হেফাজত করতে কঠিন শাস্তি যেমন, বেত্রাঘাত, সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান, ফাসিক আখ্যা দেয়া নির্ধারণ করেছেন, যাতে অপবাদের অপরাধ সংঘটিত না হয়। হাদীসে মানুষের সম্মানহানি করাকে জঘন্যতম সুদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কাজেই কোন ভাবে আমাদের দ্বারা কারো মানহানিকর কোন কাজ যেন সংঘটিত না হয় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

---

১৫৪. *রাওয়ায়িউল বায়ান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৬

১৫৫. *আছরুত তত্‌বীকিল হুদূদ ফিল মুজতামা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৫৭. *আল-উকুবাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯; আল-আলিম, ড. ইউসূফ হামিদ, *আল-মাকাছিদুল 'আম্মাতু ফীশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, বৈরূত : দারু ত্বয়্যিবাহ, ১৯৯৯, পৃ. ৪৪৯

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৭, সংখ্যা-২৮
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১১

ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

আবুল মোকাররম মোঃ বোরহান উদ্দিন*
মোঃ একরামুল হক**

[সারসংক্ষেপ: এই পৃথিবীতে পারিবারিক বন্ধন, বংশ বৃদ্ধির ক্রমধারা অব্যাহত রাখা, মানবীয় গুণাবলীর সম্মিলন ঘটানো, সর্বোপরি জীবনকে সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ রূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অংশীদারিত্ব রয়েছে। নর-নারীর মাধ্যমে যে মানব সভ্যতার সূচনা, তা আজ প্রায় সাড়ে সাত শত কোটিতে রূপান্তরিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে নারী পরিবার, সমাজ, দেশ কিংবা আন্ত-রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মানব সূচনার শুরু থেকে 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত' অতিক্রান্ত হয়ে অদ্যাবধি নারীর ভূমিকা আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে ব্যাপক ভাবে। অতি সাম্প্রতিকালে দেশীয় পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকারের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে। পাশাপাশি বিশ্ব ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। নারীর এই অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করাই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।]

মানুষ হিসেবে নারীর অধিকার

প্রথম মানব আদম আ. সৃষ্টি অতপর পৃথিবীতে মানুষের পদচারণা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। মানুষের সৃষ্টিগত রহস্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন– "হে মানব! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও"।[১] পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পর্যালোচনা করলে বেরিয়ে আসে যে, সৃষ্টিগত দিক থেকে মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষ সমমর্যাদা সম্পন্ন। কাজেই সৃষ্টিগত দিক থেকে নারীর অধিকার স্বীকৃত। এছাড়াও নারীর সৃষ্টিগত অধিকার তুলে ধরে মহান আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলেন– "হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত পুরুষ-নারী"।[২]

---

* সহকারি অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঘিওর সরকারি কলেজ, মানিকগঞ্জ
** সহকারি অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সরকারি শহীদ আসাদ কলেজ, নরসিংদী

১. আল-কুরআন, ৪৯:১৩ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ

২. আল-কুরআন, ৪:১
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

www.pathagar.com

নারীর অধিকার ও মর্যাদা

পবিত্র কুরআনে নারী-পুরুষকে সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানবিক মর্যাদা থেকে শুরু করে অপরাধ দণ্ডবিধি পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে উভয়কে সমান দৃষ্টিতে দেখেছে ইসলাম। মহান আল্লাহ্ নারী-পুরুষের মধ্যে সীমিত পর্যায়ে কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। তবে তাও করা হয়েছে ন্যায্যতার ভিত্তিতে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এই সাম্যের বিরোধিতা নি:সন্দেহে আল্লাহর দেয়া শরীয়তের প্রকাশ্যে বিরোধিতার সামিল। "শান্তি-সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্তা ও নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ লাভই হচ্ছে মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মানব মনের ঐকান্তিক কামনা ও বাসনার দিক থেকে সব মানুষই সমান। উঁচু-নীচু, ছোট-বড়, গরীব-ধনী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামবাসী-শহরবাসী এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে এদিক থেকে কোন পার্থক্য নেই"।[৩] নারী পুরুষের সমতা কর্মের কিংবা জান্নাত-জাহান্নাম লাভের দিক দিয়ে। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ বলেন- "পুরুষ হোক বা নারী যে-ই নেক কাজ করবে যদি সে মুমিন হয়, তাহলে তারা অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না"।[৪] এ ছাড়াও তিনি বলেন- "পুরুষ বা নারী যেই নেক কাজ করে সে যদি মুমিন হয় তাহলে তাকে এ দুনিয়াতে সম্মানের সাথে জীবন যাপন করাবো এবং আখিরাতে তাদের কৃতকর্মের উত্তম-পুরস্কার দান করবো"।[৫] মহান আল্লাহ আরো বলেন, "তোমরা তোমাদের সার্মথ্যনুযায়ী যে স্থানে বাস কর, তাদেরকেও সে স্থানে বাস করতে দাও, আর তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্যক্ত করো না"।[৬]

নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার

ইসলামী জীবন দর্শনে নারীকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ধর্ম গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সম্পদ অর্জনের ব্যাপারেও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ইসলামে বিদ্যমান। নারীর ইসলাম গ্রহণ করার বা না করার এখতিয়ারের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী- "আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নুহ্ ও লুতের স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করেছেন। তারা ছিল আমার দুই নেক বান্দার স্ত্রী, কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল, তাই আল্লাহর শাস্তি থেকে নুহ্ ও লুত তাদেরকে রক্ষা করতে পারেননি, তাদেরকে বলা হয়েছে দোযখবাসীদের সাথে তোমরা জাহান্নামেই প্রবেশ কর। এমনিভাবে আল্লাহ মুমিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেছেন,

---

৩. রহীম, মওলানা, মুহাম্মাদ আবদুর, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৮৩ পৃ. ৩৪

৪. আল-কুরআন, ৪:১২৪

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً

৫. আল-কুরআন, ১৬:৯৭

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

৬. আল-কুরআন, ৬৫:০৬

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

www.pathagar.com

সে প্রার্থনা করেছিল: হে আল্লাহ। তোমার জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করে দাও এবং ফেরাউন এবং তার পাপাচার ও দুষ্কৃতি থেকে আমাকে রক্ষা কর, সাথে সাথে জালিম সম্প্রদায়ের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর"।[৭] তাছাড়াও নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা তুলে ধরে আদর্শ ও অনুসরণীয় চরিত্র হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। অনুপম চরিত্রের অধিকারী মরিয়ম আ: ছিলেন পবিত্র ও সতী-সাধ্বী নারী। আল্লাহভীরুতার জ্বলন্ত প্রতীক। মহান আল্লাহ বলেন- "আল্লাহ এমনিভাবে ইমরান-তনয়া মরিয়মের একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। সে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে নিজ পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দিলাম এবং সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তার কিতাবসমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে অনুগত ও বিনয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল"।[৮]

নারীর পারিবারিক মর্যাদা ও অধিকার

পরিবার একটি ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান,স্বামী-স্ত্রী, যা মা-বাবা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা নিয়ে গঠিত হয়। নিম্নে নারীর পারিবারিক মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক) নারী-পুরুষের জন্য পরিবার হলো একটি শান্তির আবাস। এটি পারস্পরিক সহমর্মিতা, ভালবাসা মায়া-মমতা বিশেষ করে দৈহিক মিলনে পরিতৃপ্তির ও প্রশান্তি লাভের মুখ্য স্থান। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটি একটি যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জীবন সঙ্গীনিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের সাহচর্যে পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পার। সে জন্যই তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মমতা দান করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে"।[৯]

খ) পারিবারিকভাবে নর-নারী উভয় উভয়ের জন্য শান্তির ঠিকানা। সূরা আ'রাফের ১৮১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত মুফাচ্ছির ইবনুল আরাবী বলেন, "পুরুষের জন্য স্ত্রীরা বস্ত্র স্বরূপ, একজন অপরজনের নিকট খুব সহজেই মিলিত হতে, তার সাহায্যে নিজের লজ্জা ঢাকতে, শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে"। পারস্পরিক ভালবাসা ও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমান অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে সুখানুভূতি লাভ করে এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে

---

[৭]. আল-কুরআন, ৬৬:১০-১১
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ {١٠} وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {١١}

[৮]. আল-কুরআন, ৬৬:১২
وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

[৯]. আল-কুরআন, ৩০:২১
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

www.pathagar.com

সমান ভাবে মান-মর্যাদার সাথে বসবাস করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন- "নারীরা হচ্ছে পুরুষের পোশাক আর তোমরা পুরুষরা হচ্ছো নারীদের পোশাক।"[১০] এ আয়াত থেকে এটাই বুঝা যায়, নারীরা পুরুষের অংশ এতে কোন সন্দেহ নেই। সকল নারী পুরুষ আদম আ. থেকে সৃষ্টি, কাজেই সৃষ্টিগতভাবে কেউ কারো উপর প্রাধান্য দাবি করতে পারে না। এছাড়াও রসূলে করিম স. বলেন, "নারী সমাজ যে পুরুষদেরই অর্ধাংশ কিংবা সহোদর এতে কোন সন্দেহ নেই"।[১১]

গ) মা হিসেবে নারীর মর্যাদা ও অধিকারঃ মুসলিম পরিবারে মা একজন অন্যতম সদস্য। যার দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত থাকে স্বামী ও সন্তানগণ। ইসলাম মা হিসাবে নারীকে যে উঁচু মর্যাদা দিয়েছে দুনিয়ার অপর কোন সম্মানের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। রসূল স. ঘোষণা করেন- "সন্তানের জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে"।[১২]

মাকে সম্মান করার কথা প্রতিটি ধর্মেই আছে। কিন্তু ইসলাম যে মর্যাদা এবং অধিকার দিয়েছে তা অন্য কোন ধর্মে নেই। রসূল স.-এর বাণী– "একদিন এক ব্যক্তি রসূল স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, সন্তানের কাছে মা-বাবার কি প্রাপ্য রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, মা-বাবা তোমার বেহেশত অথবা দোযখ"। অন্য হাদিসে আছে, "এক ব্যক্তি রসূল স.-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমি কার সাথে সর্বাধিক ভাল ব্যবহার করবো? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। লোকটি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কার সাথে? তিনি তৃতীয়বার উত্তরে বললেন, তোমার মায়ের সাথে। লোকটি আবার ঐ কথা জিজ্ঞেস করলেন, তিনি উত্তরে বললেন, তোমার বাবার সাথে। অতঃপর ক্রমাগত নিকট আত্মীয়দের সাথে"।[১৩] উপরোক্ত হাদীসে মায়ের মর্যাদা সর্বাধিক তিন গুণ দান করা হয়েছে। যদিও পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ইবাদতের পরই মায়ের সাথে পিতার খেদমত করার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহর ঘোষণা– "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা"।[১৪] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবু উমামা

---

[১০]. আল-কুরআন, ২:১৮৭ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

[১১]. রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা: প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[১২]. প্রাগুক্ত, পৃ.৭২

[১৩]. ওবায়দী, ইসহাকঃ *যুগে যুগে নারী*, ঢাকঃ শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৩৯

[১৪]. আল-কুরআন, ১৭:২২
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

www.pathagar.com

রা. বলেন, "এক ব্যক্তি রসূল স.-কে জিজ্ঞেস করল সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি? তিনি বললেন, তারা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম"।[১৫]

ঘ) স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার: ইসলাম স্বামীর কাছে স্ত্রীর স্বতন্ত্র মর্যাদার কথা জোর দিয়ে বলেছে। তারা উভয় পরস্পরের পরিচ্ছদস্বরূপ। আল্লাহর ঘোষণা– "স্ত্রীরা তোমাদের পোশাক, তোমরা তাদের জন্য পোশাক"।[১৬] এ ছাড়াও এক ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে হাদীসে স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে সমঅধিকারের ঘোষণা দিয়ে মহনবী স. বলেন, "তাদেরকে নিজেদের সংগে খাওয়াবে নিজের মতই পরাবে। আর মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে খারাপ, অশ্লীল ভাষায় গাল-মন্দ করবে না এবং তাকে তার ঘর ছাড়া অন্য কোথাও ছাড়বে না"।[১৭] বিয়ের পর স্ত্রী তার বাপের বাড়ী ছেড়ে স্বামীর ঘরে যায়। এর অর্থ এই নয় যে, স্ত্রী স্বামীর দাসী বা বাদী তথা পরাধীনতার শৃঙ্খল পড়ে তার অধীনে বসবাস করবে। বরং নিজ অধিকার ভোগ করবে ও অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। সকল অবস্থায় স্ত্রীর সাথে স্বামীর ভাল ব্যবহার প্রয়োজন। বস্তুত; স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে অতি উত্তম ব্যবহার এবং মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার হকদার। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন– "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তাহলে হয়ত তোমরা এমন একটি জিনিসকে ঘৃণা করলে যার মধ্যে আল্লাহর প্রভূত কল্যাণ রয়েছে"।[১৮] পারিবারিক পরিমণ্ডলে পুরুষ তার স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে মিলে-মিশে বসবাস করে। এতে স্বামী-স্ত্রী সহ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর ভালবাসা। স্বামী ও স্ত্রী প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সত্যিকার মুসলিমের পরিচয় দিবে। এখানে নারী পুরুষের সমান ভূমিকা রয়েছে। সত্যিকার মুসলমানদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– "যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের আমাদের জন্য নয়ন জুড়ানো করে দিন এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য নেতৃস্থানীয় করে দিন"।[১৯] মুসলিম পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্বের ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও অধিকার সমান। তাই বলা যায়, স্বামী পরিবারের রাজা আর স্ত্রী রাণী। এজন্য কিয়ামতের দিন স্বামীর

---

[১৫]. শফী, মুফতী মুহাম্মদ, তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন, (অনুবাদ ও সম্পাদনা: মাওলানা মহিউদ্দীন খান, পবিত্র কোরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি:, পৃ: ৭৭১

[১৬]. আল-কুরআন, ২:১৮৭ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

[১৭]. কারযাভী, আল্লামা ইউসুফ , অনুবাদ, মওলানা আবদুর রহীম, *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ.- ২৮৩-২৮৪

[১৮]. আল-কুরআন, ৪:১৯

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

[১৯]. আল-কুরআন, ২৫:৭৪

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

www.pathagar.com

দায়িত্বের পাশাপাশি স্ত্রীকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। মহানবী বলেন, "স্ত্রী তার স্বামীর পরিজনদের এবং সন্তানদের তত্ত্বাবধানকারিনী। তোমরা প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে"।[২০]

ঙ) কন্যা হিসাবে নারীর অধিকারঃ কন্যাদের প্রতি জাহেলী যুগে বড় অত্যাচার করা হতো। কন্যা শিশুদেরকে কখনো যিন্দা কবর দেয়া হতো, আবার কখনো পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে নিক্ষেপ করা হতো। নারীদের এই অপমান ও জুলুম ইসলাম চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। উপরন্তু পুত্র-কন্যাকে পার্থক্য না করার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। পুত্র-কন্যার মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা, আহার ও পোশাকে, সমতা বজায় রাখা পিতার কর্তব্য, পার্থক্য করা অপরাধ। আজকের সভ্য যুগেও কিছু লোক আছে যারা মেয়ে সন্তান জন্মালে অসন্তোষ প্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহকেও গালাগাল দিয়ে থাকে। এটা ইসলামি জীবনাদর্শের পরিপন্থী। কারণ সন্তান আল্লাহর ভারসাম্যপূর্ণ দান যা মানব জানে না। আল্লাহ্ বলেন– "আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা (পুত্র-কন্যা) রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদের শিশু অবস্থায় বের করি, তারপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর"।[২১] আল্লাহ্ তাআলা ছেলে মেয়ে যাই দান করেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আল্লাহ্ যদি মানুষের খেয়াল খুশিমত ছেলে সন্তানই সৃষ্টি করতেন তাহলে নারীর অভাবে মানবজগৎ ভারসাম্যহীন হয়ে যেত। ইবাদত বন্দিগী তথা দীনদারীর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিদ্যমান। নারী-পুরুষ সমান ভাবে শরীয়তের হুকুমের আনুগত্যের সফলতা ও ব্যর্থতার দায়ভার বহন করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন– "নিশ্চয় মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী ; সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও বিশাল প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন"।[২২]

---

২০. বুখারী, ইমাম, *আস্-সহীহ,* অধ্যায়, আন নিকাহ্, অনুচ্ছেদঃ আল-মারয়াতু রায়া'আতু ফী বাইতে জাওজিহা, আল-কুতুবুসসিত্তা, রিয়াদঃ দারুসসালাম, ২০০০, হাদীস নং ৫৬০০, পৃ. ৪৫০
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ "

২১. আল-কুরআন, ২২:৫
وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ

২২. আল-কুরআন, ৩৩:৩৫

www.pathagar.com

শিক্ষাক্ষেত্র নারীর অধিকার

ইসলাম শিক্ষা গ্রহণকে নর-নারীর জন্য সমভাবে অপরিহার্য ঘোষণা করেছে। তবে পাশ্চাত্য ভাবধারায় গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে নয়। এ জন্য নারীদের নগ্নতা বর্জন করে শিক্ষার তাগিদ দিয়েছে ইসলাম। নবী স. বলেন, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য শিক্ষা গ্রহন করা ফরজ"।[২৩] উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে ইউরোপের নারীরা যখন শিক্ষার ছোঁয়া পর্যন্ত পায়নি, তখন সাড়ে চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে ইসলাম নারী-পুরুষকে শিক্ষার সমান অধিকার দিয়ে গেছে। যে জাতি শিক্ষায় যত উন্নত সে জাতি সভ্যতায় তত উন্নত। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক জাগরণ ও উন্নতি মুসলমানদের মাধ্যমে হয়েছিল। আল-কুরআনের প্রথম বাণী, "পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি রক্তপিণ্ড দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পাঠ কর, তোমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, যিনি মানুষকে কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে জানত না তিনি তাকে তা শিখিয়েছেন"।[২৪] রসূলুল্লাহ স. বলেন-বস্তুত সারা আসমান ও যমিনের অধিবাসীরা আলিমদের জন্য মাগফেরাত চায়, এমন কি সমুদ্রের মাছও।[২৫]

বিবাহের ক্ষেত্রে অধিকার

'বিবাহ' একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি যার মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কের কারণে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত নয়। এ বিবাহ নর ও নারীর 'ইজাব' ও 'কবুলের' অর্থাৎ 'প্রস্তাব' ও 'সম্মতির' মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। 'ইযাব' 'কবুল' মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে অথবা লিখিত আকারে অনুষ্ঠিত হতে পারে তবে পক্ষদ্বয় সশরীরে বিবাহ মজলিশে উপস্থিত থাকলে ইজাব-কবুল বাচনিক হওয়া অপরিহার্য"।[২৬] অবশ্য এই বিবাহ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ। পূর্ণ শৃংখলা ও নির্ভেজাল যৌন মিলন পূরণ করতে পারে এ পন্থা। আল্লাহর বাণী, "বিয়ে কর মহিলাদের মধ্য হত যাদেরকে তোমরা পছন্দ

---

[২৩]. আবু আব্দুল্লাহ, ওয়ালী উদ্দীন, শায়খ, *আল-মিশকাতুল মাসাবীহ,* অনুবাদঃ মাওলানা এ, বি, এম, এ, খালেক মজুমদার, ঢাকাঃ মুরাদ পাবলিকেশন্স, ২০০০, পৃ. ২০৮

[২৪]. আল-কুরআন, ৯৬:১-৫

اقرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {١} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ {٢} اقرَأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ {٣} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {٤} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {٥}

[২৫]. তিরমিযী, ইমাম, *আস-সুনান,* অধ্যায়ঃ আব্ওয়াবুল ইলমি, অনুচ্ছেদঃ মা-জায়া ফী ফাদলিল ফিক্হ আলাল ইবাদাতি, আল-কুতুবুসসিত্তা, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০, হাদীস নং- ২৬৮২, পৃ. ১৯২২

وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ

[২৬]. রহমান, গাজী শামছুর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, খ.১, পৃ. ১২৪

www.pathagar.com

কর" ।[২৭] তবে বিবাহের ক্ষেত্রে কাউকে জোর জবরদস্তি করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরষের সমান অধিকারই দিয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় বিবাহের গুরুত্ব নেই বললেই চলে। কারণ তারা যৌন কামণা পূরণ করাকে বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে থাকে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের উদ্দেশ্য হলো- "ক) নৈতিক চরিত্র ও সতীত্বের হেফাজত করা; খ) পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রশান্তি অর্জন করা; গ) ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করা এবং ঘ) নিষ্কলুষ বংশধারা অব্যাহত রাখা।"[২৮] ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের নীতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অমুসলিমরা যখন যার ইচ্ছা যে কাউকে বিবাহ করতে পারে আবার বিচ্ছেদও ঘটাতে পারে। কিন্তু ইসলাম এ নীতি সমর্থন করেনা। "আর অংশীবাদী রমণী যে পর্যন্ত না বিশ্বাস করে তোমরা তাকে বিয়ে করো না। অবিশ্বাসী নারী তোমাদের চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ইসলামে বিশ্বাসী ক্রিতদাসী তার চেয়ে ভাল"।[২৯] এছাড়া সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ ১৪ জন নারীর সাথে বিবাহ হারাম করেছেন এবং বহু বিবাহ নিরুৎসাহিত করেছেন। "তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, তোমরা এতিমদের প্রতি ন্যায় আচরণ করতে পারবে না, তবে ঐসব স্ত্রী লোক বিবাহ কর যাদেরকে তোমারা ভাল বলে মনে কর। দুইজন; তিনজন অথবা চারজন, কিন্তু যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তোমরা তাদের মধ্যে সুবিচার করিতে পারবে না, তা হলে বিবাহ কর মাত্র একজনকে"।[৩০] এ ছাড়া আল্লাহ বিবাহ বহির্ভূত নর-নারীর সহবাস সম্পূর্ণ হারাম করেছেন। পাশাপাশি এ ধরনের অপবাদের শাস্তিরও বিধান ঘোষণা করেন। "ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকরণে তোমাদের মনে যেন বিন্দু মাত্র দয়ার উদ্রেক না হয়"।[৩১] ব্যভিচার ও যৌন সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে স্থাপন তথা সুশৃংখল পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন যাপনের জন্য ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। যাতে করে নারী-পুরুষ অবৈধ কাজ থেকে বিরত থেকে। বৈধ পারিবারিক জীবন যাপনে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন- "তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ সম্পাদন কর"।[৩২] তাই ইসলাম নারীকে বিবাহের অধিকার দিয়ে অবাধ যৌনচার থেকে মুক্তির অধিকার নিশ্চিত করেছে।

---

[২৭]. আল-কুরআন, ৪:৩ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء

[২৮]. রহমান, গাজী শামছুর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

[২৯]. আল-কুরআন, ২:২২১

وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

[৩০]. আল-কুরআন, ৪:৩

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

[৩১]. আল-কুরআন, ২৪:২

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

[৩২]. আল-কুরআন, ২৪:৩২ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ

www.pathagar.com

তালাকের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার

পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে যেমন কোন নিয়ম কানুন নেই, তেমনি তালাকের ক্ষেত্রেও কোন বিধিবদ্ধ বিধান নেই। খ্রীস্টিয় ইউরোপে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরে সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হলেও ধর্ম ও আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি ছিল না।[৩৩] স্বামী কর্তৃক নির্যাতিতা নারীকে তালাকদানের অনুমতি দান করে ইসলাম নারীদের সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। আরববাসী নারীদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করত, যখন তখন নারীকে 'তালাক' দিত। ইসলামী আইন প্রবর্তনের পর মুসলমানদের মধ্যে তালাকের অপপ্রয়োগ ও নির্যাতন থেকে নারীরা মুক্তি পায়। আল্লাহর বাণী "আর তালাক প্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন 'কুরু' (হায়েয) পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর"।[৩৪] ইসলামী শরীয়তে তালাক দেয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে একটি অপরিহার্য ও নিরুপায়ের উপায় হিসেবে। তবুও আল্লাহ তাআলা তালাকের ব্যবস্থা রেখে নিরুপায় অবস্থা কমিয়ে দাম্পত্য দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা লাঘবের সুযোগ রেখেছেন।।[৩৫]

ইহুদী ধর্মে তালাকের আইন অভিনব ও অস্বাভাবিক। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী তার 'হালাল হারাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইহুদীর নিকট দশ বছর কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্ম না নিলে আইনের দৃষ্টিতেই তালাক দেয়া জরুরী বিবেচিত হতো। আবার খ্রীষ্ট ধর্মের ইনজিল ও বাইবেল তালাক দেয়া এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীকে পুনঃবিবাহ হারাম করেছে। বাইবেলে আছে—'ঈশ্বর' যাহা যোগ করিয়া দিয়েছেন, মনষা তাহার বিয়োগ না করুক। "মার্ক লিখিত সুসমাচারে বলা হয়েছে- যে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করে সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে; আর যদি আপন স্বামী পরিত্যাগ করিয়া আর একজনকে বিবাহ করে; তবেও সে ব্যভিচার করে"।[৩৬] কাজেই এ কথা বলা যায় যে,

---

[৩৩]. তাহুরা, অধ্যাপিকা মাওলানা শারাবান, *সীরাত স্মরণিকা*, ঢাকা: প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

[৩৪]. আল-কুরআন, ২:২২৮

وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوَءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أن يَكتُمنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أرحَامِهِنَّ إن كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أرَادُوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثلُ الذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ

[৩৫]. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আত-তালাক, অনুচ্ছেদ: ফী কেরাহিয়াতিত্ তালাক, আল-কুতুবুসসিত্তা, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০০, হাদীস নং ২১৭৭, পৃ. ১৩৮৩

أبغَضُ الحَلالِ إلى اللهِ الطَّلاقُ " .

[৩৬]. কারযাভী, আল্লামা ইউসুফ , অনুবাদ, রহীম, মওলানা আবদুর, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭৪

www.pathagar.com

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীকে তালাকের প্রয়োগ করতে নিরুৎসাহিত করেছে তবে একান্ত প্রয়োজনে অনুমোদন দিয়েছে।

দেনমোহর লাভের অধিকার

বিবাহ বন্ধন উপলক্ষে স্ত্রীকে স্বামী কর্তৃক বাধ্যতামূলক প্রদত্ত মালকে দেনমোহর বলে। দেনমোহর স্ত্রীর অধিকার এবং স্বামীর জন্য এটা একটা বড় ঋণ। দেনমোহর আদায় করা স্বামীর উপর অবশ্য কর্তব্য। এই দেনমোহর ধার্য্য করা যেমন বাধ্যতামূলক তেমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান করাও বাধ্যতামূলক। আল্লাহ বলেন–"এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহরানা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান কর"।[৩৭] যদি দেনমোহর আদায় না করা হয় ইসলামের বিধান মোতাবেক ব্যভিচার করার আপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। মহানবী স. বলেন, "কোন ব্যক্তি দেনমোহরের বিনিময়ে কোন নারীকে বিবাহ করল, কিন্তু তা পরিশোধের ইচ্ছা তার নেই, সে ব্যভিচারী"।[৩৮] আল্লাহ বলেন, "আর যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তাহলে তোমরা সানন্দে ভোগ কর"। মোহরানার সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত না থাকলেও সর্বনিম্ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– "স্ত্রীদের কাউকে অঢেল সম্পদ দান করে থাকলেও তা ফেরত নিতে পারবে না"।[৩৯] "ইমাম শাফিঈর মতে দেনমোহরের পরিমাণ যত কমই হোক বিবাহ জায়েয হবে। ইমাম মালেকের মতে এর নিম্ন পরিমাণ তিন দিরহাম এবং ইমাম আবু হানাফীর মতে দশ দিরহাম"।[৪০] দেনমোহর নির্ধারিত না করে বিবাহ দিলেও নারী স্বামী কর্তৃক দেনমোহর পাবার অধিকার রাখে। সেক্ষেত্রে "মোহরে মিসাল" অর্থাৎ সমপরিমাণ প্রযোজ্য হবে।

ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে অধিকার

ভরণ-পোষণ এর আরবী 'নাফকাহ'। যার পারিভাষিক অর্থ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ইত্যাদি। এ দায়িত্ব পালনকালে স্বামীকে স্মরণ রাখতে হবে যে, স্ত্রী তার দাসী বা বাদী নয় বরং তার জীবন সংগিনী। স্বামী, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, পোশাক পরিচ্ছদ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং এ সম্পর্কে যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামী নির্বাহ করবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, "আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে। যদি দুধ খাওয়ার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর হলো সে নারীর সমস্ত খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দান

---

[৩৭]. আল-কুরআন, ৪: ৪ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

[৩৮]. রহমান, গাজী শামছুর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৬

[৩৯]. আল-কুরআন, ৪:২০ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

[৪০]. মুহাম্মদ, ইমাম, *আল-মুয়াত্তা*, অনুবাদঃ মুহাম্মদ মূসা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অধ্যায়ঃ আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদঃ ফুফু ও তার ভাইঝিকে একত্রে বিবাহ করা নিষেধ, ১৯৮৮, পৃ. ৩০৫

www.pathagar.com

করবে"।[৪১] এ আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব। আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এছাড়াও পবিত্র কুরআনের সূরা তালাকের ২নং আয়াতে বলা আছে– "তোমরা যেখানে যে অবস্থাতেই বসবাস কর, স্ত্রীদেরকেও সেখানেই বসবাস করতে হবে"। এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মহানবী স. বলেন– "তুমি যা খাবে স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে এবং তুমি যা পরবে স্ত্রীকেও তা পরতে দেবে"।[৪২] সুতরাং স্বামীর নিকট থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়া নারীর অধিকার। "তবে কি পরিমাণ ভরণ-পোষণ দিবে, বিবাহিত অবস্থায়ই হোক অথবা তালাক প্রাপ্তা অবস্থাতেই হোক, এ ব্যাপারে ইসলামী ফিক্‌হবিদগণ একমত হয়েছেন যে, উভয়েই ধনী হলে ধনীর মান, গরীব হলে গরীবের মান হিসেবে প্রাপ্য হবে। আর যদি উভয়ের একজন ধনী, আর অপরজন গরীব হয়, তাহলে মধ্যম শ্রেণীর 'নাফকা' প্রদেয় হবে। স্ত্রীর 'নাফকা' সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মান মর্যাদা ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি উভয়ের মান-মর্যাদা ও সামর্থের পার্থক্য থাকে তবে মধ্যম শ্রেণীর 'নাফকা' দেয়া বিধেয়'।[৪৩]

অর্জিত সম্পদ সংরক্ষণের অধিকার

ইসলাম নারীদেরকে অর্থ উপার্জনে বারণ করেনি। বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে দেশের, সমাজের উন্নতি করার কথা বলা হয়েছে এবং অর্জিত সম্পদ সংরক্ষণেরও অধিকার তাদের দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন– "পুরুষের জন্যও তাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে এবং নারীদের জন্যও তাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে"।[৪৪] তবে প্রকৃতি ও দৈহিক অবয়ব এবং ক্ষমতায় নারী ও পুরুষ সমান নয়। তাই একই পরিবেশে নারী-পুরুষ অবাধ মেলামেশা করে অর্থ উপার্জনে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে বিধায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন করা বাঞ্ছনীয়। "নারীগণ এই ভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে উপার্জনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। তবে তারা সম্পূর্ণ সময় বাইরের কাজে ব্যাপৃত থাকলে অনেক সময়ে গৃহের কাজ বাধাগ্রস্ত হয় এবং সন্তান-সন্ততির সুষ্ঠু লালন-পালনে অসুবিধা দেখা দেয়"।[৪৫] দৈহিক দুর্বলতার

---

[৪১]. আল-কুরআন, ২:২৩৩
وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ

[৪২]. আবূ দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায়ঃ আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদঃ ফী হাক্কিল মারআতি আলা জাওজিহা, আল-কুতুবুসসিত্তা, রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০০, হাদীস নং ২১৪২, পৃ. ১৩৮০

[৪৩]. রহমান, তানযিলুর, *ইসলামী আইনের সংকলন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৮৯, পৃ.২৭

[৪৪]. আল-কুরআন, ৪:৩২ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

[৪৫]. খালেক, আব্দুল, *নারী ও সমাজ*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ২৯৫

www.pathagar.com

কারণে নারী-পুরুষের ন্যায় ভারী ও কঠিন কাজ করতে স্বভাবত অক্ষম। তাই যে কাজ তাদের জন্য সহজ সেটিই যেমন- সেলাই এর কাজ, হস্তশিল্পের কাজই বেশী উপযোগী, এছাড়া মেধাবী নারীরা শিক্ষিকা বা ডাক্তারী পেশায় নিয়োজিত হয়ে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি সমাজের অশেষ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকার

উত্তরাধিকার হলো মালিকানা, যার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল বা সম্পদ অন্যের অনুকুলে বর্তায়। অনেক ধর্মেই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার হতে নারীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পিতার বড় সন্তানই মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির একমাত্র মালিক হতো। বর্তমানে হিন্দু ধর্মেও নারীরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হয় না। কিন্তু ইসলাম নিকট-আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের সুনির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন– "পুরুষের অংশ রয়েছে সেই সম্পদে, যা তাদের মাতা-পিতা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছে। আর নারীদের জন্য অংশ রয়েছে সেই সম্পদে, যা তাদের মাতা-পিতা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছে। সেই সম্পদ কম হোক বা বেশী হোক, তাতে তাদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে"।[৪৬] সম্পদে নারীদেরকে অধিকার প্রদান নারীদের প্রতি ইসলামের বিশেষ অবদান। পবিত্র কুরআনে উত্তরাধিকারিদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের নিয়মাবলী সুনির্দিষ্টভাবে ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের যে সকল আয়াতে উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলো হলো-সূরা বাকারা-আয়াত ১৮০, সূরা বাকারা-আয়াত ২৪০, সূরা নিসা-আয়াত ৭-৯, সূরা নিসা-আয়াত ১৯, সূরা নিসা-আয়াত ৩৩ এবং সূরা মায়েদা-আয়াত ১০৬-১০৮। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে সম্পদ বণ্টনের কথা কুরআনের তিনটি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। আয়াত গুলো হলো, সুরা নিসা-১১,১২ এবং ১৭৬। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ উত্তরাধিকার বর্ণনা করেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু'এর অধিক, তবে তাদের জন্য ঐ মালে ৩ ভাগের ২ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি এক জনই হয় তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ৬ ভাগের ১ ভাগ, যদি মৃতের পুত্র সন্তান থাকে। যদি পুত্র সন্তান না থাকে পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে তবে মাতা পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ, ওসিয়তের পর, যা করে গেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা

---

[৪৬]. আল-কুরআন, ৪:৭

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

www.pathagar.com

ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ রহস্যবিদ"।[৪৭]

১. কন্যা যা পাবে তার দ্বিগুণ পাবে ছেলে।

২. যদি মৃতের কোন ছেলেমেয়ে থাকে। তবে স্ত্রী পায় আট ভাগের একভাগ এবং স্বামী চার ভাগের একভাগ।

৩. যদি মৃতের ছেলেমেয়ে না থাকে, তবে স্ত্রী পায় চারভাগের একভাগ এবং স্বামী পায় দুইভাগের একভাগ।

৪. যদি মৃতের কোন বংশধর না থাকে, তবে বোন পাবে ভাইয়ের তুলনায় সম্পত্তির অর্ধেক।

৫. উল্লেখ্য, একজন পুরুষ একজন মহিলার চেয়ে দ্বিগুণ সম্পত্তি পায়। ইসলামে অর্থনৈতিক দায়িত্ব পুরুষের কাঁধে অর্পিত, নারীর উপর নয়। মেয়েদের বিয়ের পূর্বে বাবা বা ভাইয়ের উপর দায়িত্ব থাকে। বিয়ের পর তা অর্পিত হয় স্বামী বা ছেলে সন্তানের উপর। ইসলাম পরিবারের প্রয়োজন মেটানের জন্য পুরুষের কাঁধে অর্থনৈতিক দায়িত্ব দিয়েছে আর এ কারণেই ইসলাম পুরুষকে সম্পত্তির দ্বিগুণ অংশ দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে ছেলেমেয়ের জন্য (এক ছেলে ও এক মেয়ে) ১,৫০,০০০ টাকা রেখে গেল। তখন ছেলে পাবে ১,০০,০,০০ টাকা আর মেয়ে পাবে ৫০,০০০ টাকা। ছেলে যে, ১,০০,০০০ টাকা পেল সেখান থেকে পরিবারের দায়িত্ব স্বরূপ সে পুরোটা বা ধরা যাক, ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করলে এবং তার নিজের জন্য ২০,০০০ টাকা থাকে। অপর পক্ষে মেয়েটি কারো জন্য এক পয়সাও খরচ করতে বাধ্য নয় সে তার পুরোটাই সঞ্চয় করতে পারে। আপনি কোনটা পছন্দ করবেন– ১,০০০,০০ টাকা পেয়ে ৮০,০০০ টাকা খরচ করা, নাকি ৫০,০০০ টাকা পেয়ে পুরোটা নিজের জন্য রেখে দেয়া"?[৪৮] কাজেই ইসলামের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুধাবন না করে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো মোটেও কাম্য নয়।

ভালবাসা লাভের অধিকার

যেহেতু স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিচ্ছদ। সুতরাং সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে আমোদ-প্রমোদ, হাসি-ঠাট্টা এবং ভালবাসা দিয়ে স্ত্রীকে প্রফুল্ল রাখা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রীর সাথে রুক্ষ ব্যবহার করা স্বামীসুলভ কাজ নয়। সেজন্য হাদিসে বলা হয় "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার

---

[৪৭]. আল-কুরআন, ৪:১১
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً

[৪৮]. নায়েক, ডাঃ জাকির আব্দুল করিমঃ *ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের আপত্তিসমূহের জবাব*, অনুবাদ, নাবিলা মাকারেমুল ইসলাম, ঢাকা : বিশ্ব প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ.৫৫, ৫৬ ও ৫৭

www.pathagar.com

স্ত্রীর নিকট উত্তম"। স্ত্রীর সাথে সদাচার করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন–"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্য হতে বারণ করেন"।[৪৯] এছাড়াও আল্লাহ সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো" সাথে সাথে স্ত্রীর ভুল ত্রুটিরও ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন- "তবে তোমরা যদি তাদের ক্ষমা করো তাদের উপর জোর জবরদস্তি না করো এবং তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও তাহলে জেনে রেখো আল্লাহ নিজেই বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান"।[৫০] স্ত্রীর যদি কখনো ভুলত্রুটি হয়ে যায় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে রাগান্বিত হয়ে এমন কিছু করা উচিত নয় যা দাম্পত্য জীবনের জন্য ক্ষতিকর। বরং স্ত্রীর অন্যান্য গুণের কথা স্মরণ করে তাকে ক্ষমা করা উচিত।

অর্থনৈতিক অধিকার

নারীরা সমাজ উন্নয়নে সমান অংশীদার। অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া সামগ্রিক ভাবে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। পুরুষের যেমন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালন করা, অর্থ উপার্জন, ভোগ ও পূর্ণ কর্তৃত্ব পাওয়ার অধিকার থাকে; নারীও তেমনি অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্ম পরিচালনা করা, অর্জিত সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার ও ভোগের কর্তৃত্ব পাওয়ার অধিকার রাখে। এ ব্যাপারে ইসলাম কোন বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। "পশ্চিমাদের ১৪০০ বছর পূর্বে ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে। একজন পূর্ণ বয়স্ক নারী বিবাহিত হোক কি অবিবাহিত, কারো সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকেই সম্পদের মালিক হতে পারে। বিলি বণ্টন করতে পারে, মালিকানা আদান-প্রদান করতে পারে, হিজাব বা পর্দা মেনে একজন নারী আয় বর্ধক পেশায় নিয়োজিত করতে পারে। মুসলিম সমাজ নারীদের পেশা গ্রহনে উৎসাহিত করে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রচুর মহিলা গাইনোলজিষ্ট দরকার, দরকার প্রচুর মহিলা নার্স। সমাজে অর্ধেক নারী বসবাস করায় প্রচুর মহিলা শিক্ষিকা প্রয়োজন, এছাড়াও নারীরা নিজের ঘরে বসে অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্ম করতে পারেন। যেমন: দর্জি বা সেলাই কাজ করা, এম্ব্রয়ডারী, কুঠির শিল্পের কাজসহ তার সাধ্যানুযায়ী যে কোন বৈধ কাজ করতে পারে। সে মিল কারখানা বা ছোট ফ্যাক্টরী যা, কেবল নারীদের জন্য করা হয়েছে সেখানেও কাজ করতে পারে। এছাড়াও সে এমন স্থানেও কাজ করতে পারেন যেখানে নারীর জন্য পৃথক সেকশন করা আছে। কেননা ইসলামে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিধি-নিষেধ রয়েছে। একজন নারী ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এক্ষেত্রে সে 'মাহরামের' সাহায্যে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। নারী বাহিরে না গিয়ে লোক নিয়োগের মাধ্যমে নিজের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে। এ ব্যাপারে সর্বোত্তম উদাহরণ হলো আমাদের মাতা বিবি খাদিজার রা.। তিনি আরবের মধ্যে

---

[৪৯]. আল-কুরআন, ১৬:৯০
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ

[৫০]. আল-কুরআন, ৬৪:১৪ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

www.pathagar.com

একজন সফল ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। তিনি শালিনতা বজায় রেখে লোকের মাধ্যমে বিশেষ করে মহানবী স.-এর সাথে বিয়ের পর মহানবী স.-এর মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতেন।[৫১]

সাক্ষী দানের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার

পুরুষ বা মহিলার নামোল্লেখ ব্যতীত সাক্ষীর কথা কমপক্ষে কুরআনের তিনটি সূরায় উল্লেখ আছে: ক) যখন উত্তরাধিকারের ওসিয়ত করা হয়, স্বাক্ষী হিসেবে দুইজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়"।[৫২] পবিত্র কুরআনে সূরা মায়েদার ১০৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে থেকে ধর্মপরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে, তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো।"[৫৩] খ) তালাকের ক্ষেত্রেও দু'জন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ কুরআন মসজিদে বলেন- "এবং তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে।"[৫৪] গ) সতী সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদের জন্য চারজন সাক্ষীর দরকার হয় : "যারা সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান"।[৫৫] ধরা যাক- একজন রুগী কোন এক নির্দিষ্ট রোগের জন্য অপারেশন করতে চাচ্ছেন। চিকিৎসা চূড়ান্ত করার জন্য সে দু'জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সার্জনের উপদেশ নেয়াকে প্রাদান্য দেবে। যদি সে দু'জন সার্জন না পায় তাহলে তার দ্বিতীয় এখতিয়ারে থাকবে একজন সার্জন ও দু'জন এমবিবিএস ডাক্তার। একই ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দু'জন পুরুষ সাক্ষী অগ্রাধিকারযোগ্য। ইসলাম পুরুষদেরকে পরিবারের জন্য উপার্জনকারী হিসেবে বিবেচনা করে। যেহেতু পুরুষের কাঁধেই অর্থনৈতিক দায় দায়িত্ব, তাই তাদেরকেই অর্থনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে মহিলার তুলনায় অধিক দক্ষ আশা করা হয়। দ্বিতীয় এখতিয়ার, একজন পুরুষ সাক্ষী ও দু'জন মহিলা সাক্ষী। যেন কোন একজন মহিলা সাক্ষী ভুল করলে অপরজন তা শুধরে নিতে পারে। কুরআনে 'তাদিল্লা' শব্দ

---

[৫১]. নায়েক, ডাঃ জাকির আব্দুল করিম, ঢাকা: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ মার্চ, ২০১১, পৃ.৩১

[৫২]. নায়েক, ডাঃ জাকির আব্দুল করিম, *ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের আপত্তিসমূহের জবাব*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫১

[৫৩]. আল-কুরআন, ৫:১০৬

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ

[৫৪]. আল-কুরআন, ৬৫:২ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

[৫৫]. আল-কুরআন, ২৪:৪

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ 'সন্দেহ' বা 'ভুল করা'। অনেকে ভুল করে তার অনুবাদ করে 'ভুলে যাওয়া'। তাই একমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই দু'জন মহিলা সাক্ষী একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান করা হয়েছে। খুনের ক্ষেত্রেও দু'জন মহিলা সাক্ষীকে একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান করা হয়েছে। কিছু আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, খুনের ক্ষেত্রেও মহিলা সাক্ষীর আচরণ নারীসুলভ প্রভাব ফেলতে পারে। সে রকম ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের চেয়ে অধিক ভীত থাকে। তার উত্তেজনক অবস্থায় সে সন্দিগ্ধ হয়ে যেতে পারে। "হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আয়েশা রা.-এর একক সাক্ষ্যেই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে: মোহাম্মদ স.-এর প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী আয়েশা রা.-এর একমাত্র সাক্ষ্যর উপর ভিত্তি করেই ২,২১০ টি নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণিত আছে। এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অনেক ফিকাহবিদই মত প্রকাশ করেন যে, রমযানের নতুন চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। ইসলামের একটি স্তম্ভ-রোযার জন্য একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। সকল মুসলিম মহিলা ও পুরুষ তার সাক্ষ্য মেনে নিচ্ছে। কোন কোন ফিকহবিদের মতে, রমযানের প্রথমে একজন সাক্ষী ও রমযানের শেষে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। পুরুষ বা মহিলার সাক্ষ্যের কারণে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলা সাক্ষীর অগ্রাধিকার রয়েছে। কিছু ঘটনায় মহিলা সাক্ষীর প্রয়োজন হয়, সেখানে পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ধরা যাক, মহিলাদের মৃত্যুর পরে গোসল দেয়ার ক্ষেত্রে মহিলা সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ সাক্ষ্যের এই তারতম্য তাদের ভিন্ন লিঙ্গের জন্য নয়। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজে তাদের ভিন্ন প্রকৃতি ও ভূমিকার কারণে হয়"।[৫৬]

নারীর আইনগত অধিকার

"ইসলামী জীবন দর্শন নর-নারী সমান মর্যাদার অধিকারী। শরীয়ত নর-নারী উভয়ের জীবন ও সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে হত্যা করে তাহলে সে কঠিন শাস্তি লাভ করবে, তাহলো সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সূরা বাকারার ১৭৮ ও ১৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে– "তাকেও হত্যা করা হবে। যদি কোন নারী হত্যা করে তাকেও মৃত্যু দণ্ড দেয়া হবে"। ইসলামের আইন অনুসারে নারী পুরুষের 'কিসাস' সমভাবে চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দেহের বদলে দেহ, উভয় সমান শাস্তি পাবে। যদি মৃতের অভিভাবক এমনকি সে যদি নারীও হয় এবং বলে যে, হত্যাকারীকে মাফ করে 'দিয়াত' অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ কর- তার মত গ্রহণ করা হবে। যদি নিহতের আত্মিয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয়, কেউ বলে হত্যাকারীকে হত্যা করাই উচিত, কেউ বলে "দিয়াত" গ্রহণ করে তাকে মাফ করে দেয়া উচিত– তাহলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া থেকে ফিরিয়ে রাখা

---

[৫৬]. নায়েক, ডা: জাকির আব্দুল করিম, ঢাকা: *ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের আপত্তিসমূহের জবাব*, প্রাগুক্ত,পৃ.৫৩-৫৪

www.pathagar.com

উচিত। সমভাবে নারী-পুরুষ যেই মতামত দিক না কেন তার গুরুত্ব একই"।[৫৭] সূরা মায়েদা ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে– "চোর সে নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন, তার হাত কেটে দাও, তার অপরাধের শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীকৃত"।[৫৮] অর্থাৎ নারী-পুরুষ যেই চুরি করুক তার হাত কাটা হবে, শাস্তি একই। সূরা নূরের ২নং আয়াতে বলা হয়েছে, "কেউ যদি ব্যভিচার করে সে নারী পুরুষ যেই হোক না কেন তাকে একশ দোররা মারো"।[৫৯] ব্যভিচারের শাস্তি সে নারী বা পুরুষ যেই করুক না কেন তার শাস্তি একই অর্থাৎ একশ দোররা, ইসলামে নারী পুরষের একই শাস্তি। ইসলাম একজন নারীকে ১৪০০ বছর পূর্বে সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার প্রদান করেছে। অথচ এখন আধুনিককালে ইহুদী পুরোহিতরা বিবেচনা করছে যে, নারীদের সাক্ষ্যদানের অধিকার দেয়া হবে কি না? যা ইসলাম ১৪০০ বছর পূর্বে অধিকার দিয়ে রেখেছে। সূরা নূরের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে- "যদি কেউ কোন নারীর সতীত্ব নিয়ে কথা বলে তাকে ৪জন সাক্ষী হাজির করতে হবে, না পারলে তাকে ৮০ দোররা মারতে হবে"।[৬০]

ইসলামে ছোট অপরাধে ২ জন সাক্ষী এবং বড় অপরাধে ৪ জন সাক্ষী প্রয়োজন। কোন নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ইসলামে বড় অপরাধ হিসেবে গণ্য। অতএব তার জন্য ৪ জন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে। ইসলাম নারীদের সতীত্ব রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার

অন্যান্য অধিকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক ভাবেও ইসলাম নারীকে অধিকার দিয়েছে। সূরা তওবার ৭১ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: "আর ঈমানদার পুরুষ আর ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক"।[৬১] তারা সামাজিক সহায়কই নয় রাজনৈকিতভাবেও নারী পুরুষ পরস্পরের সহযোগী। ইসলামে নারীদের ভোট প্রদানের অধিকার দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "হে নবী! মুমিন নারীরা যখন আপনার নিকট আনুগাত্যের শপথ নিতে আসবে"। এখানে আরবী শব্দ 'বাই'য়ানা'- এর অর্থ আধুনিক ও বর্তমান ভোটের চেয়েও অধিক ক্ষমতা। কারণ নবী মোহাম্মদ স. শুধু আল্লাহর রসূলই ছিলেন না, তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন এবং নারীরা নবী করিম স.-এর নিকট আসতেন এবং তাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নিয়ে সম্মতি দিতেন। সুতরাং ইসলাম নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করেছে।

---

৫৭. নায়েক, ডাঃ জাকির আব্দুল করিমঃ *লেকচার সমগ্র (১)*,ঢাকাঃ সংকলন, মোঃ রফিকুল ইসলাম, সম্পাদনা পর্ষদ, পিস পাবলিকেশন, ২০০৯, পৃ. ৩৪৮

৫৮. আল-কুরআন, ৫:৩৮
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ

৫৯. আল-কুরআন, ২৪:২ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

৬০. আল-কুরআন, ২৪:৪
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

৬১. আল-কুরআন, ৯:৭১ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ

www.pathagar.com

এমনকি নারীরা আইন প্রণয়নেও ভূমিকা রাখতে পারে। উমর রা. সাহাবীদের সংগে দেনমোহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন, যাতে যুবকেরা বিয়েতে উৎসাহিত হতে পারে। পিছনের সারি থেকে একজন মহিলা প্রতিবাদ করে বললেন, যখন কুরআন বলে: "তুমি বিপুল পরিমাণ সম্পদও দিতে পার মোহর হিসেবে" যেখানে কুরআন কোন সীমা নির্ধারণ করেনি সেখানে সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উমর কে? তৎক্ষণাৎ উমর রা: বলে উঠলেন, উমর ভুল করেছে, মহিলাই সঠিক"। ভেবে দেখুন, তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মহিলা। একজন সাধারণ মহিলা যিনি রাষ্ট্রপ্রধানকে তাঁর কাজে প্রতিবাদ করলেন। আইনের ভাষায় বলা যায়, তিনি সংবিধান চ্যুতি বিষয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন। বস্তুত একজন মহিলা আইন প্রণয়নে অংশ নিতে পারেন। নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নিয়েছে। বুখারী শরীফে পূর্ণ একটি অধ্যায়ই রয়েছে "যুদ্ধক্ষেত্রে নারী"। নারীরা পানি সরবরাহ করেছে, সৈনিকদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছে। এখানে 'নাসিবা' নামের একজন মহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; উহুদ যুদ্ধে নবী করিম স: কে প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম একজন ছিলেন নারী। যেহেতু কুরআন বলে, পুরুষ নারীদের সংরক্ষক, এ কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় নারীদের যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয়, এটা পুরুষের দায়িত্ব। শুধু প্রয়োজনেই নারীদের অনুমতি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ তারা কেবল প্রয়োজনেই যুদ্ধে যাবে অন্যথায় নয়।

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দা

সাধারণত নারীদের জন্যই পর্দা পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নারীর পর্দার আগে পুরুষের পর্দার কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআন মাজীদে সূরা নূরে রয়েছে: "মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবগত আছেন"।[৬২] নারীর জন্য পর্দার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সূরা আন-নূরে পরবর্তী ৩১নং আয়াতে বলা হয়েছে: "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে, এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র.........."।[৬৩] এ ছাড়াও পর্দার ৬টি বৈশিষ্ট রয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্দার ৬টি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

১. প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো শরীরের নির্দিষ্ট অংশ আবৃত করা। পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে তা ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ। মেয়েদের জন্য মুখ এবং হাতের কব্জি ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখা ফরজ। যদি তারা ইচ্ছা করে, তাহলে তারা এই

---

[৬২]. আল-কুরআন, ২৪:৩১
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء

[৬৩]. নায়েক, ডা: জাকির আব্দুল করিম, ঢাকা: ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের আপত্তিসমূহের জবাব, প্রাগুক্ত,পৃ.১৮,১৯ও ২০

www.pathagar.com

অংশগুলোও ঢেকে রাখতে পারে। কিছু সংখ্যক আলিম জোর দিয়ে বলেছেন, মুখ এবং হাতও পর্দার ফরজের মধ্যে পরে। বাকী পাঁচটি বৈশিষ্ট্য, পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য।

২. পরিধান এর কাপড় ঢিলা-ঢালা হবে যাতে দেহের আকৃতি বুঝা না যায়।

৩. কাপড় পাতলা হবে না যাতে অপর কেউ তাঁর সতর দেখতে না পারে।

৪. কাপড় এমন চাকচিক্যময় হবেনা, যা কোন পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে।

৫. পুরুষের পোশাকের সাথে যেন সাদৃশ্য না থাকে।

৬. অবিশ্বাসীদের পোশাকের সাথে কোন মিল থাকবে না। যেমন এমন কোন পোশাক পরা যাবে না যেটা অবিশ্বাসীদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পোশাকের হিজাবের সাথে সাথে তা চোখের হিজাব, হৃদয়ের হিজাব, চিন্তার হিজাব ও ইচ্ছার হিজাবকেও বোঝায় এটা কোন মানুষের চলাফেরা, কথাবার্তা ও আচরণ ইত্যাদিকেও বোঝায়। 'হিজাব' নিপীড়ন প্রতিরোধ করে। কেন মেয়েলোকের জন্য হিজাব ফরজ করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে সূরা আল-আহযাবে তা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন– "হে নবী! আপনি আপনার পত্নী কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন বাইরে গেলে তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৬৪] ধরা যাক, সমসুন্দরী যমজ দুই বোন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন ইসলামী হিজাবধারিনী, হাতের কব্জি ও মুখ ব্যতীত সমস্ত দেহ আবৃত। অপরজন পাশ্চাত্যের পোশাক মিনি স্কার্ট ও সর্টস পরিহিতা। মোড়ে গুণ্ডা বা দুবৃত্তরা দাঁড়িয়ে আছে উপহাস করার জন্য। তারা কাকে উপহাস করবে? যে মেয়ে ইসলামী হিজাবে আবৃত, তাকে না যে মিনি স্কার্ট পরা তাকে? সম্ভবতই তারা মিনি স্কার্ট পরা মেয়েটিকেই উপহাস করবে। এসব পোশাক পরোক্ষভাবে উপহাস ও উৎপীড়নের প্রতীক যা বিপরীত লিংগের আকর্ষণ বাড়ায়। কাজেই মার্জিত পোশাক নারীর ইজ্জত রক্ষার ক্ষেত্রে একান্তভাবে সহায়ক।[৬৫]

পুরুষকে একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রদান ও নারীকে নিষেধের কারণ

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারলে মেয়েদেরকে কেন একাধিক পুরুষ বিয়ে করার অধিকার দেয়া হয়না? ইসলামী সমাজের ভিত্তি হচ্ছে ইনসাফ ও সমতা। আল্লাহ পুরুষ ও মহিলাকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও নারীরা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ভিন্ন। তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব ভিন্ন। মহিলাদের বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

---

[৬৪]. আল-কুরআন ৩৩ : ৫৯

يايها النبى قل لازوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما -

[৬৫]. প্রাগুক্ত, পৃ.১৪-১৫

www.pathagar.com

১. যদি একজন পুরুষ একাধিক বিবাহ করে, তাহলেও তার ঔরশজাত সন্তানকে সহজে চিহ্নিত করা যায়। একজন মহিলার যদি একাধিক স্বামী থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে শুধু সন্তানের মাকেই সনাক্ত করা যায়, বাবাকে নয়। ইসলাম মা ও বাবা উভয়ের সনাক্তকরণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যে শিশু তাদের পিতা-মাতাকে চিনে না-বিশেষত বাবাকে, তারা বিভিন্ন মানসিক রোগে ভোগে। প্রায়শ তাদের বাল্যকাল খুব ভাল কাটে না। এ কারণে পতিতাদের ছেলে-মেয়েরা সুস্থ বাল্যকাল কাটায় না। যদি এরকম কোন বাচ্চা স্কুলে ভর্তি হয় এবং তার মাকে সন্তানের বাবার নাম জিজ্ঞেস করা হয়, তখন বিব্রতবোধ করে।

২. পুরুষেরা প্রকৃতগতভাবে মেয়েদের তুলনায় বেশী বিবাহের প্রয়োজন অনুভব করে।

৩. জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। একজন মহিলার পক্ষে একাধিক স্বামীর প্রতি অনুরূপ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। মাসিক চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে একজন নারীর মানসিক আচরণে পরিবর্তন দেখা দেয়।

৪. একাধিক স্বামী বিশিষ্ট একজন মহিলার একই সময়ে একাধিক যৌন সহযোগী থাকে। যার ফলে যৌনব্যাধি সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে, সেটা তার স্বামীর মধ্যে অন্য কারো সাথে যৌন সম্পর্ক না থাকলেও সংক্রমিত হতে পারে। এটা বহু বিবাহকারী এবং একাধিক স্ত্রীর পুরুষ স্বামীর ক্ষেত্রে ঘটে না। উপরোক্ত কারণগুলো যে কারো বুঝার জন্য যথেষ্ট। হয়ত আরো অনেক কারণ আছে। যার ফলে অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ স্ত্রীদেরকে একই সময়ে বহু স্বামী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন"।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, জাহেলী যুগে নারীকে মানুষই মনে করা হতো না। তাদেরকে ভোগের সামগ্রী, দাসী, বাদী ইত্যাদি মনে করা হতো। এমন কি কন্যা সন্তানকে বংশের কলংক তথা দুর্ভাগ্যের প্রতীক বিবেচনা করা হতো। কিন্তু ইসলাম ঐ সব কুসংস্কার ও মনগড়া মনোভাব দূর করে নারীকে এমন মর্যাদার আসনে আসীন করেছে যা পৃথিবীর ইতিহাসের বিরল। ইসলাম নারীকে সামাজিক, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সুন্দর আচার-আচরণ প্রাপ্তির অধিকার, সম্পত্তি অর্জনের বিভিন্ন মাধ্যমে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং ব্যয় ও কর্তৃত্বের পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে। বর্তমানে নারী স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীকে ঘর থেকে বের করে যে বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা ও উশৃঙ্খল পথে এনেছে তাতে শুধু তাঁদের মর্যাদাই ক্ষুন্ন হয়নি বরং এ দর্শন তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি মানবিক সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের যে নীতির কথা বলা হয়েছে তা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে নি:সন্দেহে নারী তার সকল ক্ষেত্রে মর্যাদা ও অধিকার ফিরে পাবে এবং পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির লক্ষ ও উদ্দেশ্য সফল হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ-৭, সংখ্যা-২৮
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১১

ইসলামী আইনে তাকলীদ

ড. মোঃ মাওদুদুর রহমান আতিকী*

[সারসংক্ষেপ : 'তাকলীদ' ইসলামী শরীয়তের একটি পরিভাষা। রসূল স.-এর যুগ থেকে যে সব দলীল যৌক্তিক কারণে ইজতিহাদের স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেসব দলীল যৌক্তিক কারণেই ইসলামী শরীয়াতে তাকলীদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইসলাম-এর বিধি-বিধান দু'ধরনের। একটি হচ্ছে সুস্পষ্ট, অকাট্য এবং অপরটি হচ্ছে অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক। যেসব বিষয় স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন সে সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোন বৈধতা ও সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তথা ইমামের তাকলীদের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যেসব আহকাম অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক সে সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অপরিহার্যতা রয়েছে। আর যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখে না, তাদের জন্য ইজতিহাদের যোগ্য ব্যক্তি তথা মুজতাহিদের তাকলীদ করার সুযোগ রয়েছে। অত্র প্রবন্ধে তাকলীদের পরিচয়, আল-কুরআনে তাকলীদের স্বীকৃতি, হাদীসের আলোকে তাকলীদ, তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা, প্রকারভেদ, সাহাবা ও তাবেঈ যুগে তাকলীদ, মাযহাব চতুষ্টয়ে তাকলীদ, তাকলীদের স্তর বিন্যাস, তাকলীদের তাৎপর্য ইত্যাদি স্থান পাবে।]

তাক্লীদ (تقليد)-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : তাকলীদ[১] অর্থ– 'হার পরানো, মালা পরানো, গলায় অথবা কাঁধে কোন বস্তু ঝুলিয়ে দেয়া। এটি 'কিলাদাতুন' (قلادة) থেকে উদ্ভূত। যখন মানুষের স্কন্ধে এটি পরানো হয়, তখন এর দ্বারা মালা বা হার পরানো বুঝায়। আর যদি পশুর গলায় ঝুলানো হয়, তখন এর দ্বারা দড়ি বুঝানো হয়। হাদীস শরীফে কিলাদাহ (قلادة) শব্দ দ্বারা গলার হারকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন–হযরত আয়েশা রা. বলেছেন– 'استعرت من اسماء قلادة"

"আমি আসমা রা.-এর নিকট থেকে একটি হার ধার নিয়েছি।"[২]

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।

১. উসমানী, আল্লামা তাকী, *উসূলুল ইফতা,* ঢাকা ঃ মাকতাবাতু শাইখুল ইসলাম, ১৪২৬ হি, পৃ. ৫১-৫২

২. আজী ও হামিদ সাদিক, মুহাম্মদ রাওয়াসকাল, *মুজামাতু লুগাতিল ফুকাহা,* করাচী : ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ১৪১
" التقليد : مصدر: قلد : وضع الشيى فى العنق مع الاحاطة به - وسمى ذالك : قلادة'
تقليد العام : اتباعه معتقدًا أصابته من غير نظر فى الدليل وتقليد الهدى : إلباسه
القلادة من النعال وهحوها ليعلم انه هدى "

www.pathagar.com

রূপকভাবে তাকলীদ এর অর্থ হচ্ছে–অনুসরণ করা, অনুকরণ করা ইত্যাদি। আরবী অভিধানে 'তাকলীদ' (تقليد) শব্দের অর্থ করা হয়েছে এভাবে, "কোনরূপ দলীল-প্রমাণ ছাড়াই কারো কথা ও কাজের অনুসরণ করা।"[৩]

পারিভাষিক অর্থ : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে 'তাকলীদ' বলতে বুঝায়–কুরআন-সুন্নাহ্ তথা ইসলামী শরীয়া-এর উৎসসমূহ থেকে সরাসরি মাসআলা উদ্ভাবন কিংবা শারঈ বিষয়ে কোন সমস্যার সমাধান দানে সক্ষম নয়–এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই কোন মুজতাহিদ ইমাম বা ফকীহ্র অনুসরণ করা।[৪]

ইমাম গাযালী র. 'তাকলীদ'-এর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন– "কারো কথাকে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেয়াকে তাকলীদ বলা হয়।"[৫]

মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল ইহ্সান তাকলীদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে– "তাকলীদ বলা হয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক কাউকে কোন বিষয়ে দলীল-প্রমাণ ছাড়াই সত্য বলে বিশ্বাস করত: তার অনুসরণ করা অথবা প্রমাণ ছাড়াই কারো কথাকে গ্রহণ করে নেয়া"।[৬]

তাকলীদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল হুমাম ও আল্লামা ইবনু নুজাইম বলেন, "তাকলীদ বলা হয় কোনরূপ প্রমাণ ব্যতিত এমন ব্যক্তির কথা অনুযায়ী আমল করা যার কথা শরীয়তের দলীল সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[৭] ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ আতহার আলী শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ র.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে তাকলীদ (التقليد)-এর পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন-

The Arabic word taqlid is derived from qaladah or qiladah' which literally means a necklace or an exquisite poem and so on. Taqlid is made to the measure (wazn) of bab taf'il, 'qalladaha qaladah' means; he

---

৩. খান, মাওলানা মুহিউদ্দীন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪
"وقلد فلانا : اتبعه فيما يقول او يفعل من غير حجة ولا دليل"

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ৪১৯; *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩-৫০৪; খান, সফদর মাওলানা সরফরায, *আল কালামুল মুফীদ ফী ইসবাতিত-তাকলীদ*, সাহারানপুর : মাকতাবাই-ইলমিয়্যাহ, পৃ. ২৯

৫. যায়দান, ড. আব্দুল করীম, *আল-ওয়াজীয্ ফী উসূলিল ফিক্হ*, বৈরুত ঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৬, পৃ. ৪১০

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩-৫০৪
"التقليد عبارة عن اتباع الانسان غيره معتقدًا للحقية فيه من غير نظر فى الدليل او هو عبارة عن قبول الغير من غير حجة "

৭. উসমানী, মাওলানা মুফতী তাকী, *তাকলীদ কি শারঈ হায়সিয়্যাত*, করাচী : মাকতাবা-ই-দারুল উলূম, ১৪৭৮ হিঃ, পৃ. ১৪
" التقليد العمل بقول من ليس قوله إحد الحجج لاحجة منها "

www.pathagar.com

made her wear a necklace. Philologically taqlid means imitation, copying, unquestioning adoption of concepts or ideas and so on.[৮]

আল-কুরআনের আলোকে তাকলীদ-এর স্বীকৃতি : 'তাকলীদ' বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আল্-কুরআনে বিভিন্ন আঙ্গিকে নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে আমরা এর সমর্থনে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করার চেষ্টা করছি–"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো। আর তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর তাদেরও।"[৯]

উপরোক্ত আয়াতে 'উলূল আমর' (اولى الامر)-এর আনুগত্য করার বৈধতা দান করা হয়েছে। আর একথা ঠিক যে, 'উলূল আমর' (اولى الامر)-এর দ্বারা মূলত: ফকীহ্ আলিমগণকেই বুঝানো হয়েছে। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা., আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা., মুজাহিদ রা., আতা ইবনে আবূ রাবাহ, হাসান বসরী, হযরত আবুল আলিয়া আলিম ও তাফসীরবিদগণের একটি বিরাট দল 'উলূল আমর'-এর দ্বারা ফকীহ্ আলিমগণকে বুঝানোর ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[১০]

"তাদের কাছে যখন শান্তি ও শংকা সংক্রান্ত কোন খবর এসে পৌঁছে, তখন তারা তার প্রচারে লেগে যায়। অথচ বিষয়টি যদি তারা রসূলের এবং উলিল আমরগণের কাছে পেশ করতো; তাহলে তাদের মধ্য থেকে উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির অধিকারী ব্যক্তিগণ বিষয়টি উদঘাটন করতে পারতো।"[১১]

এ আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রমাণ করে যে, 'উলূল আমর' তথা তত্ত্ব ও রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম মুজতাহিদ ইমামগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে রহস্য উদঘাটন করে

---

৮. Ali, Muhammad Athar, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid*, Dhaka : Bangladesh Institute of ISlamic Thought, 2001, p. 189.
কেউ কেউ তাকলীদ সম্পর্কে বলেন– "Acting upon the opinion of another person without any positive proof (hujjat mulzimah)" "taqlid' as the servile adoption of another's opinion without evidence." Cf : Ibid, P- 189.

৯. *আল-কুরআন*, ৪ : ৫৯ " يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ "

১০. *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২। অবশ্য এ প্রসঙ্গে কোন কোন আলিম বলেন, উলূল আমর দ্বারা মুসলিম শাসককে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবূ বকর আল-জাসসাস র. উক্ত অভিমতদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলেছেন যে, উক্ত শব্দের অর্থদ্বয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। কারণ রাজনৈতিক বিষয়ে মানুষ শাসকের আনুগত্য করে। আর 'ফিক্‌হী বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করে থাকে। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২-৫১৪

১১. *আল-কুরআন*, ৪ : ৮৩
"وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ "

www.pathagar.com

সমস্যার সমাধান করবে। আর যারা এ বিষয়ে অক্ষম তারা মুজতাহিদ তথা সমস্যার সমাধানকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবে। মূলতঃ এটি হচ্ছে তাকলীদের মর্মার্থ।[১২]

"দীনি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনের জন্য প্রত্যেক দল থেকে একটি উপদল কেন বেরিয়ে পড়ছে না, যেন জাতির নিকট ফিরে এসে তাদেরকে তারা সতর্ক করতে পারে? আশা করা যায় যে, তারা সতর্কতা অবলম্বন করবে।"[১৩]

উক্ত আয়াতের মর্ম হচ্ছে–উম্মাহ্‌র মধ্যে এমন একটি দল বিদ্যমান থাকা একান্তই জরুরী যারা দিবা-রাত্র কুরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞান অর্জনে নিমগ্ন থাকবে এবং জ্ঞান অর্জনের সুযোগ বঞ্চিত মুসলমানদেরকে দীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ এবং সর্ব সাধারণের প্রতি নির্দেশ হলো তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা। তাকলীদ এর মর্মও হচ্ছে এটিই।[১৪]

"তোমরা যদি না জান তাহলে যারা জানে (আহলে ইল্‌ম) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।"[১৫]

আলোচ্য আয়াতও দ্ব্যর্থহীনভাবে তাকলীদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করছে।

হাদীসের আলোকে তাকলীদ-এর স্বীকৃতি : রসূল স. তাঁর জীবদ্দশাতেই সাহাবা কিরামকে ব্যক্তি কেন্দ্রিক(تقليد شخصى) এবং সামষ্টিকভাবে তাকলীদ(تقليد مطلق) করার জন্য তাকীদ করেছেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো–

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "জ্ঞান ('ইল্‌ম) ছাড়া কোন বিষয়ে ফতোয়া দিলে সে পাপ ফতোয়া দানকারীর উপরই বর্তাবে।"[১৬] তিনি বলেছেন–

---

[১২]. *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫, এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাফসীরবিদ ইমাম রাযী বলেন :

" الاية دالة على امور - احدها ان فى احكام الحوادث ما لا يعرف النص بل بالاستنباط - وثانيها أن الاستنباط حجة - وثالثها أن العام يجب عليه تقليد العلماء فى احكام الحوادث

"উল্লিখিত আয়াত দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় : এক–নিত্য-নতুন এমন অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়, যার সমাধান সরাসরি নস আয়াত দ্বারা বুঝা যায় না, সুতরাং তার জন্য ইস্তিম্বাতের (গবেষণা) প্রয়োজন হয়। দুইঃ ইস্তিম্বাত (গবেষণা) শরীয়াতের একটি দলীল। তিন–সাধারণ মানুষের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক মাসায়েল ও সমস্যার ক্ষেত্রে উলামা কিরামের তাকলীদ করা ওয়াজিব।

[১৩]. *আল-কুরআন*, ৯ :১২৩

"فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ - وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ "

[১৪]. *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬

[১৫]. *আল-কুরআন*, ১৬ : ৪৩; *আল-কুরআন*, ২১ : ৭

" فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ "

www.pathagar.com

"বিশ্বস্ত উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদের কাছ থেকে এই জ্ঞান অর্জন করবে এবং অতিরঞ্জনকারীদের অতিরঞ্জন, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং জাহিলদের ভুল ব্যাখ্যা থেকে এটিকে রক্ষা করবে।[১৭]

তাকলীদ-এর প্রয়োজনীয়তা : 'তাকলীদ' হচ্ছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একজন মুকাল্লিদ (তাকলীদকারী) মূলতঃ অনুসরণীয় মুজতাহিদ ইমামের নির্দেশনানুযায়ী আল্লাহ ও রসূলেরই স. আনুগত্য করে থাকেন।

ইসলামী জীবন বিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে যারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধান ও মর্মার্থ উদঘাটন করতে সক্ষম নয় কিংবা কুরআন ও সুন্নাহ্ তথা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক আমল করতে অপারগ তাদের জন্য কুরআন-সুন্নাহ্সহ শরঈ উৎস সম্পর্কে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এমন বিজ্ঞ আলিম-এর শরণাপন্ন হয়ে আমল করা অপরিহার্য। আর এ প্রেক্ষিতই তাকলীদের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে।

ইসলামী শরীয়া অনুসরণের একটি স্বাভাবিক উপায় এটিই যে, পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার আলোকে জীবন পরিচালনা করবে এবং শরঈ বিষয়ে আমল করবে।

এ প্রসঙ্গে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী র. বলেন, "মুসলিম উম্মাহ্ এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, শরীয়া জানা ও উপলব্ধি করার জন্য পূর্বসূরীগণের উপর ভরসা করবে। যেমন তাবিঈ'গণ এক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের উপর নির্ভর করেছেন, তাবি তাবিঈগণ নির্ভর করেছেন তাবিঈগণের উপর। অনুরূপভাবে উম্মতের সকল পর্যায়ের আলিমগণ তাঁদের পূর্বসূরীগণের উপর নির্ভর করেছেন।[১৮] ইসলামী শরীয়া পরিপালনের জন্য আল্লাহ্ তাআলা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। রসূল স. ছিলেন আল-কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা। আল-কুরআনের আলোকে তিনি দীনের সকল বিষয় সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে গিয়েছেন যা সুন্নাহ হিসেবে অভিহিত। কিন্তু উক্ত কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে সকল বিধান আহরণ করা সম্ভব নয়। দীনের এমন

---

[১৬]. আবু দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : তাওয়াক্কি ফিল ফুত্য়া, আল-কুতুবুসসিত্তা, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৪৯৪

" مَنْ افْتى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُه عَلى مَنْ افْتَاهُ "

[১৭]. *বায়হাকী*, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : ইলম, দিল্লী : তা.বি.

"يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْم مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُه يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ "

[১৮]. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪১-৫৪২

" إن الامة إجمعت على ان يعتمدوا على السلف فى معرفه الشرعية - فالتابعون إعتمدوا فى ذالك على الصحابة (رضـ) وتبع التابعين إعتمدوا على التابعين وهكذا فى كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم "

www.pathagar.com

কিছু বিধান রয়েছে যা দ্ব্যর্থবোধক (مشترك), সংক্ষিপ্ত (مجمل), অস্পষ্ট (متشابة) এবং বাহ্যত: বৈপরিত্বমূলক (تعارض) । এসব ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের জন্য, সঠিকভাবে দীনি আহকামের অনুসরণ করা অসম্ভব। আর উক্ত বিষয়ের অনুসরণের জন্য একজন মুজতাহিদ তথা দীনের ব্যাপারে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির অনুসরণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[১৯]

'তাকলীদ' প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী র. বলেন, "যে ব্যক্তি নিজে খোদায়ী বিধান ও সুন্নাতে রসূল স. সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি রাখে না এবং মূলনীতির আলোকে কর্মপন্থা নির্ধারণের যোগ্যতা রাখে না তার জন্য ইমামদের অনুসরণ ছাড়া বিকল্প পন্থা নেই। বিজ্ঞ ইমামগণের যার প্রতিই তার আস্থা হয় তাঁর প্রদর্শিত পন্থারই সে অনুসরণ করতে পারে। এ প্রকৃত তত্ত্বের ভিত্তিতে যদি কেউ তাঁদের অনুসরণ করে তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার কোন অবকাশ নেই।[২০]

সুতরাং এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দীনের যে সকল বিষয় সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং দলীল নির্ভর সে সকল ক্ষেত্রে মুজতাহিদের তাকলীদ জরুরী নয়। যেমন-ঈমানিয়াত (إيمانيات)-এর বিষয়গুলো তথা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের রোযা পালন, যাকাত ও হজ্জসহ মৌলিক বিষয়াবলী। পক্ষান্তরে, দীন ও শরীআহ্-এর যে সকল বিষয় জটিল, দ্ব্যর্থবোধক এবং বিরোধপূর্ণ–সে সকল ক্ষেত্রে সাধারণের জন্য মুজতাহিদের তাকলীদ করা অপরিহার্য।[২১]

"দ্ব্যর্থতা, সংক্ষিপ্ততা কিংবা দৃশ্যত: বৈপরিত্বের কারণে কুরআন সুন্নাহ্ থেকে আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে সমস্যা ও জটিলতা দেখা দিলেই ইমাম ও মুজতাহিদের তাকলীদের প্রয়োজন। পক্ষান্তরে সহজ ও সাধারণ আহকামের ক্ষেত্রে তাকলীদের প্রয়োজন নেই।[২২] বিশিষ্ট হানাফী আলিম আব্দুল গণী নাবলুসী র. বলেন–

"সুস্পষ্ট ও সর্বসম্মত আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে চার ইমামের কারো তাকলীদের প্রয়োজন নেই। যেমন–সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদি ফরজ

---

১৯. উসমানী, আল্লামা মুহাম্মদ তাকী, *উসূলুল ইফতা,* ঢাকা : মাকাতাবাতু শাইখুল ইসলাম, ১৪২৬ হি:, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ৪১৯

২০. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, *রাসায়েল ও মাসায়েল,* অনুবাদ–আবুদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা : মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৮৯, খ. ১, পৃ. ১৭১; "কেউ যদি তাঁদেরকে (ইমামগণ) হুকুমকর্তা মনে করে, কিংবা তাঁদের প্রতি এমন আনুগত্য প্রদর্শন করে যা কেবল বিধান কর্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন ইমামের প্রদর্শিত তরীকা থেকে দূরে সরে যাওয়াকে যদি সে মূল দীন থেকে সরে যাওয়ার সমার্থক মনে করে এবং তাঁর উদ্ভাবিত কোন মাসআলা সহীহ্ হাদীস এবং আয়াতে কুরআনের খেলাফ পাওয়া সত্ত্বেও যদি তার অনুসরণে অটল থাকে তবে এটা নিঃসন্দেহে 'শিরক' হবে।"

২১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, খ. ১, পৃ. ৪১৯

২২. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর, *ইসলামী শরীয়তের উৎস,* ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৪৩-১৪৬

www.pathagar.com

হওয়া এবং যিনা, সমকামিতা, মদ্যপান, চুরি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি হারাম হওয়া দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এ বিষয়ে কারো তাকলীদের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে ভিন্নমত সম্বলিত আহকাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রেই শুধু তাকলীদের প্রয়োজন।"[২৩]

'আল্লামা খতীব আল-বাগদাদী র.-এ সম্পর্কে (تقليد) লিখেছেন, "শরীআহ্‌র আহকাম দু' প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে–এমন আহকাম যা রসূল স.-এর দীনের অংশরূপে সাধারণভাবে স্বীকৃত। যেমন–পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমযানের সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদির ফরযিয়াত বা অপরিহার্যতা এবং যিনা, মদ্যপান ইত্যাদির হুরমত ও নিষিদ্ধতা। এ সকল ক্ষেত্রে কারো তাকলীদ বৈধ নয়। কেননা, এগুলো সবার জন্য সমান বোধগম্য। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে যেমন–ফুরূ (ইবাদতের শাখা-প্রশাখা) ইবাদত, মুয়ামালাত, ও বিয়ে-শাদীর খুঁটিনাটি মাসায়েলের ক্ষেত্রে রীতিমত চিন্তা গবেষণা এবং দলীল প্রমাণের প্রয়োজন বিধায় তাকলীদ অপরিহার্য।[২৪] আল্লাহ্ তাআলার বাণী দ্বারা প্রমাণিত–"তোমাদের ইল্ম না থাকলে আহলে ইলমদের জিজ্ঞাসা করে নাও।"[২৫]

এ সকল ক্ষেত্রে তাকলীদ নিষিদ্ধ হলে সবাইকে বাধ্যতামূলক ইলম্ চর্চায় নিয়োজিত হতে হবে। ফলে স্বাভাবিক জীবন যাত্রাই অচল হয়ে যাবে। আর খেত-খামার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংসার-পরিবার সবই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এমন আত্মঘাতী পথ অবশ্যই বর্জনীয়। অবশ্য হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. 'তাকলীদ' সম্পর্কে লিখেছেন,

"শরীআতের যাবতীয় আহকাম ও মাসায়েল তিন প্রকার। প্রথমত: বাহ্যিক বিরোধপূর্ণ দলীল নির্ভর মাসায়েল। দ্বিতীয়ত: দ্ব্যর্থবোধক দলীল নির্ভর মাসায়েল। তৃতীয়ত: দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট দলিল নির্ভর মাসায়েল। প্রথম ক্ষেত্রে আয়াত ও হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মুজতাহিদের করণীয় হলো 'ইজতিহাদ' আর সাধারণের করণীয় হলো পূর্ণাঙ্গ তাকলীদ।"

---

[২৩]. উসমানী, মাওলানা তাকী, *মাযহাব কি ও কেন*, অনুবাদ–আবু তাহের মেসবাহ, ঢাকা : মোহাম্মদী বুক হাউস, খ. ১, ১৩৯৬ হিঃ, পৃ. ১৫-১৬
" فالامر المتفق عليه المعلوم من الدين بالضرورة لا يُختَاج إلى التقليد فيه لاحد الاربعة كفر ضيَة الصّلوة والصّوم والزكوةِ والحجّ ونحوها وحرمَةِ الزّنا واللواطةِ وَشرب الخمر والقتل والسرقة والغصب وَما اشبه ذالك والأمر المختلف فيه هو الّذىْ يُحتَاجُ الى التقليد فيه ـ"

[২৪]. কারযাভী, আল্লামা ইউসুফ আল, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনুবাদ–ড. মাহফুজুর রহমান, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৯৩-৯৪; রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর, *ইসলামী শরীয়তের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬

[২৫]. *আল-কুরআন*, ১৬ : ৪৩; *আল-কুরআন*, ২১ : ৭ فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

www.pathagar.com

উসূলে ফিক্হর পরিভাষায় দ্বিতীয় প্রকার আহকামগুলো দ্ব্যর্থবোধক দলীল নির্ভর। এক্ষেত্রেও মুজতাহিদের দায়িত্ব হলো, উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ। আর সাধারণের কর্তব্য হলো মুজতাহিদের হুবহু অনুসরণ। তৃতীয় প্রকার আহকামগুলো উসূলে ফিক্হর পরিভাষায় الدليل القطعى বা অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল নির্ভর। এক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাকলীদ উভয়েরই আমরা বিরোধী।"[২৬]

তাকলীদের প্রকরণ

তাকলীদ প্রধানত: দুই প্রকার। যথা– ১. তাকলীদে মুতলাক (تقليد مطلق) মুক্ত তাকলীদ। ২. তাকলীদে শাখসী (تقليد شخصى) ব্যক্তি তাকলীদ।

১. তাকলীদে মুতলাক (মুক্ত তাকলীদ) : ইসলামী শরীয়ার-এর সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট ইমাম মুজতাহিদের অনুসরণের পরিবর্তে বিভিন্ন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করাকে তাকলীদে মুতলাক বা মুক্ত তাকলীদ বলে।[২৭]

২. তাকলীদে শাখসী (ব্যক্তি তাকলীদ) : ইসলামী শরীয়া-এর সকল বিষয়ে একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদ তথা ইমামের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করাকে তাকলীদে শাখসী বা ব্যক্তি তাকলীদ বলে। এ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আতহার আলী র. আল্লামা দেহলবী র.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

According to the general jurists taqlid falls into two categories. Taqlid ghayr shakhsi and shakhsi.

১. Taqlid ghayr shakhsi is that in which no Imam or mujtahid is specified, rather the madhhab of a doctor ('alim) is adopted in a particular issue and the madhhab of another doctor in other issues. It is called taqlid in general (taqlid mutlaq). It also may be called literal sense of taqlid.

২. Taqlid shakhsi is that in which a particular doctor or mujtahid is chosen and his opinion is followed in every issue unquestioningly.[২৮]

উপরোক্ত উভয় তাকলীদ কুরআন-সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে বৈধ এবং উভয় তাকলীদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

মূলত: তাকলীদের তাৎপর্য হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিজস্ব ইল্মী যোগ্যতা না থাকার কারণে দীনের ব্যাপারে কোন ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ও প্রজ্ঞার অধিকারী মুজতাহিদ

---

[২৬]. *রাসায়েল ও মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১। "ইমামগণের অনুসরণের তাৎপর্য হচ্ছে তাঁরা আল্লাহ্ ও রসূল স. প্রদত্ত বিধি-বিধানের উপর গবেষণা-ইজতিহাদ করেছেন। এ গবেষণা-ইজতিহাদ দ্বারা তাঁরা জানতে পেরেছেন ইবাদত ও আচরণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ। এ ছাড়াও তাঁরা শরীয়াতের মূলনীতির আলোকে খুঁটি-নাটি বিধান বের করেছেন। সুতরাং তাঁরা নিজেরা কোন বিধান চালু করেন নি। আর আনুগত্য লাভেরও তারা দাবীদার নন। বরঞ্চ তাঁরা শরীয়াত সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের জন্য শরীয়াত জানার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

[২৭]. *মাযহাব কি ও কেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১-৫১২

[২৮]. Ali, Muhammad Athar, *Shah Wali Allah's Concept of Ijtihad and Taqlid*, Ibid, P- 189-93.

www.pathagar.com

আলিম-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের আলোকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর আমল করা। তাকলীদের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি বা ইমামের আনুগত্য করা হয় না। আল-কুরআনের ভাষায় উপরোক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন–

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রসূলের স.। আর আনুগত্য কর তাদের যারা তোমাদের মধ্যে উলুল-আমর(اولى الامر) অনুসরণীয়।"[২৯]

সাহাবা ও তাবিঈ যুগে মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তি তাকলীদ

সাহাবা কিরামের পূর্ণ যুগে মুক্ত তাকলীদ ও ব্যক্তি তাকলীদ (تقليد مطلق) (تقليد شخصى)উভয়েরই প্রচলন ছিল।[৩০] এ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী র. বলেন, "পয়লা এবং দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে কোন নির্দিষ্ট ফিক্‌হী মাযহাবের তাকলীদ করার প্রচলন ছিল না। এ প্রসঙ্গে আবু তালিব মাক্কী তাঁর 'কুওয়্যাতুল কুলূব' গ্রন্থে লিখেছেন : "এসব (ফিকহ্‌র) গ্রন্থাবলী তো পরবর্তীকালে রচিত ও সংকলিত হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় হিজরী শতকে লোকদের কথাকে (শরীয়তের বিধানরূপে) পেশ করা হতো না। কোন এক ব্যক্তির মাযহাবের ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া হতো না। সকল (মাসআলার) ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির মতই উল্লেখ করা হতো না এবং কেবল এক ব্যক্তির মাযহাবকেই বুঝার চেষ্টা করা হতো না।" [৩১]

---

২৯. *আল-কুরআন, ৪:৫৯,* يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ উল্লেখ্য যে, সকল তাফসীরকারের মতে, আলোচ্য আয়াতে 'উলুল আমর' (اولى الامر) দ্বারা কুরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানসম্পন্ন মুজতাহিদ ইমামকে বুঝানো হচ্ছে। *মাযহাব কি ও কেন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০; *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২-৫১৪

৩০. *ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০-৫২৪

৩১. দেহলবী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ র., *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়,* অনুবাদ–আবদুস শহীদ নাসিম, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫, পৃ. ৭০-৭২ এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, তখন লোকদের অবস্থা ছিলো এর চাইতেও সম্পূর্ণ ভিন্ন পৃথক ধরনের। তখন মুসলমানদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক ছিলো। এক শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন আলিম। আর অপর শ্রেণীর লোকেরা ছিলেন সাধারণ মুসলমান। সাধারণ মুসলমান সর্বসম্মত বা মতবিরোধহীন মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের তাকলীদ করতেন না, বরঞ্চ সরাসরি শরীয়ত প্রণেতা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের অনুসরণ অনুকরণ করতেন। তারা অযু গোসল প্রভৃতির নিয়ম পদ্ধতি এবং নামায, যাকাত প্রভৃতির বিধান তাদের মুরব্বীদের নিকট থেকে অথবা নিজেদের এলাকার আলিমদের থেকে শিখতেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করতেন। আর যখন কোন বিরল ঘটনা ঘটতো তখন মত ও মাযহাব নির্বিশেষে যে কোন মুফতী তারা পেতেন তার নিকটই সে বিষয়ে ফতোয়া চাইতেন। "সেকালে লোকেরা কখনো একজন আলিমের নিকট ফতোয়া চাইতেন আবার কখনো আরেকজন 'আলিমের নিকট। কেবল একজন মুফতীর নিকটই ফতোয়া চাওয়ার নিয়ম ছিল না।"

www.pathagar.com

ক. সাহাবা ও তাবিঈ যুগে মুক্ত তাকলীদ বা মুতলাক তাকলীদ (تقليد مطلق) :
সাহাবা কিরাম ও তাবিঈ যুগে মুক্ত তাকলীদের (تقليد مطلق) ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং এ ব্যাপারে অসংখ্য দৃষ্টান্তও রয়েছে। নিম্নে আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি: আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রা. বলেন :
"একদিন জাবিয়া নামক স্থানে উমর রা. খুৎবা দিতে গিয়ে বলেন, হে লোক সকল! কুরআন সংক্রান্ত তোমাদের কোন প্রশ্ন থাকলে উবাই ইবনে কাব রা.-এর নিকট, ফারায়েয সংক্রান্ত কিছু জানতে হলে যায়েদ ইবনে সাবিত রা.-এর নিকট এবং 'ফিক্হ' সংক্রান্ত কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে মুআয ইবনে জাবাল রা.-এর কাছে যাবে। তবে অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন থাকলে আমার কাছে আসবে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বণ্টন ও তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত করেছেন।"[৩২]
উক্ত খুৎবায় উমর রা. তাফসীর, ফিক্হ ও ফারাইয বিষয়ে সকলকে বিশিষ্ট তিনজন সাহাবীর মতামত অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য যে, মাসায়েলের উৎস ও দলীল বোঝার যোগ্যতা সকলের থাকে না। সুতরাং খলীফা উমরের রা. নির্দেশের অর্থ হলো; প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা তিন সাহাবীর খিদমতে গিয়ে মাসায়েল ও দালায়েল (সিদ্ধান্ত ও উৎস) উভয়ের ইল্‌ম হাসিল করবে। আর যাদের উক্ত বিষয়ে যোগ্যতা নেই তারা শুধু মাসায়েলের ইল্‌ম হাসিল করে সে মোতাবেক আমল করবে। তাকলীদের মর্ম এটাই। তাই সে সব সাহাবী যাঁদের ইজতিহাদী যোগ্যতা ছিলো না তারা নি:সংকোচে ফকীহ্ তথা মুজতাহিদ সাহাবীগণের শরণাপন্ন হতেন এবং বিনা দলীলেই তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে মোতাবেক আমল করে যেতেন।[৩৩]
(২) উমর রা. তাঁর শাসনকালে কুফাবাসীদের প্রতি আমীর হিসেবে আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে এবং শিক্ষক ও দূত হিসেবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদকে প্রেরণকালে উক্ত এলাকাবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,
"আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে শাসক এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে শিক্ষক ও দূতরূপে আমি তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। এ দু'জন বিশিষ্ট বদরী সাহাবী। সুতরাং তোমরা এদের অনুকরণ করবে এবং তাঁদের যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলবে।"[৩৪]

---

[৩২]. তাবরানী ইমাম, আল-আওসাত
" قَالَ خَطَبَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّاب النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ وَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ اَرَادَ اَنْ يُسْئَلَ عَنِ الْقُرْاٰنَ فَلْيَاتِ اُبَىْ بْنُ كَعَبٍ)رَضـ(- وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُسْئَلَ عَنِ الْفَرَائِض فَلْيَاتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ)رَضـ(وَمَنْ اَرَدَ اَنْ يُسْئَلَ عَنْ الْفِقْهِ فَلْيَاتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ)رضـ(- وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُسْئَلَ عَنِ الْمَال فَلْيَنْتِنِىْ فَاِنَّ اللهَ جَعَلَنِىْ لَه وَ الِيًا وَقَاسِمًا - "
[৩৩]. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০-৫২১
[৩৪]. প্রাগুক্ত
"اِنِّىْ قَدْ بَعَثْتُ اِلَيْكُمْ بِعَمَّارِبْن يَاسِرِ اَمِيْرًا - وَعَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُوْدٍ مُعَلِّمًا وَ وَزِيْرًا- وَهُمَا مِنَ النُّجَاءِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ فَاقْتَدُوْا بِهِمَا وَاسْمَعُوْا مِنْ قَوْلِهِمَا - "

www.pathagar.com

(খ) সাহাবা ও তাবিঈ যুগে ব্যক্তি তাকলীদ : সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীগণের সোনালী যুগে মুক্ত তাকলীদ-এর পাশাপাশি ব্যক্তি তাকলীদের প্রচলন ও রীতিও সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। উক্ত সময়কালে অনেকে যেমন একাধিক সাহাবীর তাকলীদ করতেন, তেমনি অনেকেই নির্দিষ্ট কোন সাহাবীর রা. 'তাকলীদ' তথা তাকলীদে শাখসী(تقليد شخصى) -এর প্রতিও ছিলেন একনিষ্ঠ।[৩৫] নিম্নে এ সম্পর্কিত দু' একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ঃ

তাকলীদে শাখসী (ব্যক্তি তাকলীদ)-এর উদাহরণ : "একদল মদীনাবাসী ইবনে আব্বাসকে একবার মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন এ মর্মে যে, তাওয়াফ অবস্থায় কোন মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হলে সে কি করবে? ইবনে আব্বাস রা. তাদেরকে বললেন, (বিদায়ী তাওয়াফ না করেই) ফিরে যাবে। কিন্তু মদীনাবাসী দলটি বললেন, যায়িদ ইবনে সাবিত রা. কে বাদ দিয়ে আপনার মতামত আমরা মানতে পারি না"।[৩৬]

ব্যক্তি তাকলীদের কারণেই সে সময় মদীনাবাসীগণ যায়িদ ইবনে সাবিত রা. ছাড়া অন্য কারো ফতোয়া মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।[৩৭]

"রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা করলেন–কিভাবে তুমি উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করবে? মুআয রা. উত্তর দিলেন–কিতাবুল্লাহ্র আলোকে ফয়সালা করবো। রসূলুল্লাহ্ স. প্রশ্ন করলেন, সেখানে কোন সমাধান খুঁজে না পেলে? মুআয রা. বললেন, তাহলে সুন্নাহ্র আলোকে ফয়সালা করবো। রসূলুল্লাহ্ স. আবার প্রশ্ন করলেন, সেখানেও কোন সমাধান খুঁজে না পেলে কিভাবে করবে? মুআয রা. বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করবো। রসূলুল্লাহ্ স. তখন তাঁর প্রিয় সাহাবীর বুকে পবিত্র হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ্ তাঁর রসূলের স. দূতকে রসূলের সন্তুষ্টি মুতাবিক অভিমত ব্যক্ত করার তাওফিক দিয়েছেন"।[৩৮]

---

৩৫. কারযাভী, আল্লামা ইউসূফ আল, *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, অনুবাদ–ড. মাহ্ফুজুর রহমান, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৯৪-১০৪

৩৬. *বুখারী, ইমাম, আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, অনুচ্ছেদ : ইযা-হাযাতিল মারআতু বা'দা মা আফাযাত, আল-কুতুবুস সিত্তা, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০,
" وَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَأَلُوْا اِبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن إِمرَأةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ - قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوْا لا نَاخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ - (البخارى - كتاب الحج) "

৩৭. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮-৫২৯

৩৮. আবু দাউদ, ইমাম, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আলকাজা, অনুচ্ছেদ : ইজতিহাদির রায় ফিলকাজা, আল-কুতুবুসসিত্তা, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০০, পৃ. ১৪৮৯
" عَنْ مُعَاذ بْن جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَه إِلى الْيَمَن - قَالَ كَيْف تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاء؟ قَالَ اقْضِيْ بِكِتَابِ اللهِ - قَالَ فَانْ لَمْ تَجِد فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ اجْتَهِدُ رَأيِى - وَلاَ الو - فَضَرَبَ

www.pathagar.com

ফকীহ্ ও মুজতাহিদ সাহাবীগণের মধ্য থেকে আল্লাহ্র রসূল একজনকে শাসক, বিচারক ও শিক্ষকরূপে ইয়ামেনে পাঠিয়েছিলেন। আলোচ্য হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, কুরআন-সুন্নাহ্ অনুসরণের পাশাপাশি প্রয়োজনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিজস্ব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে ইজতিহাদ করার অধিকারও আল্লাহ্র রসূল তাকে দিয়েছিলেন। আর ইয়ামেনবাসীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর প্রতি আনুগত্যের। এর দ্বারা এটাও সুস্পষ্ট হয় যে, ইয়ামেনবাসীকে রসূলুল্লাহ্ স. মুআয ইবনে জাবাল র.-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৩৯]

'ব্যক্তি তাকলীদ' মাযহাব চতুষ্টয় : ব্যক্তি তাকলীদের ক্ষেত্রে মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ বিশেষত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হচ্ছেন অনুসরণীয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব।[৪০] এ চারজন ইমাম সর্বজন স্বীকৃত মুজতাহিদ মুতলাক (مجتهد مطلق) এবং তাঁদের প্রণীত মাযহাব চতুষ্টয় হচ্ছে সর্বজনীন অনুসরণীয় মাযহাব।[৪১] হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সারা বিশ্বে উক্ত মাযহাব চতুষ্টয় অনুসরণযোগ্য হয়ে আসছে। এসব মাযহাবের অনুসারী অসংখ্য আলিম ও ফকীহ্ বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছেন।

একথা ঠিক যে, উল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ চার ইমাম ও মাযহাব চতুষ্টয় ব্যতিত আরো অনেক ইমাম মুজতাহিদ এবং মাযহাব রয়েছে, যাদেরকে নিঃসন্দেহে হকপন্থী মুজতাহিদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন– ইমাম সুফিয়ান সাওরী র., ইমাম আওযাঈ র., ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইমাম বুখারী র., ইবনে আবী লায়লা, ইবনে শুবরামাহ এবং ইমাম হাসান ইবনে সাহিল প্রমুখ। এ সকল ইমামগণ এবং তাঁদের বাতলানো পথ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফিক্হী মাসআলার ক্ষেত্রে বিশেষত: ব্যক্তি তাকলীদের ক্ষেত্রে কেবল মাযহাব চতুষ্টয়-এর তাকলীদ করা হয়ে থাকে। আর এ কথা স্বীকৃত হয়ে আসছে যে, ব্যক্তি তাকলীদ এর ক্ষেত্রে এ মাযহাব চতুষ্টয়-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কেননা উক্ত মাযহাব চতুষ্টয় ব্যতিত অন্যান্য ইমামগণের প্রণীত মাযহাবসমূহ সুবিন্যস্ত, গ্রন্থবদ্ধ ও সংরক্ষিত নেই। এতদ্ভিন্ন মাযহাব চতুষ্টয়ের পর আর কোন মাযহাব প্রণয়নেরও প্রয়োজন নেই। কারণ উল্লিখিত ইমাম চতুষ্টয় নিরবচ্ছিন্নভাবে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে মূলনীতি ও ধারা-উপধারা (اصول) প্রণয়ন করে গিয়েছেন,

---

رَسُوْل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَه ـ فقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رسول رَسُوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) لِمَا يَرْضَى رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৩৯. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩১-৫৩২

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২-৫৩৪;

৪১. "আরবী ভাষায় মাযহাব শব্দের অর্থ–ধর্ম নয়, বরং তা তাত্ত্বিক ধারা বিশেষ। হানাফী, শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী ইত্যাদি কোন ফের্কা বা সম্প্রদায় নয়, বরং ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত স্বীকৃত বিভিন্ন মত ও পন্থা বা ধারা। মাযহাব শব্দটাই এর পারিভাষিক নাম। কোন যুগেই মনীষীরা এগুলোকে ফের্কা বা সম্প্রদায় নামে আখ্যায়িত করেন নি। *রাসায়েল ও মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

www.pathagar.com

সাহাবা কিরামের পথ অনুসরণ করেছেন এবং সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে ফাতওয়া দান করে গিয়েছেন।[৪২] ইমাম চতুষ্টয় তথা মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যেই তাকলীদ সীমাবদ্ধ করার প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ র. বলেন, অনিবার্য কারণে বর্তমানে কতিপয় মুজতাহিদের তাকলীদের ব্যাপারে সংশ্রয় রয়েছে :

১. তাদের মাযহাবের প্রতিনিধিত্বকারী কোন আলিম বিদ্যমান নেই। আর চার ইমামই শুধু এ মতের মাপকাঠিতে পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারেন।
২. বিলুপ্তির শিকার মাযহাবগুলোর প্রতিকূলে ইজমা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। তবে এ ধরনের ইমাম ও মুজতাহিদের কোন সিদ্ধান্ত জীবন্ত মাযহাবের অধিকারী মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ হলে তা অবশ্যই সমর্থিত ও শক্তিশালী হয়ে যাবে।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী র. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইকদুল-জিদ্দ' গ্রন্থে বলেন, চার মাযহাবে তাকলীদ সীমিতকরণের মাঝে যেমন বিরাট কল্যাণ নিহিত রযেছে, তেমনি তা বর্জন ও লংঘনের মাঝে রয়েছে সমূহ ক্ষতি ও অকল্যাণ। তিনি আরো বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. ইরশাদ করেন, তোমরা গরিষ্ঠ অংশের অনুসারী হও। অন্যান্য মাযহাবের বিলুপ্তির কারণে এখন চার মাযহাবের অনুসরণই গরিষ্ঠ অংশের অনুসরণ। আর তা লংঘনের অর্থ হলো গরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধাচরণ।[৪৩] এখানে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের স্বতন্ত্র দল গবেষক ও বিশ্লেষণের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছেন। সুতরাং তাদের সতর্ক দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে ইমাম চতুষ্টয়ের কোন সিদ্ধান্তেরই ভুল অর্থ করা সম্ভব নয়।[৪৪]

তাকলীদ-এর স্তর বিন্যাস (طبقات تقليد) : তাকলীদ (تقليد)-এর স্তর ও শ্রেণী-তারতম্যের জ্ঞান না থাকার কারণেই মূলতঃ আমাদের মাঝে 'তাকলীদ' বিরোধী

---

[৪২]. আন-নাসাফী, শায়খ আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন মাহমুদ, *আল-মানার,* ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৬ পৃ. ৩৫৬

[৪৩]. *দেহলবী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্, আকদুল জীদ,* দেওবন্দ : মাকতাবা-ই-দীনিয়্যাহ্, তা. বি. পৃ. ৩২

[৪৪]. *মাযহাব কি ও কেন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৭, "আমার মতে আলিমে-দীন লোকদের সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে বিশুদ্ধ জ্ঞান হাসিলের চেষ্টা করা উচিৎ। এ গবেষণা কাজে অতীতের বড় বড় আলিমগণের মতামত থেকেও সাহায্য নেয়া উচিৎ। তাছাড়া সর্বপ্রকার পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে ওঠে উদার ও মুক্ত মন নিয়ে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে অতীতে শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণের কার ইজতিহাদ কুরআন ও সুন্নাহ্র সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে তার দৃষ্টিতে যেটা সত্য বলে মনে হবে সেটারই অনুসরণ করা উচিত। আহলে হাদীসের সবমত ও মাসআলাই যে সহীহ্ তা আমি মনে করি না। আর হানাফী ও শাফিঈ কোন মাযহাবেরই পূর্ণাঙ্গ তাকলীদ করতে হবে তাও আমি মনে করি না। জামায়াতে ইসলামীর লোকদের যে আমার এমতই মেনে নিতে হবে তারও কোন কারণ নেই। তারা পক্ষপাত মুক্ত হয়ে এবং কেবল নিজের মাযহাবই হক, আরগুলো বাতিল–এ ধারণা হতে মুক্ত হয়ে জামায়াতে ইসলামীর অন্তর্ভূক্ত থেকে স্বাধীনভাবে হানাফী, শাফিঈ, আহলে হাদীস কিংবা যেকোন ফিক্হী মাযহাবের উপর আমল করতে পারেন। *রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৭০

www.pathagar.com

মনোভাবের উদ্ভব হয়েছে। নিম্নে তাকলীদের স্তর বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

মুকাল্লিদ তাকলীদকারীর জ্ঞানগত মান অনুযায়ী ফকীহগণ উক্ত তাকলীদকে চারভাগে ভাগ করেছেন। যথা– ১. তাকলীদুল আম (تقليد العام)–সর্ব সাধারণের তাকলীদ ২. তাকলীদুল আলিম আল মুতাবাহ্হির (تقليد العالم المتبحر)–বিজ্ঞ আলিমের তাকলীদ ৩. তাকলীদুল মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (تقليد المجتهد فى المذهب)–মুজতাহিদ ফিল মাযহাবের তাকলীদ ৪. তাকলীদুল মুজতাহিদ আল মুতলাক (تقليد المجتهد المطلق) –মুজতাহিদ মুতলাকের তাকলীদ।[৪৫]

১. তাকলীদুল-আম (সর্বসাধারণের তাকলীদ) : তাকলীদের প্রথম স্তর হলো সর্ব সাধারণের তাকলীদ (تقليد العام)। এই সাধারণ শ্রেণীটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

এক–আরবী ভাষা জ্ঞান এবং কুরআন-সুন্নাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞ।

দুই–যে সকল ব্যক্তি আরবী ভাষা জ্ঞানের অধিকারী বটে, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস, তাফসীর এবং ফিক্হসহ শরী'য়া সংশ্লিষ্ট যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করেনি।

তিন-হাদীস, তাফসীর ও ফিক্হ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সনদধারী, তবে উসূলে হাদীস, উসূলে তাফসীর ও উসূলে ফিক্হ তথা ইসলামী শরীয়ার মূলনীতিশাস্ত্রে এ শ্রেণীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা নেই।[৪৬]

সর্বসাধারণের মধ্যে এ শ্রেণীর জন্য কোন ইমামের প্রতি নির্ভেজাল তাকলীদ করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। ইসলামী শরীয়া অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক এবং এক্ষেত্রে তাকলীদকারী একথা বিশ্বাস রেখেই ইমামের অনুসরণ করবে যে, অনুসরণীয় সংশ্লিষ্ট মাসআলার ইমামের নিকট নিশ্চিতভাবে কুরআন-হাদীসসহ যথার্থ যুক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

২. বিজ্ঞ আলিম-এর তাকলীদ : 'তাকলীদ'-এর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে–বিজ্ঞ আলিম-কর্তৃক ইমামের প্রতি তাকলীদ।[৪৭] যিনি ইজতিহাদের মর্যাদায় উন্নীত না হলেও বিশেষজ্ঞ আলিমের তত্ত্বাবধানে কুরআন-সুন্নাহ্ সংশ্লিষ্ট সকল শাস্ত্রীয় জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় অর্জন করেছেন এবং পঠন-পাঠন, লিখন ও গবেষণা কর্মে দীর্ঘকাল নিয়োজিত থেকে সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় পরিপক্কতা অর্জন করেছেন। সেই সাথে মহান পূর্বসূরীগণের (سلف صالحين) ইজতিহাদ পদ্ধতি ও রচনা শৈলীর সাথে একান্ত পরিচয়ের কারণে তাদের সিদ্ধান্ত ও বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম অনুধাবনের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

---

[৪৫]. *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিকপন্থা অবলম্বনের উপায়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯ : ৮০

[৪৬]. *উসূলুল ইফতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

[৪৭]. *তাকলীদ কি শরঈ হাইসিয়ত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

www.pathagar.com

এ শ্রেণীর আলিমগণ কুরআন, সুন্নাহ্সহ তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় এবং আহকাম ও মাসাইলের পাশাপাশি মাযহাব নির্ধারিত উসূল ও দলীল সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও মুজতাহিদে মুতলাক (مطلق مجتهد) কিংবা মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (مجتهد فى المذهب)-এর মর্যাদায় উন্নীত নয় এবং তাদেরকে মুকাল্লিদ এর শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এ সকল আলিম হচ্ছেন মাযহাব বিশেষজ্ঞ আলিম (متبحر فى المذهب)।[৪৮]

উল্লেখ্য যে, এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ মুজতাহিদ পর্যায়ে উন্নীত না হওয়ার কারণে মুকাল্লিদ (مقلد) রূপেই পরিচিত হবেন। তবে সাধারণ মুকাল্লিদের তুলনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ মর্যাদা লাভ করবেন। যেমন–

ক. আহকাম ও মাসায়েলের পাশাপাশি দলিল ও উৎস সম্পর্কেও তাঁদের মৌলিক জ্ঞান থাকবে।

খ. স্ব-স্ব মাযহাবের মুফতীর মর্যাদা তাঁরা লাভ করবেন এবং কোন বিষয়ে ইমামের একাধিক কাওল (قول) ও সিদ্ধান্ত (رائ) থাকলে যুগের দাবী ও সময়ের চাহিদা মুতাবেক যে কোন একটি বেছে নিয়ে ফতোয়া দিতে পারবেন। সর্বোপরি, মাযহাব নির্ধারিত উসূল ও মূলনীতিমালার নিয়ন্ত্রণে থেকে নতুন ও উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান পেশ করার অধিকারও তাঁদের থাকবে।

গ. 'শর্ত সাপেক্ষে' স্থান-কাল পাত্রভেদে স্ব-মাযহাবের অন্য ইমামের সিদ্ধান্ত মুতাবেক ফতোয়া দেয়ার অধিকারও তাঁরা সংরক্ষণ করেন। ফতোয়া বিষয়ক নির্দেশিকা গ্রন্থ সমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[৪৯]

এ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ তাঁদের অনুসরণীয় ইমামের মাযহাবকে অনুসরণ করে থাকেন। পাশাপাশি স্বীয় মাযহাবের পরিপন্থী কোন হাদীস তথা দলীলের সন্ধান পেলে স্বীয় মাযহাব পরিত্যাগ করে হাদীসের উপর আমল করতে পারেন।[৫০]

৩. মুজতাহিদ ফীল-মাযহাব-এর তাকলীদ : 'তাকলীদ'-এর তৃতীয় স্তর হচ্ছে– মুজতাহিদ ফীল মাযহাব কর্তৃক ইমামের প্রতি তাকলীদ। এ স্তরের আলিমগণ তাঁদের অনুসরণীয় ইমাম তথা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ-এর নীতিমালা (اصول) অনুসরণ করে কুরআন-সুন্নাহ্ ও সাহাবা কিরামের আমল থেকে সরাসরি মাসায়েল ও আহকাম উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুঁটি-নাটি বিষয়ে স্বীয় মতে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও মৌলিক নীতিমালা-এর দিক থেকে তাঁরা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ তথা তাদের ইমামের প্রতি মুকাল্লিদ।

এ স্তরে রয়েছেন হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ র. ও মুহাম্মদ র., শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম মুযানী র. ও আবু সাওর র.। মালেকী মাযহাবের ইমাম সাহনূন র.

---

[৪৮]. *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯

[৪৯]. *মাযহাব কি ও কেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৯; *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯

[৫০]. *ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৯

www.pathagar.com

ও ইবনুল কাসেম র. এবং হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইবরাহীম আল-হারবী র. ও আবু বকর আল-আসরাম র. প্রমুখ।[৫১]

৪. মুজতাহিদে মুতলাক-এর তাকলীদ : স্তর বিন্যাসের ধারাবাহিকতায় 'তাকলীদ'-এর চতুর্থ এবং সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে–মুজতাহিদে মুতলাক তথা পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদগণের তাকলীদ। এ স্তরের আলিমগণ ইজতিহাদ করার সকল শর্ত এবং যোগ্যতার অধিকারী। কুরআন-সুন্নাহ্সহ ইসলামী শরীয়া-এর উৎস থেকে সরাসরি আহকাম উদ্ভাবন করার যোগ্যতা এ শ্রেণীর ইমামগণের রয়েছে। তথাপি প্রয়োজনবোধে তাঁদেরকেও সাহাবা কিরাম এবং তাবিঈগণের তাকলীদ করতে হয়।[৫২]

এ স্তরে রয়েছেন ইমাম আবু হানিফা র., ইমাম শাফিঈ র., ইমাম মালিক র., ইমাম আহমদ র. প্রমুখ। মূলনীতি প্রণয়ন ও আহকাম আহরণের ক্ষেত্রে এঁরা স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদের মর্যাদাধিকারী হলেও এক পর্যায়ে তাদেরকেও তাকলীদের আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ কোন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট নির্দেশ না পেলে নিজেদের বিচার, প্রজ্ঞা ও কিয়াসের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে তারা সাহাবা কিরাম ও তাবিঈগণের তাকলীদ করেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যদি সাহাবী বা তাবিঈ'র কোন সিদ্ধান্ত খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে একান্ত বাধ্য হয়েই তাঁরা নিজস্ব ইজতিহাদ প্রয়োগ করেন। তিন কল্যাণ যুগে (القرون الثلاثة) এ ধরনের তাকলীদের অসংখ্য নজীর খুঁজে পাওয়া যায়।[৫৩]

মুকাল্লিদের জন্য আংশিক বা খণ্ডিত ইজতিহাদ (الاجتهاد فى بعض الابواب)-এর বিধান

একজন মুকাল্লিদ (مقلد) তাকলীদের স্তরভেদে তাঁর উপরস্থ ইমামের অনুসরণ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে কোন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে যদি মুকাল্লিদ ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন, তবে তিনি উক্ত ইজতিহাদী বিষয়ে ইমামের আনুগত্য করবেন কিনা–এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। আর এ ধরনের ইজতিহাদ বা তাকলীদের ক্ষেত্রে মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে, ইজতিহাদ খণ্ডিতভাবে করা যায় কিনা। সহজভাবে বলতে গেলে ইজতিহাদের বিভাজন হয় কি? এ প্রসঙ্গে আমরা নিম্নে আলোচনা পেশ করছি।

বহু শাখাবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ইসলামী ফিক্হের যে কোন একটি শাখায় বিশেষ প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের মাধ্যমে আংশিক ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব। সুতরাং ইজতিহাদের বিভাজনও একটি স্বভাব সিদ্ধ ও স্বীকৃত সত্য।

বিশিষ্ট উসূলবিদ ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী র.-এর রচিত উসূল সংক্রান্ত কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা আব্দুল আজীজ বুখারী লিখেছেন :

---

৫০. *উসূলুল ইফতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৫২. *উসূলুল ইফতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

৫৩. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০

www.pathagar.com

অধিকাংশ উলামার মতে ইজতিহাদ অবিভাজ্য নয়। বরং একজন আলিম ফিক্‌হের কোন এক শাখা ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করে অন্যান্য শাখায় তা অর্জনে ব্যর্থও হতে পারেন। ইমাম গাযালী র. ও এ বিষয়ে বিভাজন অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। বস্তুত: উসূল তথা মূলনীতি বিশারদ আলিমগণের দ্ব্যর্থহীন অভিমত এই যে, একজন মুতাবাহ্‌হির (متبحر) তথা বিশেষজ্ঞ আলিম অন্তত কোন এক বিষয়ে ইজতিহাদি যোগ্যতা অর্জনের পর (সামগ্রিক ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও) একথা বলার অধিকার সংরক্ষণ করেন যে, আমার ইমাম সাহেবের অমুক সিদ্ধান্ত অমুক বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী। এক্ষেত্রে ইমামের সিদ্ধান্ত বর্জন করে হাদীস মুতাবেক আমল করাই তার কর্তব্য।[৫৪]

তাকলীদ-এর তাৎপর্য : তাকলীদ-এর তাৎপর্য না বুঝার কারণে অনেকের নিকট বাহ্যতঃ মনে হয় যে, উহা জাহেলী যুগের অন্ধ অনুকরণের ন্যায়।[৫৫]

মূলত: উভয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও মূলগতভাবে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা তাকী উসমানী বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রসূলের স. বিধান লংঘন করে পূর্ব পুরুষের অন্ধ আনুগত্যের নাম তাকলীদ নয়। বরং কুরআন মাজীদ এবং সুন্নাহ্‌র ব্যাখ্যা দানকারী হিসেবে একজন মুজতাহিদের নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ্ তাআলা এবং রসূলুল্লাহ্ স.-এর বিধান মেনে চলার নামই হচ্ছে তাকলীদ। মূলত: মুশরিক সম্প্রদায়ের আকীদা বিষয়ক অন্ধ তাকলীদের সাথে শরীয়া স্বীকৃত উক্ত তাকলীদের তুলনা করা বিবেকের মর্মান্তিক অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়।[৫৬]

তাকলীদের তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য একজন 'তাকলীদ' বিশ্বাসী তথা ইসলামের অনুসারীর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো রপ্ত করা ও মেনে নেয়া অপরিহার্য। যেমন :

---

৫৪. *মাযহাব কি ও কেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯৩, আংশিক ইজতিহাদের জন্য স্বীয় অনুসরণীয় ইমামের অনুসৃত মূলনীতিমালা সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিতি অত্যাবশ্যক। কেননা উক্ত মূলনীতির আলোকেই তাকে ইস্তিম্বাত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। (উসূলে ফিক্‌হর পরিভাষায় যিনি পূর্ণাঙ্গ মুজতাহিদ তাঁর অনুসৃত নীতিমালার আলোকে) নতুন সিদ্ধান্ত (হুকুম) গ্রহণের নাম হলো–'ইজতিহাদ ফিল-হুকুম'। পক্ষান্তরে, মুজতাহিদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে নতুন দলীল পরিবেশনের নাম হচ্ছে তাখরীজ। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২
"وَلَيْسَ الاجْتِهَادُ عِنْدَ الْعَامَّةِ مَنْصِبًا لا يَتَجَزَّا، بَلْ يَجُوزُ ان يَفُوزَ الْعَالِمُ بِمَنْصِبِ الاِجْتِهَادِ فِى بَعْضِ الأَحْكَامِ دُوْنَ بَعْضٍ ـ"

৫৫. এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : মুজতাহিদ ইমামগণের মাযহাব অনুসরণ করাটা এমন একটি কুদরতী রহস্য, যা আল্লাহ্ (হিকমত ও কল্যাণের খাতিরে) আলিমদের অন্তরে ইলহাম করে দিয়েছেন। আর এ ব্যাপারে সচেতনভাবে হোক কিংবা অচেতনভাবে, তাঁরা একমত হয়েছেন–
فالتقليد للمجتهدين سر الله تعالى للعلماء وجمعهم من يشعرون أو لا يشعرون
ফিক্‌হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২-৫৩৩; *মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৭

৫৬. *মাযহাব কি ও কেন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

www.pathagar.com

১. ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধানের ক্ষেত্রে 'তাকলীদ' কিংবা ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। অস্পষ্ট দলীল ভিত্তিক আহকাম এর ক্ষেত্রেই কেবল তাকলীদ কিংবা ইজতিহাদ প্রযোজ্য।[৫৭]
২. সুস্পষ্ট এবং অকাট্য দলীল ভিত্তিক বিধানের ক্ষেত্রে তাকলীদ বৈধ নয়।
৩. কুরআন মাজীদ এবং রসূলুল্লাহ্ স. হাদীস-এর দ্ব্যর্থহীন ও সুনির্দিষ্ট দলীলের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত এমন মাসআলা ও বিধান যার বিপরীতে অন্য কোন দলীলও বিদ্যমান নেই-এমন ক্ষেত্রে তাকলীদ করা বৈধ নয়।
৪. যে ব্যক্তি কোন ইমামের তাকলীদ করবে তাকে অবশ্যই একথা মেনে নিতে হবে যে, কোন মুজতাহিদ ভুলের উর্ধ্বে নন। সুতরাং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনাও রয়েছে।
৫. কোন বিজ্ঞ আলিম যদি অনুসরণীয় মুজতাহিদ তথা ইমামের অভিমতটি হাদীসের পরিপন্থি বলে মনে করেন, তাহলে তাকে সেক্ষেত্রে উক্ত ইমামের অভিমতকে পরিত্যাগ করে হাদীসের উপর আমল করা উচিত।
৬. দ্ব্যর্থবোধক আয়াত ও হাদীসের মর্ম অনুধাবন এবং বিপরীতমুখী দলীল-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ক্ষেত্রে একজন ইমামের ইজতিহাদী রায়ের অনুসরণ করাই হচ্ছে তাকলীদ।[৫৮]
৭. ইমাম ও মুজতাহিদকে আইন প্রণয়ন ও আইন রহিতকরণের অধিকারী মনে না করা কিংবা নবী-রসূলের মত তাদেরকেও মাসুম (নিষ্পাপ) ও ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে না করা।
৮. কোন বিশুদ্ধ হাদীসকে শুধু এই যুক্তিতে অস্বীকার করা যে, ইমামের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি। উদাহরণতঃ তাশাহহুদের সময় শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার কথা অনেক সহীহ হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। অথচ অনেক লোক শুধু এই যুক্তিতে তা অস্বীকার করে থাকে যে, তাদের মাযহাবের ইমাম এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দেন নি। বস্তুতঃ এ ধরনের অন্ধ তাকলীদেরই নিন্দা করা হয়েছে কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন স্থানে।
৯. ইমামের মাযহাবকে নির্ভুল প্রমাণিত করার জন্য হাদীসের এমন মনগড়া ব্যাখ্যা করা, যা কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকের পক্ষেই স্বীকার করা সম্ভব নয়। অবশ্য এটা প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তা-পদ্ধতির ব্যাপার। তাই একজন যদি হাদীসের কোন একটি ব্যাখ্যায় আশ্বস্ত হয় আর অন্যজন তা মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন কারো পক্ষেই অন্যকে আক্রমণের ভাষায় কথা বলা সঙ্গত নয়।
১০. একজন বিজ্ঞ আলিম যখন ইমামের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এই মর্মে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তা অমুক সহীহ হাদীসের পরিপন্থী এবং ইমামের

---

[৫৭]. *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬
[৫৮]. মাযহাব কি ও কেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭

www.pathagar.com

উক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কোন দলিল নেই; তখনও ইমামের সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে ধরে রসূলের হাদীসকে উপেক্ষা করা নিঃসন্দেহে অন্ধ তাকলীদের অন্তর্ভুক্ত।

১১. এমন ধারণা পোষণ না করা যে, আমার ইমামের মাযহাবই অভ্রান্ত মত এবং অন্যান্য ইমামের মাযহাব অবশ্যই ভ্রান্ত, বরং এ ধারণা পোষণ করা উচিত যে, আমার ইমামের সিদ্ধান্তই সম্ভবত: সঠিক তবে ভুল হওয়া বিচিত্র নয় এবং অন্যান্য ইমাম হয়তো ভুল ইজতিহাদের শিকার হয়েছেন। আবার এমনও হতে পারে যে, তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক। বস্তুত: সকল মুজতাহিদ ইজতিহাদের নির্দিষ্ট সীমায় থেকে কুরআন সুন্নাহ্র সঠিক মর্ম অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা ও রসূলের স. পক্ষ থেকে মুজতাহিদগণের প্রতি এটাই ছিলো নির্দেশ। প্রত্যেকেই সে নির্দেশই পালন করেছেন। সুতরাং সকল মাযহাবই হকপন্থী। কোন ক্ষেত্রে ভুল ইজতিহাদের শিকার হলেও আল্লাহর কাছে তিনি দায়িত্ব মুক্ত। উপরন্তু, সত্য লাভের মহৎ প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ মুজতাহিদ সর্বাবস্থায়ই পুরস্কার লাভ করবেন।

১২. ইমাম ও মুজতাহিদগণের ইজতিহাদগত মতপার্থক্যের অতিরঞ্জন করে পেশ করা মারাত্মক অপরাধ। কেননা তাঁদের অধিকাংশ মত-পার্থক্যই হচ্ছে উত্তম ও অধিক উত্তম বিষয়ক। ইসলামের মৌলিক ইবাদত অথবা জায়েজ-নাজায়েজ বা হালাল-হারাম নির্ধারণ সংক্রান্ত নয়। সুতরাং, ইমামগণের এই সাধারণ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ি করা এবং উম্মাহর মাঝে অনৈক্য ও অসম্প্রীতির বীজ বপণ করা কোনক্রমেই কাংখিত নয়।

১৩. ইমাম ও মুজতাহিদগণের মাঝে যে সকল বিষয়ে হারাম-হালাল বা জায়েজ নাজায়েজের পর্যায়ে মতপার্থক্য রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রেও মতের অনৈক্যকে বিরোধ কিংবা মনগড়ায় রূপান্তরিত করা এবং সংঘাত-সংঘর্ষ বা রেশারেশিতে লিপ্ত হওয়া কোন ইমামের মতেই বৈধ নয়। বস্তুত: ইমামগণের সকল মতপার্থক্যই ছিলো তাত্ত্বিক পর্যায়ের, ব্যক্তি পর্যায়ের নয়। আর এ কথা ঠিক যে, প্রত্যেক ইমাম ও মুজতাহিদ যেমন ইমাম চতুষ্টয় একে অপরের ইলম, প্রজ্ঞা ও মর্যাদা সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

১৪. সাধারণ লোকদের জন্য অনিবার্য কারণে কোন কোন মাসআলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে স্বীয় অনুসরণীয় মাযহাব পরিত্যাগ করে অন্য কোন মাযহাব অনুযায়ী মাসআলার উপর আমল করার অবকাশ বিদ্যমান। তবে–এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ভিত্তি হবে দীন। ব্যক্তির নফস কিংবা রিপুর তাড়নায় প্রভাবিত হওয়া নয়। উপরন্তু অন্য মাযহাব অনুযায়ী মাসআলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একদল মুহাক্কিক দীনদার আলিমের সম্মিলিত পরামর্শ নেয়া উচিত।[৫৯]

---

[৫৯]. *ফিক্হে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩-৫৪৪

www.pathagar.com

১৫. তাকলীদ কারীকে অবশ্যই এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, 'তাকলীদ' মূলত: আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রসূলের স. জন্য করা হয়। ইমাম মুজতাহিদ-এর তাকলীদ কেবল প্রকৃত আনুগত্যের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া মাত্র। ইমাম মুজতাহিদগণ শরীয়ত প্রণেতা নন, বরং বিশ্লেষক মাত্র। কেননা, প্রকৃত শরীয়ত প্রণেতা হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল স.। আল্লাহ্ তাআলা সার্বভৌম শরীয়া প্রণেতা আর রসূল স. তাঁর অনুমোদিত নির্দেশিত শরীয়ত প্রণেতা।[৬০]

১৬. কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে কারো নিকট যদি একথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর অনুসরণীয় মাযহাবের চেয়ে অন্য মাযহাব উত্তম, তাহলে তিনি পরিপূর্ণভাবে স্বীয় পূর্ববর্তী মাযহাব ত্যাগ করে অন্য মাযহাব অনুসরণ করতে পারবেন।[৬১]

উপসংহার

'তাকলীদ' হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রসূলের স. প্রতি আনুগত্যের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া রসূলুল্লাহ স.-এর পরবর্তীতে মুসলিম উম্মাহ এর মাঝে দু'টি শ্রেণী ও ধারা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন-সুন্নাহ্‌সহ ইসলামী শরীয়া যারা ব্যুৎপত্তি অর্জন করে সরাসরি বিধান (আহকাম) উদ্ভাবন করতে সক্ষম তাঁরা–মুজতাহিদ। আর যারা সরাসরি বিধান উদ্ভাবন করতে কিংবা মাসআলা কার্যকর করতে অক্ষম, এবং মুজতাহিদগণের নির্দেশিত নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে থাকেন তারা হচ্ছেন মুকাল্লিদ। তাকলীদ-এর মধ্যে মূলতঃ ব্যক্তির পক্ষ থেকে শরীয়া বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ কিংবা স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। তাকলীদকে অন্ধ অনুকরণের দোহাই দিয়ে বর্জন করার দ্বারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ব্যক্তিগত সুবিধা লাভ করার আশংকা থেকে যায়। একথা ঠিক যে, তাকলীদের নামে বাড়াবাড়ি কিংবা ব্যক্তি তথা ইমামের প্রতি অন্ধ অনুকরণ করার প্রবণতাও ইসলামী শরীয়ার সীমা লংঘনেরই নামান্তর। মূলত: ইলমী যোগ্যতার ভিত্তিতে উর্ধ্বতন ইমামের প্রতি নিয়ন্ত্রিত অনুকরণ ও অনুসরণের (তাকলীদ) মধ্যে কোন দোষ নেই। পাশাপাশি মাযহাবের নামে কোনভাবে ইমামের প্রতি এমনভাবে তাকলীদ করাও উচিত নয়– যা অন্ধ আনুগত্যের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

একজন মুকাল্লিদ তথা তাকলীদকারী ব্যক্তির জন্য একথা ধারণা করা উচিত নয় যে, একমাত্র আমার অনুসরণীয় ইমাম বা মাযহাবই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বরং মুকাল্লিদের জন্য এ ধারণা করাই সংগত যে, প্রত্যেক ইমাম মুজতাহিদই কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে বিধান উদ্ভাবন ও অনুসরণ করেছেন। মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদকৃত বিষয়ের অনুসরণই হচ্ছে তাকলীদের মর্মকথা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম চতুষ্টয়ের অনুসরণও মূলতঃ তাকলীদেরই পর্যায়ভুক্ত।

---

[৬০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫-৫০৭

[৬১]. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তাহাবী র. প্রথমঃ শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। "নীতিগতভাবে বিচারক যদি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান চালানোর পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আলোচ্য বিশেষ সমস্যাটির ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের তুলনায় শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের যুক্তি-প্রমাণাদি অধিকতর বলিষ্ঠ, তাহলে তাঁর পক্ষে সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ফয়সালা করা শুধু জায়েজই নয় বরং বলিষ্ঠতর মাযহাব বাদ দিয়ে দুর্বলতর মাযহাব অনুযায়ী ফয়সালা করা নাজায়েজ একান্ত কর্তব্য। *রাসায়েল ও মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2000) টাইপ / ফন্ট Sutonny MJ ব্যবহার করতে হবে। কাগজের সাইজ অ৪। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে : উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৬৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধের সফ্ট কপি সংস্থার ই-মেইল ঠিকানায় মেইল করে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে লেখকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে :

ক. জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/ তাঁরা;

খ. প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জার্নাল-এ মুদ্রিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য তা অন্য কোনো জার্নালে জমা দেয়া হয়নি;

গ. প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোন পান্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক জার্নাল-এর ২ (দুই) টি কপি এবং ৫ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান) রচিত হবে। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। লেখক কোন বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে দিতে হবে। তথ্যনির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থ ও জার্নাল থেকে তথ্যসূত্র এভাবে লিখতে হবে।

যেমন– গ্রন্থ :

ক. এবাদুল হক, কাজী, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ.২৯

খ. ইবনে হাযম, *আল-মুহাল্লা,* আল-কাহেরা : মাকতাবা দারুত্তুরাস, ২০০৫, খ. ১, পৃ. ৯০

গ. হুসাইন, যিকরা তাহা, *জামহুরিয়াতু মিসর আল-আরাবিয়্যাহ,* ওযারাতুস সাকাফা, আল-কাহেরা : আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭৭, পৃ. ১০৩

www.pathagar.com

প্রবন্ধ ঃ

* Monsoor, Dr. Taslima, Dissolution of Marriages on Test; A Study of Islamic Family Law and Women, *Journal of the Faculty of Law*, University of Dhaka, Volume:15, Number:1, June 2004, p. 26

৬. মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। *গ্রন্থ ও পত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে (ওঃধষরপ) হবে যেমন,* গ্রন্থ ঃ *বিচারব্যবস্থার বিবর্তন;* পত্রিকা : *Journal of Islamic law and judiciary.*

৭. কুরআনুল করীম-এর অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আল-কুরআনুল করীম ও হাদীসসমূহের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আধুনিক প্রকাশনী ও বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-এর অনুবাদ অনুসরণ করে চলতি রীতিতে রূপান্তর করতে হবে, তবে রেফারেন্সদানের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবি, উর্দু, বাংলা, ইংরেজি যে ভাষায় হোক) রেফারেন্স টেক্সটসহ দিতে হবে। Secondary source এর উদ্ধৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআনুল করীমের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে। কুরআনের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– আল-কুরআন, ২:১৫। হাদীসের উদ্ধৃতি হবে এভাবে– বুখারী, ইমাম, *আস-সহীহ,* অধ্যায়:--, অনুচ্ছেদ:---, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান:---, প্রকাশকাল---, খ.--, পৃ.--। হাদীসের উদ্ধৃতিতে "অধ্যায়" এবং "অনুচেছদ"-এর উলেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া যে সকল প্রবন্ধে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি দেয়া হবে সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ দিতে হবে।

৮. প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্ন মত থাকলে যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

৯. প্রবন্ধের শুরুতে 'সারসংক্ষেপ' এবং শেষে 'উপসংহার' অবশ্যই দিতে হবে।

১০. কুরআন ও হাদীসের আরবী Text নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার (স্যুট-১৩/বি), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন :০২-৭১৬০৫২৭, ০১৭১২-০৬১৬২১, ০১৭১৭-২২০৪৯৮
ই-মেইল: islamiclaw_bd@yahoo.com. www.ilrcbd.org

www.pathagar.com

REG : NO : DA -6100, ISLAMI AIN O BICHAR : OCTOBER-DECEMBER : 2011

Design : An-Noor